উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

চতুর্থ সেমেস্টার

ঐচ্ছিকপত্র – ৪০১

রবীন্দ্রনাথের কাব্য

পর্যায় – ক

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

FOREWORD

The Self Learning Material (SLM) is written with the aim of providing simple and organized study content to all the learners. The SLMs are prepared on the framework of being mutually cohesive, internally consistent and structured as per the university's syllabi. It is a humble attempt to give glimpses of the various approaches and dimensions to the topic of study and to kindle the learner's interest to the subject

We have tried to put together information from various sources into this book that has been written in an engaging style with interesting and relevant examples. It introduces you to the insights of subject concepts and theories and presents them in a way that is easy to understand and comprehend.

We always believe in continuous improvement and would periodically update the content in the very interest of the learners. It may be added that despite enormous efforts and coordination, there is every possibility for some omission or inadequacy in few areas or topics, which would definitely be rectified in future.

We hope you enjoy learning from this book and the experience truly enrich your learning and help you to advance in your career and future endeavours

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় – ক

একক ১ বলাকা কাব্য

একক ২ কাব্য

একক ৩ বলাকা

একক ৪ কবিতাপাঠ

একক ৫ কবিতাপাঠ

একক ৬ পত্রপুট

একক ৭ কবিতা

পর্যায় – খ

একক ৮ চিত্রা- আলোচনা

একক ৯ চিত্রা

একক ১০ চিত্রার কাব্যসৌন্দর্য

একক ১১ পূরবী – সাধারন আলোচনা

একক ১২ কবিতা বিশ্লেষণ

একক ১৩ কবিতা বিশ্লেষণ

একক ১৪ নির্বাচিত কবিতা

কোরপত্র – ৪০১ রবীন্দ্রনাথের কাব্য

পর্যায় – ক

একক ১ বলাকা কাব্য - প্রসঙ্গ কথা, কবিমানস ও কাব্য,
কাব্যের প্রেরণা।

একক ২ কাব্য – উপক্রম, সৌন্দর্যসত্ত্বা, গতিবাদঃ দর্শন, বিজ্ঞান,
ও পাশ্চাত্য জীবনচেতনা ও যুদ্ধসংঘাত, মানবচেতনা,
ঈশ্বরচেতনা, প্রকৃতিচেতনা, যৌবনবন্দনা।

একক ৩ বলাকা – নামকরণ, রবীন্দ্রকাব্যধারায় বলাকা।

একক ৪ কবিতাপাঠ - আলোর ভোরের কবিতা, মৃত্যুর গর্জনের
কবিতা, অন্য কোনখানের কবিতা, গতির কবিতা।

একক ৫ কবিতাপাঠ - গতি থেকে স্থিতি, অসীম থেকে সীমা,
ভাব থেকে রূপ, প্রেম থেকে সৃষ্টি।

একক ৬ পত্রপুট - সাধারণ আলোচনা, পত্রপুট-এর ভাবধারা,
কাব্য আলোচনা ১, কাব্য আলোচনা ২।

একক ৭ কবিতা - নির্বাচিত চারটি কবিতা।

একক ১ বলাকা কাব্য

বিন্যাসক্রম

১.১ প্রসঙ্গ কথা

১.২ কবিমানস ও কাব্য

১.৩ কাব্যের প্রেরণা

১.৪ অনুশীলনী

১.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ প্রসঙ্গ-কথা

রবীন্দ্র-চেতনার মূল প্রত্যয় ঈশ্বরচেতনা, মানবচেতনা ও প্রকৃতিচেতনা। ঈশ্বর চেতনার মূল ভিত্তি উপনিষদীয় চেতনা, এবং তার থেকে জাত সীমার মধ্যে অসীমের অনুভূতি। মানুষের সীমাবদ্ধ ব্যক্তিচেতনায় অসীম ঈশ্বরের অনুভূতি ধরা পড়েছে,-এ রবীন্দ্র-মানসের যেমন একদিকের উপলব্ধি, অপরদিকে তেমনি সকল জাগতিক ও জীবনানুভূতির কেন্দ্রে তিনি মানুষকেই কেন্দ্রীয় সত্তারূপে প্রত্যক্ষ করেছেন; এ তার কবিমানসের অপরদিকে, বিশিষ্টতা। মানুষের মধ্য দিয়েই যেমন ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ, তেমনি আবার জীবন-বিবর্তনের শ্রেষ্ঠ পরিণতি রূপে মানুষের আবির্ভাব,-রবীন্দ্রনাথের কবিমানস এই প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত। সারা জীবন ধরে কবি সবচেয়ে দুর্গম যে আপন অন্তরালে তাকে জানতে চেয়েছেন, মানুষের মধ্যেই বিশ্বসত্যের অম্বিক্তি (revelation), একথা অনু করেছেন, জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে প্রাণ-বিবর্তনের শ্রেষ্ঠ পরিণতিক্সপোজাকে আবিষ্কার করেছেন, এবং তার আত্মার চিরন্তনত্ব সম্পর্কে দৃঢ় নিশ্চয় হয়েছেন। শুধু এই প্রত্যয় ও অনুবই নয়, সঙ্গে সঙ্গে কবি মানুষকে সুগভীর ভাবে ভালোবেসেছেন। যে মানুষ রাষ্ট্রিক, সামাজিক বা প্রাকৃতিক প্রড়নের শিকার সেই মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা তাঁর সাহিত্যের সর্বত্র। এ ভালোবাসা কোনো আদর্শ (ideal), মতবাদ(-ism), বা অহং-পরিতৃপ্তি (ego-satisfaction) জাত নয়। এ-

ভালোবাসার উৎস সীমাবদ্ধ মানুষের মধ্যে অসীম ও অনন্তের দ্যোতনাজাত ও সৌন্দর্যের আবিষ্কারে।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি চেতনা ও সীমাবদ্ধপ্রকৃতির মধ্যদিয়ে জসীমের সৌন্দর্য অনুভবে, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ দুই দিক দিয় সীমাবদ্ধতা (limitation)অতিক্রান্ত প্রাকৃতিক বস্তুর একাত্মিক হওয়ার সঙ্গে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ। এই উপলবিতে, এবং নিজেকে প্রতি একাত্মতায়। তার প্রকৃতি-অনুভবে যেমন সিমাবদ্ধ সত্তাকে সমগ্র ভাবে দর্শন আছে, তেমনি আছে আবার সামগ্রিক প্রকৃতি সত্তায় নিজেকে ব্যাপ্ত কোরে নিয়ে যায় আনন্দ অনুভবে। কবির প্রকৃতি সম্পর্কে ধারনা ক্রমপরিণতির পথে তার বিজ্ঞানচেতনায় ওতপ্রোত হয়ে গিয়েছে। বিশ্বচেতনা কবিমানসে এক নূতন মাত্রায় উপলব্ধীকৃত। বিশেষভাবে বলাকা কাব্যপ্রসঙ্গে এ-কথা প্রযোজ্য। এই কাব্যলোচনায় এ-কথা বার বার ধরা পড়বে।

বলাকা রবীন্দ্র-কবিমানসের বিবর্তনধারাপথে আত্মপ্রকাশ করেছে। রবীন্দ্র চেতনার পূর্বে উল্লিখিত মূল প্রত্যয়গুলি এখানে নূতন উপলব্ধি ও অনুভবে পরিণত হয়ে প্রকাশিত। প্রাকবলাকা কাব্যে কবির অনুভূতি মূলতঃ আবেগের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত, বলাকা কাব্যে তার প্রকাশ বোধি ও বুদ্ধি, জ্ঞানের পথ ও অনুভবের পথ দ্রুতি ও দীপ্তি, বিষয়ের সঙ্গে একাত্মতায় ও নুতন চেতনায়। বলাকা কাব্যে রবীন্দ্রকবিমানসের আরো একটি বিশেষ চেতনা নতুন মাত্রায় ধৃত। সে তার বিজ্ঞানচেতনা। কবিজীবনের শুরু থেকেই এই চেনা ভয় মানস সঙ্গী।এই কাব্যে সেই চেতনা আরও স্পষ্ট, এবং আধুনিক বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-আবিষ্কারের সঙ্গে কবির পরিচয়ের ফলশ্রুতি। বৈজ্ঞানিক নব আবিষ্কার গুলি কবির জ্ঞানভাণ্ডারকেই কেবলমাত্র পুষ্ট করেনি, তাঁর জীবনানুভবেও গভীরতা সঞ্চার করেছে; বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞা তার জীবনদর্শনে পরিণত হয়েছে।

জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান, বা জীববিজ্ঞানের অন্তর্গত জৈব-বিবর্তন বিনই কবির বলাকাকাব্যের বৈজ্ঞানিক-দর্শনের উৎস। বর্তমান গ্রন্থের গতিবাদ ও মানবচেতনা প্রসঙ্গে তার বিস্তারিত আলোচনা পরে দেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কবির জীবনদর্শন ও জীবনদৃষ্টি বিজ্ঞান থেকেই তার প্রাণশক্তি আহরণ করেছে। সারা পৃথিবীতে এমন

বিজ্ঞানসচেতন আর কোনো কবিকে আমরা স্মরণ করতে পারিনা। নব্য আধুনিকতা প্রসঙ্গে এখনকার সমালোচকদের অনেকে বলেন, রবীন্দ্রনাথ এই বিশিষ্টতাকে অর্থাৎ আধুনিকতার নবতম ভাবনাকে কবিতায় ব্যক্ত করেননি বা করতে পারেননি। এ-কথা একেবারেই অযথার্থ।

আধুনিকতা শব্দটির বিশিষ্টতা নির্ধারণে সমালোচকদের সর্বাপেক্ষা সীমাবদ্ধতা, তারা সাম্প্রতিকতাকেই আধুনিক বলতে চান। গত কাল থেকে আজ অধিকতর আধুনিক, একথা সাধারণ জাগতিক ব্যাপারে শীষণ হলেও শিল্পসাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে আরো দুটি শর্ত যুক্ত না হলে আধুনিকতার বাইরে রাখতে হয়। শিল্পের ক্ষেত্রে গতকাল থেকে আজ আধুনিক, যদি তা একটি জীবন দর্শনের বার্তাবহ হয়, এবং সেই জীবনদর্শন অধিকতর প্রগতিশীল হয়। অর্থাৎ সাহিত্যের ক্ষেত্রে অধিকতর আধুনিক বা আধুনিকতম হতে হলে, তাকে হতে হবে ১. সাম্প্রতিককালের এবং ২. একটি বিশিষ্ট জীবনদর্শনের প্রকাশক, ৩. যে-জীবন দর্শন এখনও পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল। প্রগতিশীলতায় এখনও যাকে কেউ অতিক্রম করতে পারেনি। আর প্রগতি অর্থে মানুষের প্রগতি। মানুষের শারীরিক, মানসিক ও চেতনাগত উন্নতি ও ক্রমপরিণতির শেষতম (latest) দ্যোতনাবহ ভাব ধারণ কোরে থাকে যে শিল্প-সাহিত্য, তাকেই বলতে হয় আধুনিকতম।এই দিক দিয়েই রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতম। বৈজ্ঞানিক আধুনিকতম জীবনচেতনার পরিবাহী, কারণ মাহুষের সহায়ক পুষ্টি ও সবাণী পরিণতিসাধনে এর ভূমিকা অনতিক্রম্য। বাঙলাদেশের কোনো বীতে সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানচেতনার এমন পরিপূর্ণ আত্তীকরণ কারো দ্বারা সম্ভব হয়নি। শুধু বিজ্ঞানচেতনার দিক দিয়েও রবীন্দ্রসাহিত্য এখনও আধুনিকতম। অবশ্য কখন কখন বিজ্ঞান থেকে জাত কারিগরিবিদ্যা (technology) প্রগতিবিরোধী হয়ে ওঠে। মানুষের সর্বাঙ্গীণ পরিণতি ও পুষ্টির দ্যোতক না-হয়ে তা হয়ে দাড়ায় ধ্বংসাত্মক। তখন তাকে ধিক্কার না দেওয়া বা তার সঙ্গে আপস কোরে চলাই প্রগতিবিরোধিতা। এবং যা-ই প্রগতিবিরোধী তা-ই অনাধুনিক। ধ্বংসাত্মক হাইড্রোজেন বোমার গুণগান করা বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞা নয়, প্রগতিশীলতা নয়। আধুনিকতাও নয়। রবীন্দ্রনাথ সর্বাত্মকভাবে বিজ্ঞানকে চিত্তে গ্রহণ

করেছেন, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও ধারণার সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন, বৈজ্ঞানিক মানসিকতায় জীবন সত্য পর্যবেক্ষণ ও অনুভব করেছেন। সেদিক দিয়ে তিনি আধুনিকতম। আবার যখন তিনি বোমাবর্ষী বিমানকে ধিক্কার দেন তখনও তিনি কম আধুনিক নন।

কবিমানসের আরো যে-বিশিষ্টতাগুলি তার কবিতায় দীপ্ত আত্মপ্রকাশ করেছে, তা তার যুগসচেতনতা, রাষ্ট্রসচেতনতা ও সমাজচেতনতা। তন্দ্রাচ্ছন্ন যে-ভারতীয় সমাজ সর্বপ্রকার নবজীবনবোধকে উপেক্ষা কোরে অতীতের মধ্যে আত্মগোপনলিপ্সু, হয়ে উঠতে চাইছিল তাকে কবিমন যেমন স্বীকার করতে পারেনি, তেমনি আবার পররাজগ্রাসী সম্প্রসারণবাদী ইউরোপের রাষ্ট্রবাদ তাঁর কবিমানসে গভীর অশ্রদ্ধা এবং বিরোধিতা সৃষ্টি করেছে। বলাকা কাব্যের কবির মনে প্রথম মহাযুদ্ধের ছায়াসঙ্গত হয়েছে দুইভাবে। একদিকে যেমন কবির মনে হয়েছে এই যুদ্ধ সমগ্র - মানবজাতির পাপের ফল; অপর দিকে আবার এই যুদ্ধে ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নবজীবনাগমন, পরাধীন মানুষের মুক্তির পুখ অবারিত হবে , কবি এমন সম্ভাবনাও আগ্রাহ্য করতে পারেননি।

১.২ কবিমানস ও কাব্যপ্রবাহ

রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ পথে আগত বলাকা কাব্যের বক্তব্য ও আঙ্গিকে এক অপূর্ব অভিনবত্ব আছে। রবীন্দ্রজীবনপ্রবাহ পরিণতির মধ্য দিয়ে কবিমানস ভাবা দর্শকেও ক্রমবিবর্তিত ও নবরূপর্বত করতে করতে ক্রম-অগ্রসরমান এবং তারই একটি পর্যায়ে বলাকার আবির্ভাব। কবির কাব্য ও জীবনধারাকে একত্রে নিয়ে আর কয়েকটি ভাগে ভাগ করে তাঁর কবিমানসের প্রকৃতি ও পরিণতি বুঝবার চেষ্টা করছি। রবীন্দ্রমানসের বিবর্তন যেকটি ভাব পর্যায় ক্রম বিশেষিত বলে মনে করি তারা যথাক্রমে: (১) বাল্য, (২) প্রস্তুতি, (৩) প্রাপ্তি, (৪) সংশয়, (৫) গতি, (৬) পরিণতিপর্যায়।

বাল্য পর্যায় কবিমানস কলরব-কাকলিমুখর। কবিতাগুলি তখনও যথাযথ ও যথার্থ (well-defined) নীতিকবিতা হয়ে ওঠেনি। এগুলিকে বলা যেতে পারে অতি-রোম্যান্টিক উচ্ছ্বাস যশ আখ্যানকাব্য। এই পর্যায়ের সময়সীমা ১৮৭৮ থেকে ১৮৮২।

এই সময়ে রচিত হয়েছে রুদ্রচণ্ড, বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া। কবির বয়স তখন ১৭-২১।

দ্বিতীয় প্রস্তুতিপর্যায়। এই পর্যায়ে কবিমানসের প্রাথমিক প্রস্তুতি। জগৎ ও জীবনের সঙ্গে ক্রমশ পরিচয় গভীরতর, মানুষের অধিকতর কাছাকাছি এসে তাকে অনুভব, প্রকৃতিকে ক্ষুদ্রসীমার বাইরে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে অনুভব করা, নারীদেহ সম্পর্কে সচেতনতা। এই পর্যায়ে কবিপ্রতিভার সার্থক উন্মেষ, ভাবগত ও আঙ্গিকগত দিক দিয়ে নিজের ক্ষমতার বিশিষ্টতা অনুত্ব করা, নিজেকে খুঁজে পাওয়া, উচ্ছাসের অতিলেক ও আবেগের উদ্বেলতা পরিহার কোরে সুনির্দিষ্ট গীতি কবিতায় নিজের মনের ভাবকে ব্যক্ত করা। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৬ পর্যন্ত প্রসারিত এই পর্যায়ে রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত ছবি ও গান ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী এবং কড়ি ও কোমল। এই পর্যায়ে কবির বয়স একুশ থেকে পঁচিশ।

তৃতীয় প্রাপ্তি-পর্যায়। পূর্ববর্তী পর্যায় যদি হয় কবির নিজেকে খুঁজে পাওয়া তাহলে এ-পর্যায় জগৎকে খুঁজে পাওয়া। এপর্যায়ে কবির জগৎ-ও-জীবনের সত্য অন্বেষ, তাকে খুঁজে পাওয়া, ও কবিতায় তাকে প্রকাশ করা। এই পর্বে কবির অনুসন্ধান ও অনুভব,- সত্য কী, সুন্দর কী, প্রেম কী, মৃত্যু কী, মৃত্যুতেই কি সভায় সম পরিসমাপ্তি জীবনের উদ্দেশ্য কী, মানুষের স্বরূপ কী; বিশ্বের প্রেক্ষাপটে মানুষের স্থান অন্বেষণ, দেহ ও আত্মায় সপর্ক নির্ধারণ, ক্ষণিকার মহিমা উপলব্ধি প্রকৃতি মানুষ ও ঈশ্বরের সময় নির্ণয়, মানুষ ও ঈশ্বরের সম্পর্কে নানা মাত্রা উপলব্ধির চেষ্টা, সীমার মধ্যে অসীমকে ও খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডকে অনুভব এবং শিল্প সৌন্দর্যে বিশেষিত কোরে সেই অনুভবকে গীতিকাব্যিক রূপদান। মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, কল্পনা, কথা, ক্ষনিকা, নৈবেদ্য, স্মরণ, শিশু এই পর্যায়ের কাব্য। ১৮৮৬ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত এই পর্যায়ের প্রসার। কবির বয়স তখন পঁচিশ থেকে আটচল্লিশ। বহু সাহিত্য-ঐতিহাসিক ও রবীন্দ্র-গবেষকদের মতে এই পর্যায়ই সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। চতুর্থ পর্যায়ের নাম আমরা দেখেছি সংশয়ের পর্যায়। এই পর্যায়ে যেন এলে বাস্তব সত্তায় সংশয় কবি ক্লান্ত, অগতের কঠোর ও কর্মমূখর প্রাণ থেকে সরে অবকাশ অন্বেষণ, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, মনের

গভীরে একান্তে ঈশ্বরকে অনুভব ।খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি এই পর্যায়ের কাব্য। এখন অনুভূতিকে আরো স্বল্পতায় নিমজ্জিত করে দেওয়া ; তাই কবিতা এখানে সঙ্গীতে পর্যবসিত। এই পর্যায় চলে এসেছে ১৯১৩ পর্যন্ত। কবির বয়স আটচল্লিশ থেকে বাহান্নর মধ্যে। এর পরে এলো গতিপর্যায়। এটি তার কাব্যজীবনের পঞ্চম পর্যায়। বলাকা এই পর্যায়ের কাব্য। পূর্ববর্তী পর্যায়ে কবি মানুষের জগৎকে কিছুটা পাশ কাটিয়ে আধ্যাত্মিকতার মধ্যে আত্মনিবেশ করেছিলেন, এ-পর্যায়ে কবি সেই ঈশ্বরানুভবের জগৎ থেকে সরে এলেন না বটে, কিন্তু নূতন প্রবণতায় ও বিপুলতর জীবনস্ফূর্তি নিয়ে মানুষের ও জগতের প্রাঙ্গণে পদসঞ্চার করলেন। পূর্ববর্তী পর্যায়ের যে স্থিতির প্রশান্তিতে তিনি আত্মনিমজ্জিত হতে চেয়েছিলেন, তাকে দুহাতে সরিয়ে দিয়ে কবি চলমান, বিক্ষুব্ধ, বিশ্বান্বিত, আন্দোলিত জগতের দিকে মোহহীন দৃষ্টিতে নেত্রপাত করলেন। এই জগতের মনুষত্রাসী ও মনুষ্যত্বগ্রাসী, অপরের দেশগ্রাসী অজগর-চারিত সাম্রাজ্যবাদ, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মনুষ্য-সাধারণের বিপুল আন্দোলন দেশে-দেশে অবজীবনযৌবনভদীপ্ত মানুষের সবল পদবিক্ষেপ, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে অনুপ্রাণিত মনুষ্যকুল এবং তৎসহ আনুষঙ্গিক বহু কারন পরম্পরা কবির চিত্তে সুতীব্র,অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। আর তারই ফলে সংশয়ের আবরণ সবলে ছিন্ন কোরে নূতন, গতিপন্দিত জীবন চেতনায় কবি উত্তীর্ণ হলেন। জীবনকে নূতনভাবে দেখলেন। আর এর ফলে রচিত হল বলাকা কাব্য। এই কাব্যের বিশিষ্টতা, এখানে জীবনদর্শন,জীবনানুভব এবং তাকে প্রকাশ যত-না আবেগের দৃষ্টিতে, তার অপেক্ষা অনেক বেশি বুদ্ধির দীপ্তিতে, বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞায়। ভাবের আচ্ছন্নতায় সয়, জাগ্রত জীবনবোধের উজ্জ্বল আলোকে এবং সঙ্কীর্ণতা-সীমাবদ্ধ কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর ধারণা, (idea) মাপকাঠিতে নয়, সামগ্রিক বিশ্বচেতনার নিরিখে।

এই কাব্যের আর-একটি বিশিষ্টতা এর আঙ্গিক, বিশেষতঃ এর ছন্দ। এই কাব্যের প্রকাশভঙ্গিতে সঙ্গীত ও চিত্রধর্মের মিলন। তার ফলে কবিতাগুলো মনোগ্রাহী সাবলীলতা পেয়েছে। আর ছন্দের মধ্যে এসেছে একটি অপূর্ব গতিময়তা। স্তবকের অন্তর্গত পংক্তিগুলি অসম মাত্রিক, কিন্তু অন্ত্যানুপ্রাস বর্জিত নয়। কবিতাগুলির ভাবের মধ্যে যে

মুক্তির দ্যোতনা আছে। ভাব ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে একটি বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে। ভাব বুদ্ধিদীপ্ত অথচ তার প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত ও আবেগময় ছন্দের মধ্যে। এই বৈপরীত্যের সম্মিলনে অভিনব সৌন্দর্য-ব্যঞ্জনা।

এই পর্যায়ের প্রথম কাব্য বলাকা। এর প্রকাশকাল ১৯১৬। এই পর্যায়ে আলো যে-সব কাব্য প্রকাশিত তারা হলো পলাতকা (১৯১৮), শিশু ভোলানাথ (১৯২২), পূরবী (১৯২৫), মহুয়া (১৯২৯), বনবাণী (১৯৩১) ও পরিশেষ (১৯৩২)। ১১১২ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত এই পর্যায়ের বিস্তার। কবির বয়স তখন বাহান্ন থেকে একাওর।

পরবর্তী পর্যায় কবিজীবনের শেষ পর্যায় বা ষষ্ঠ পর্যায়। এই পর্যায়ে আমরা নামকরণ করেছি উপসংহৃতি পর্যায় বা অন্তিম পর্যায়। এই পর্যায়ে রয়েছে কবির অবশিষ্ট রচনাগুলি। পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, বীথিকা, পত্রপুট, শ্যামলী, প্রান্তিক, সেঁজুতি, আকাশপ্রদীপ, নবজাতক, সানাই, রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে; এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত শেষলেখা ও ছড়ার কবিতাগুলি এই পর্যায়ে লিখিত। ১৯০২ থেকে এই পারে শুরু যত্ন কবির বয়স ৭১ এবং ১৯৪১ সালের-৩০শেজুলাই এই পর্যায় চলে এসেছে, যেদিন কবি তাঁর জীবনের শেষ কবিতাটি রচনা করেন রোগ শয্যার-আচ্ছন্নতার মধ্যে। কবিতাটি ‘তোমার সৃষ্টির পথ’। এর সাত দিন পরে, সাতই আগস্ট, ১৯৪১ (২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮) কবির মৃত্যু। কবির বয়স তখন আশি উত্তীর্ণ।

এই সময়ের কাব্যপ্রয়াসে ধৃত হয়েছে ও কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে কবির সমকালীন ও পূর্ববর্তীকালে উপলব্ধ সকল জীবন ও অগতানুভবের সারাৎসার। বোধির সঙ্গে বুদ্ধির এবং প্রভার সঙ্গে বাস্তবের সম্মিলনে তারই কাব্যিক প্রকাশ। এই সময়ে তার দৃষ্টিপাত কখনও তার ব্যক্তিগত বিগত দিনের দিকে। কখনও বা প্রাচীন ভারতের কাব্য-সংস্কৃতি-ধর্ম-শিল্প, বা সমকালীন জগতের সামগ্রিক ও খণ্ডিত বিশিষ্টতাগুলির অভিমুখে। এই সময়ের কবিতাগুলিতে কবির এটি বাস্তব সৃষ্টির এক অপূর্ব সম্মিলন। এই সময়কালের মধ্যে রয়েছে তুচ্ছের মধ্যে মহৎ এবং সামান্যের মধ্যে অসামান্যকে অনুভব।

১.৩ বলাকার কবিমানস ও প্রেরণা

সংশয় পর্যায়ের অবসাদের পরই রবীন্দ্রজীবনে প্রাণচঞ্চল গতিপর্যায়ের আবির্ভাব বিস্ময়কর বলে মনে হয়। একথা অবশ্যই সত্য, কবির নিজস্ব মানস-প্রবণতার মধ্যে স্থবিরতা লঙ্ঘনকারী ও পরিবর্তনপিয়াসী আকৃতি' সর্বদাই সক্রিয়। কিন্তু সংশয়-পর্যায়ের পর গতি-পর্যায়ে চেতনায় যে গুণগত পার্থক্য, তা কেবলমাত্র কবির মানসপ্রবণতা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। ভিন্নতর অব্যবহিত কারণ অবশ্যই ছিল। কিছু প্রেরণা (impetus)। তিনটি কারণ কবিকে অনুপ্রাণিত করেছিল জীবনকে ও জগৎকে নবতর উৎসাহে ও প্রজ্ঞার আলোকে অবলোকন ও অনুভব করতে। এই তিনটি কারণ যথাক্রমে (১) কবির য়ুরোপভ্রমণ, (২) কবির নোবেল পুরস্কার লাভ এবং (৩) প্রথম মহাযুদ্ধ।

কবি এর আগে দুইবার ইউরোপ ভ্রমণে গিয়েছেন। কিন্তু এবারের ভ্রমণের অভিঘাত (impact) খুবই তীব্র। কবি প্রথমবার ইউরপে গিয়েছিলেন ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে। যখন কবির বয়স মাত্র সতেরো বৎসর। সেবার শুধু ইংলণ্ডেই ভ্রমণ করেছেন, এবং লণ্ডনেই ছিলেন। ব্রাইটনে এক পাবলিক 'ইস্কুলে এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়াশুনাও করেন। ভারতবর্ষের এবং বিশেষভাবে বাঙলাদেশের কলকাতার সমাজজীবনের অলসগতি মন্দাক্রান্তা-ছন্দের সঙ্গে তুলনায় ইংলণ্ডের জীবনের স্বরিতগতি ও নারীসমাজের স্বাধীনতা কবিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। পাশ্চাত্যজীবনের গতি ও মুক্তি কবির সেই অল্প বয়সেই কবিকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলো। ইয়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে তার যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে। সেবার কবি দেড়বৎসর বিলেতে ছিলেন। এরপর কবির বিলেত যাত্রা ১৮৯০ খৃস্টাব্দে, যখন কবির বয়স উনত্রিশ। কবির সেবারের বিলেত ভ্রমণ মাত্র সাড়ে তিনমাসের, তার মধ্যে আবার বিয়াল্লিশ দিন ‘হাসেন বাস মাত্র একমাসের। এই সময়ে কবিচিত্তে বাইরের অভিঘাতের পরিচয় বিশেষ ভাবে ধরা পড়েনি।

এবার (অর্থাৎ বলাকা-রচনার অব্যবহিত পূর্বে) কবির যুয়োপযাত্রা সম্ভবত তৃতীয়বার। যাত্রা শুরু এগারই মে, ১৯১২। তখন কবির বয়স ৫১-৫২ বৎসর। এবারের যাত্রা

পূর্বের দুবারের যাত্রা অপেক্ষা অনেকাংশে পৃথক। এখন কবি স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত, ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি বোলে বিদ্বৎসমাজে স্বীকৃত, জীবনের বহুবিচিত্র কর্মক্ষেত্রে তার ভূমিকা অবিসংবাদিত, এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে পরিগৃহীত, যদিও বিরোধীদেরও অভাব ছিল না। যুবরাপেরও বেশকিছু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি তার প্রতিভার গভীর ও বৈচিত্র্য অনুধাবন করেছেন পূর্বেই। এখানে আসার পর যেসব মনীষীদের সঙ্গে কবির পরিচয় হলো, তাদের মধ্যে রয়েছেন স্টপফোর্ড ব্রুক, এইচ. জি. ওয়েলস, কবি ইয়েটস প্রভৃতি। বোদেনস্টাইনের সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল। এইসব মনীষীদের মধ্যে ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি পূর্বে উল্লিখিত ইয়েটস-এর ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কবিকে বৃহৎ বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে পরিচিত করালেন। কবিপ্রতিভা এখন বিশ্বমানবের চেতনাকে স্পর্শ করলো। ইংলণ্ডের সর্বাপেক্ষা প্রাজ্ঞ মনীষীদের কাছে তাঁর প্রতিভা বিপুলভাবে সমাদৃত হলো। ১৯১২ ১২ই জুলাই কবিকে একটি সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। তার সভাপতি ছিলেন কবি ইয়েটস। সম্বর্ধনায় ইয়েটস বললেন, একজন আর্টিস্টের জীবনে সেইদিন বড় ঘটনার দিন যেদিন তিনি এমন এক প্রতিভার রচনা আবিষ্কার করেন, যার অস্তিত্ব পূর্বে তার জানা ছিল না। আমার কাব্যজীবনে এই একটি মহৎ ঘটনা উপস্থিত হয়েছে যে, আজ আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্বর্ধনা ও সম্মান করবার ভার পেয়েছি। তার রচিত প্রায় একশোটি গীতিকবিতার গদ্যানুবাদের একটি পাতা আমার সঙ্গে নিয়ে ফিরছি। আমার সমসাময়িক আর কোনো ব্যক্তির এমন কোনো ইংরেজি রচনার বিষয় আমি জানিনে যার সঙ্গে এই কবিতাগুলির তুলনা হতে পারে।

ইংলণ্ডে চারমাস থেকে কবি গেলেন আমেরিকায়, যেখানে আধুনিক যুগমানদের সর্বাপেক্ষা বড় যজ্ঞ শুরু হয়েছে। আমেরিকা মহাদেশের অনেক স্থান কবি ভ্রমণ করলেন, অনেকগুলি রাজ্যে। নিউইয়র্ক, আর্বানা, শিকাগো, বস্টন, কেজি প্রভৃতি স্থানের মনীষী, সাধারণ মানুষ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সঙ্গে তার পরিচয় হলো। য়ুরোপ ও আমেরিকার নবজীবনপ্রবাহ, তার প্রাণশক্তি ও আভ্যন্তরীণ আত্মিক শক্তি এবং আমেরিকাবাসীর বিজ্ঞান- রাষ্ট্র সমাজচিন্তার চিত্তেও চেতনায় প্রবল এক আলোড়ন সৃষ্টি করলো। আর তার সঙ্গে তার প্রতিভার সমারও তাঁর মানসে সঞ্চারিত করলে গভীর

এক অনুপ্রেরণা। তারই ফলে এক দীপ্ত প্রাণ স্ফূর্তি তার জীবনদৃষ্টিকে পরিবর্তিত কোরে দিলো।

ঋতু আসে-যায়, পূর্বের যে উদয়াস্ত ঘটে, ঝড়বাদলের যে মাতামাতি চলে সমস্তকেই একটি বড় আকাশের নিচে স্পষ্ট কোরে দেখা। এবং ইউরোপে গিয়ে প্রত্যক্ষ করলে সেখানে বহমান মানবতার প্রবলতম ধারাটি। শুধু প্রত্যক্ষ করলেন না, তার প্রচণ্ড প্রবাহ আর শিরা-উপশিরাকে অভিষিক্ত করে দিলো। বলাকা-পশ্চাৎস্থিত কবিমানসের প্রধানতম অনুপ্রেরণা এর থেকেই এসেছে।

দ্বিতীয় যে কারণটি কবিচেঙ্গায় প্রবল প্রেরণা ও কবিমানসে নব যৌবনস্পন্দিত উৎসাহ সঞ্চারিত করলো তা তাঁর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি। ১৯১৩ খৃস্টালের ১৫ই নভেম্বর শান্তিনিকেতনে খবর এলো কবি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নোবেল পুরস্কারের উচ্চ অর্থমূল্য, বা প্রথম এশীয়বাসী হিসেবে তা পার সৌভাগ্য যে কবিকে নবজীবন-ববারে উদ্দীপ্ত করেছিলো, এটুকু ভাবলে কবি এবং নোবেল পুরস্কার,-দুরের মাহাত্ম্যই ক্ষুণ্ণ হয়। প্রকৃত পক্ষে প্রাচ্য জীবনয়ে শুরু ও গৌরবের,যে বিষসহায় মূল্যায়ন হচ্ছে, এবং বিশ্বের মহৎ মানুষদের কাছে তার গভীর আবেদন খরা পড়ছে, এই উপলব্ধিই কবিকে নব প্রাণশক্তিতে উদ্বেলিত করেছিল।

কবি পাশ্চাত্যের হৃদয়কে এবং দেহমনকে আরও গভীরভাবে বুঝতে ও সাহিত্যে ব্যক্ত করতে চাইলেন, যা প্রাচ্যকে এমন গভীর মহিমায় অনুভব করতে পারে। পাশ্চাত্যের জড়বাদী (materialistic) সভ্যতার কেন্দ্রে কোন্ সে আত্মিক আকৃতি রয়েছে, যা প্রাচ্যকে এমন গভীর মহিমায় অনুভব করতে পারে, তাকে আবিষ্কারের গূঢ় আকাঙ্গাই কবিকে বলাকা কাব্যরচনায় অনুপ্রাণিত করলো।

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী নোবেল পুরস্কারের অনুপ্রেরণার অন্য একটিদিকউদঘাটন করেছেন। অধ্যাপক বিশী বলেছেন, এতদিন কবি বাঙলার মানদীর তীরে বোসে যা লিখছিলেন, তার প্রতিধ্বনি যখন পাশ্চাত্যের বিরাট প্রবাহের তরঙ্গে বেজে উঠলো, তখন কবি নিজেকে তার সঙ্গে একায় অনুভব করলেন। বুঝলেন, এই নদী একই মহানদীর দুটি শাখা ব্যতীত আর কিছু নয়। এই মরানদীর কবির উপরে ভরা নদীর

আত্মীয়তার দাবি আছে। মানবজীবনকে দেখা এবং সমগ্রভাবে দেখা কবির সাধনা। কিন্তু সেই সমগ্রতা যে কত বিরাট এবং দাবি যে কত প্রচণ্ড তা বুঝতে কবির বাকি থাকল না। এবং সেই দাবি যে আবার তারই কাছে এটাও বিস্ময়ের। এর আগে আমাদের দেশের জীবনযাত্রা কবির কাব্যবস্তু ছিলো। এর সুখদুঃখ, আশা-আশঙ্কা অতীত-ভবিষৎ পরিমাপ কোরে তিনি একটি ঐক্য বোধের মধ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্যের জীবনপ্রবাহ এর কাছে এই ক্ষীণ ঐক্যবোধ শিথিল হয়ে গিয়েছে।

বলাকা কাব্যরচনার পশ্চাতে তৃতীয় যে বিশাল ঘটনার অঙ্গ প্রতিকার কোয়ে গিয়েছে তা সমকালীন বিশ্বপরিস্থিতি ও তৎপ্রস্তুত প্রথম মহাযুদ্ধ। একটা কথা মনে রাখা দরকার, বলাকা কাব্যের অন্তর্গত কবিতা রচনা শুরু মহাযুদ্ধের আগেই।কাব্যের ১ সংখ্যক কবিতা সবুজের অভিযান রচিত হয় ১৯১৪ এপ্রিলের শেষে। আর প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হয় এর প্রায় তিনমাস পরে, ১৯১৪ ২৮শে জুলাই।

কবিতার (৪৫ সং, নববর্ষের আশীর্বাদ) রচনাকাল ১৯১৬-র এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ (বাঙলা ৯ই বৈশাখ, ১৩২৩), যখন যুদ্ধ-শেষের আরও দুই বৎসর বাকি। যুদ্ধ শেষ হয় ১১ই নভেম্বর, ১৯১৮। কবিবন্ধু ও কবির দীর্ঘকালের সঙ্গী এন্ড্রুজ সাহেব তাই বলেছিলেন, কবির কাছে ইউরোপীয় যুদ্ধের আগাম তড়িৎ বার্তা যেন আগেই এসে গিয়েছিল ২য় কবিতা, সর্বনেশে, লিখবার সময়। অবশ্য কবি এ-কথা মানেননি। কবি বলেছেন, আমার এই অনুভূতি ঠিক যুদ্ধের অনুভূতি নয়। আমার মনে হয়েছিল, যে আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসান প্রায়। মৃত্যু দুঃখ ও বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন। সেজন্য মনের মধ্যে অকারণ উদ্বেগ ছিল। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব ২ সংখ্যক ও ৪ সংখ্যক কবিতায় না-থাকলেও সমকালীন বিশ্বপরিস্থিতি যে উক্ত কবিতারচনার প্রেরণারূপে কাজ করেছে'তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। ৪ সংখ্যক কবিতাপ্রসঙ্গে কবির মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য। এই কবিতা (৪ সং) যে-সময়কার লেখা (১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১, খৃ. ১৯১৪-র মে-মাসের শেষ) তখনও যুদ্ধ শুরু হতে দু-মাস বাকি আছে। তারপর শঙ্খ বেজে উঠেছে। ঔদ্ধত্যে হোক, ভয়ে হোক, তাকে বাজানো হয়েছে। যে-যুদ্ধ হয়ে গেলে তা নূতন যুগে পৌছবার

সিংহদ্বার স্বরূপ। আলোচ্য কাব্যের পশ্চাতে যুদ্ধের অন উপস্থিতির প্রমাণ কবিরউক্ত উদ্ধৃতি কবিমানসে সমকাল এবং তৎসহযুদ্ধ যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো কবির মন্তব্য থেকে তা আরও অনুসরণ করার চেষ্টা করা যাক। এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে একটি সর্বজাতিক যজ্ঞে নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করবারহকুম এসেছে। তা শেষ হয়ে স্বর্গে আরোহণ পর্ব এখনো আরম্ভ হয়নি। আরো ভাঙবে, সংকীর্ণ বেড়া ভেঙে যাবে ঘরছাড়ার দলকে এখনো পথে পথে ঘুরতে হবে। পাশ্চাত্য দেশে দেখে এসেছি, সেই ঘরছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে। তারা এক ভাবীকালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে, যে কাল সবজাতির লোকের। চাকভাঙা মৌমাছির দল বেরিয়ে পড়েছে, আবার নুতন করে চাক বাধতে। শাঁখের আহ্বান তাদের কানে পৌচেছে।

১.৪ অনুশীলনী

১। বলাকা কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। বলাকা কাব্যের প্রেরনা কি ছিল?

৩। রবীন্দ্র কবিমানস ও বলাকা- মতামত ব্যক্ত করো।

১.৫ গ্রন্থপঞ্জী

১. বলাকা -১৩৯৫-এর নূতন সংস্করণ, এবং তার গ্রন্থপরিচয়।

২. “পথের সঞ্চয়-রবীন্দ্রনাথ।

৩. কালান্তর-রবীন্দ্রনাথ।

৪. রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ-২য় খণ্ড, ১৩৫৬ সংস্করণ, প্রমথনাথ বিশী

৫. বলাকা কাব্য পরিক্রমা’–৫ম সংস্করণ, ক্ষিতিমোহন সেন

৬. রবীন্দ্রনাথের বলাকা’-অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

৭. রবীন্দ্রজীবনকথা'-১৩৬৬, প্রভাত কুমার মুখপাধ্যায়

৮. রবীন্দ্রবন্দনা'-বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী

৯. ‘কবিতা আধুনিকতা ও আধুনিক কবিতা’-বারীন্দ্র বসু

১০. স্বদেশ কথা ও পৃথিবীর ইতিহাস’-ড. কিরণ চৌধুরী

১১. ‘সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান। (১৯৮৮)

১২. বাঙ্গালা ভাষার অভিধান’-জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (সাহিত্য সংসদ)

১৩. বঙ্গীয় শব্দকোষ’-হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪. বারীন্দ্র বসুর “কবি ও কালান্তর”

একক ২ কাব্য সংক্রান্ত আলোচনা

বিন্যাসক্রম

২.১ উপক্রম

২.২ সৌন্দর্যসত্ত্বা

২.৩ গতিবাদঃ দর্শন, বিজ্ঞান, ও পাশ্চাত্য জীবনচেতনা ও যুদ্ধসংঘাত

২.৪ মানবচেতনা

২.৫ ঈশ্বরচেতনা

২.৬ প্রকৃতিচেতনা

২.৭ যৌবনবন্দনা

২.৮ অনুশীলনী

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উপক্রম

বলাকা কাব্যের কবিতাগুলি দুই বৎসর ধরে রচিত। কবিতাগুলির শেষে বাঙলা তারিখ। তার থেকে দেখা যায় তার প্রথম চৌত্রিশটি কবিতা ১৩২১ বঙ্গাব্দে (এপ্রিল ১৯১৪ থেকে এপ্রিল ১৯১৫) এবং বাকি এগারোটি কবিতা ১৩২২ বঙ্গাব্দে (১৯১৫-র অক্টোবর থেকে ১৯১৬ এপ্রিল) রচিত। কাব্যটি পঁয়তাল্লিশটি কবিতার সংগ্রহ। কাব্যখানি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯১৬ খৃষ্টারের মে মাসে। কবিতাগুলিরচনার স্থানও বিচিত্র। শান্তিনিকেল, রামগড়, কলকাতা, এলাহাবাদ, সুরুল, শিলাইদহ, কাশ্মীর (শ্রীনগরে), রেলগাড়ি, পদ্মার উপর বোটে বসে এবং পদ্মাতীরে। পঁয়তাল্লিশটি কবিতার মধ্যে একটি সনেট (শেকসপিয়র), দশটি সমমাত্রিক (১, ২, ৩, ৪, ৫, ২০, ২১, ৩৪, ৩৫, ৪৩), বাকিগুলি অসমমাত্রিক। অসমমাত্রিক ছন্দকে বলা হয় মুক্তক ছন্দ বা বলাকার ছন্দ। বলাকার

কবিতাগুলি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিলো। তার মধ্যে সবথেকে বেশি সংখ্যক প্রকাশিত হয়েছিলো সুজপত্রে। প্রবাসী ,ভারতী, মানসীতে অন্য কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়।

বলাকার কবিতাগুলি গীতিকবিতা। যদিও এর মধ্যে উত্বের স্থান ব্যাপক। কিন্তু গীতিকবিতার রস আস্বাদনের জন্য তরে অনুপ্রবেশ আবশ্যিক নয়। সার্থক গীতিকবিতায় কবি তাঁর নিজের ভাব ও অনুভব সঞ্চারিত কোরে দেন। তা নিজের কল্পনালোক থেকে আহরিত বা বাইরের জগৎকে নিজের চেতনার রঙে রঙিন কোরে তুলে সেখান থেকে, যেভাবেই হোক না কেন। গীতিকবিতার ভাব (idea) যদি পাঠকের জীবনগত কোনো তাৎপর্য উদঘাটন (revelation) করতে পারে, পাঠকের হৃদয়কে নববধে দীপ্ত করতে না পারে তবে ঐ ভাব অবান্তর, অপ্রয়োজনীয়, কবিতার পক্ষে ভারস্বরূপ। তত্ত্ব যদি দীপ্তি সঞ্চারক হয়,পঠকের চিত্তে নব-উপলগিরণকারী হয়, তবে তাও সার্থক প্রতিকবিতার বিষয়। মনে রাখা দরকার জ্ঞান (knowledge) যদি প্রজ্ঞায় (windom) রূপান্তরিত না-হয়, তাহলে তা কবিতার জঞ্জাল, এবং তা বহন করে গীতিকাব্য নামধারী যে-রচনা তা অকবিতা। বলাকা কাব্যে ভাব (idea) বা তত্ত্ব (doctrine) আছে, এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা প্রজ্ঞাদীপ্তি বা অনুভবের বিষয়ে রূপান্তরিত। তাই তারা কবিতা, গীতিকবিতা।

গীতি কবিতা হতে পারে ভাবধর্মী, যাকে বলা যেতে পারে গীতিধর্মী (idea-কেন্দ্রিক), বা চিত্রধর্মী। ভাবধর্মী কবিতা পাঠককে একটি বিশেষ ভাব বা অনুভবের সঙ্গে একাত্ম করে। চিত্রধর্মী কবিতা প্রকৃতি বা নারী বা উপকরণ-সমুদয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। চিত্রধর্মী, কবিতা আবার কখনো কখনো চিত্রগুলিকে ত্রিমাত্রা দান কোরে তাকে কোরে তোলে ভাস্কর্যধর্মী। রবীন্দ্রপ্রতিভা মুখ্যতঃ সঙ্গীতধর্মী, চিত্রধর্মী রচনাও কিছু কম নেই। আমাদের আলোচ্য বলাকাকাব্য একই সঙ্গে গীতি ওচিত্রকে স্থান দিয়েছে। কোনো কোনো কবিতা ভাবের বা সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যের, কোনো কবিতা বা চিত্রধর্মে। কোনো কোনো কবিতায় দুইয়ের অপূর্ব মিশ্রণ।

বলাকার কবিতাগুলি যখন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিলো তখন তাদের এক একটি নাম ছিলো। পরে, গ্রন্থভুক্ত করবার সময় তাদের সংখ্যাদ্বারা চিহ্নিত করা হয়; যদিও প্রথম আটটির নাম ছিলো মুদ্রণ পর্যন্ত। নামগুলি যকিব ১ সংখ্যক-সবুজের অভিযান, ২ সং—সর্বনেশে, ৩ সং-আমরা চলি সমুখ পানে(পরে বলাকায় প্রকাশিত হওয়ার সময় (মুদ্রণ পর্যন্ত) এর নাম ফুণ হয়, আহ্বান), ৪ সংখ, সং-পাড়ি, ৬ সং-ছবি, ৭ সং-প্রথমে ভাল, পত্রে বলাকার শাজাহান, ৮সং-চঞ্চলা, ৯ সং-তাজমহল, ১০ নং উপর, ১১ সং-বিচার, ১২ সং-দেওয়া-নেওয়া, ১৩ সং-যৌবনের পত্র, ১৪ নং-মাধবী, ১৫ সং-আমার গান, ১৬ সং-রূপ, ১৭ সং-প্রেমের পরশ, ১৮ সং-যা, ১৯ সং-জীবন-মরণ, ২০ সং-যাত্রাগান, ২১.সং-অগ্রণী, ২২ সং মুক্তি ২৩ নং-দুই নারী, ২৪ সং, ২৫ সং-এবার, ২৬ সং—আবার, ২৭ সং-রাজা, ২৮ সং-দেনা-পাওনা, ২১ সং-তুমি আমি, ৩০ সং-অজানা, ৩১ শপুর্ণের অভাব, ৩২ সংসার, ৬৩ সং-প্রেমের বিকাশ, ৩৪ সং খোলা জানালায় ,৩৫ সং-মানসী, ৩৬ সং-বলাকা, ৩৭ সংকড়ের খেয়া, ৩৮ সং নতুন বসন , ৩৯ সং - শেকসপিরর, ৪০ সং-চেয়ে দেখা, ৪১ সং-যে কথা বলিতে চাই, ৪২ নং-অপমানিত, ৪৩ সং-পথের প্রেম, ৪৪ সং যৌবন, ৪৫ সং নববর্ষের আশীর্বাদ। ৪১ সংখ্যক কবিতা যখন সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়েছিলো তখন থেকেই আলাদা কোনো শীর্ষনাম ছিলো না।

আলোচ্য কাব্যের কবিতাগুলিকে আমরা বিষয়ভিত্তিতে কয়েকটি গুচ্ছে ধরতে পারি, কবিমানসের বিশিষ্ট ভাবের প্রতিফলিত পরিচায়ক রূপে।

যথা: (১) যৌবনের প্রবলতা, ইউরোপীয় জীবনের সংঘাত ও যুদ্ধ-১, ২, ৩, ৪, ৫, ১৬, ৩৭, ৪৪, ৪৫।

(২) পিছনে ফেলে-আসা যৌবন স্মৃতি-১৩, ২৫, ২৬

(৩) গতিচেতনা, ভিন্নতর যৌবন-অনুভব, বিজ্ঞানচেতনা, দর্শনচেতনা-৬, ৭, ৮, ১৫, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৪, ৩০, ৩৬, ৪৩ .

(৪) মানুষ ও ঈশ্বর ৬, ৯, ১১, ১২, ১৭, ১৯, ২২, ২৪, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৪১, ৪২.

অবশ্য কখনো কখনো একই বক্তব্য একাধিক কবিতাতে দেখা দিয়েছে। ফলে বহু কবিতার অনন্যতা নষ্ট হয়েছে। কিছুটা একঘেয়েমি সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কোনো কবিতায় একাধিক ভাব-বৈচিত্র্য বিমিশ্র। আলোচনায় তা স্পষ্ট হবে। দুটি কবিতা অনন্য। তাদের কোনো গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তারা দুই নারী (২৩) এবং শেকসপিয়র (৩৯)। সমালোচকদের মতে প্রাক্ বলাকা সংশয়-পর্যায়ের কাব্যে কবি যে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, বলাকায় তা থেকে মুক্তি। কিন্তু একথা ঠিক বলা যায় না। বলাকায়ও ঈশ্বর-চেতনা কিছু কম নেই। পক্ষান্তরে ঈশ্বর-সম্পর্কিত কবিতা সব থেকে বেশি। অবশ্য ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ বলতে যা বোঝায় তা ঠিক এখানে নেই। এখানে ঈশ্বর এক নূতন মাত্রায় ব্যক্ত। তা হলো মানুষের অহংকারপটে উপলব্ধীকৃত ঈশ্বরের স্বরূপ ও সত্তা। এটি কবির মানবিক চেতনারই এক নব প্রকাশ।

২.২ সৌন্দর্য সত্ত্বা

কলাকৈবল্যবাদ বা Art for art's sake-এর সমর্থক অনেকে থাকলেও সার্থক সাহিত্যের অন্তরে জীবনসত্যের প্রকাশ থাকতে বাধ্য। জীবন ও জগতের সত্যকে রসসূতির মধ্য দিয়ে সার্বজনীনতা দানই সাহিত্যের লক্ষ্য। আর তার জন্যই সার্থক সাহিত্য প্রেয়োচেতনার সঙ্গে শ্রেয়োবোধের মিলনের ফলশ্রুতি। কিন্তু এই জীবনসত্য বা শ্রেয়ো-চেতনা উদ্যতমুখ প্রচার-সর্বস্বতা বা উপদেশরূপে দেখা দিলেই আপত্তি এবং সেখানেই লেখকের অক্ষমতা। প্রকৃত সাহিত্যিক বিশিষ্ট জীবনদর্শনের কেন্দ্রীয় তত্ব-কঙ্কালকে রসনাবণ্যস্পর্শে সৌন্দর্য-মূর্তি দান করেন। অন্যথায় তার রচনা দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, সাহিত্য নয়।

শব্দ ও অর্থের সার্থক ও ব্যঞ্জনাময় সহিতত্বে রচিত রচনা যখন আমাদের সৌন্দর্যবোধকে উদ্বোধিত করে, আমাদের অন্তরে ভূমার আনন্দ সঞ্চার করে, মানুষের জগৎ ও বিশ্বজগতের সঙ্গে আমাদের সাধারণীকৃত (universalised) করে, আমাদের সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্বপরিচ্ছিন্ন অহং বোধের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে বাইরের বিপুলতার সঙ্গে একাত্ম করে,-তখনই বলি কাব্য সৃষ্টি হয়েছে। তখন তার অন্তরে যে-তত্ত্ব, যে-দর্শনই থাক-না-কেন, তাকে সাহিত্য বলে গ্রহণ করতে আর কোনো বাধা থাকে না। তখন

সেই তত্ত্ব বা দর্শনকে শুধু জ্ঞানে জানিনা, অনুভূতিতে উপলব্ধি করি। তখন সেই তত্ত্ব আমার ব্যক্তিত্বের বাইরে অবস্থিত তন্ময় (objective) জ্ঞানের সামগ্রী মাত্র নয়, তখন তা আমার চেতনার সঙ্গে একাত্ম মন্ময় (subjective) আত্মোপলব্ধি। এবং তখনই তা রসনিষ্পত্তি বা আনন্দের উদ্বোধনে সার্থক সাহিত্য-পদবাচ্য।

রবীন্দ্রনাথের বলাকা গ্রন্থ তত্ত্ব আশ্রয়ী এ-কথা অনস্বীকার্য। গতিতত্ত্ব, বিপ্লব চেতনা, নবীনবরণ ও মানব-শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়বাহী এই রচনাখানি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য প্রাচীনসাম্প্রতিক, দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক, রাষ্টীয়-মানবিক চেতনার বিচিত্র তাত্ত্বিক পরিচয় নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে। জীবনসত্যের পুজারী কবি জীবনের গভীর অর্থ আবিষ্কার ও প্রকাশ করেছেন এই কাব্যে। ভারতীয় উপনিষদ, পাশ্চাত্য দার্শনিক বের্গসর প্রাণপ্রেরণা (elan vital)-কেত্রিক গতিতত্ব, বৈজ্ঞানিক ডারউইনের বিবর্তন-চেতনা, সমকালীন রাষ্ট্রনীতিক শা◌েত-উন্মত্ততার বিরুদ্ধে ধিকার, দর্শন-বিজ্ঞানমনস্তত্বের দিক দিয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি নানা বিষয়ের প্রতিফলন দেখেছেন এই কাব্যে সাহিত্য-ব্যাখ্যাতাগণ। কিন্তু এই সমস্ত গভীর ও জটিল বক্তব্যগুলি অশোধিত (crude) তত্ত্ব রূপে উপস্থাপিত হয়নি। পক্ষান্তরে বিভিন্ন কবিতায় মধ্যদিয়ে যখন তারা প্রকাশিত হয়েছে, তখন তারা রূপেরসে লাবণ্যে ঝলমল কোলে উঠেছে। আর তার ফলেই তারা কাব্যত্ব পেয়েছে। তত্ত্বের কঙ্কাল কাব্যের লাৰণ্যসারে অপূর্ব সুন্দর সমুর্তি পরিগ্রহ করেছে। তারা তখন কেবলমাত্র আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারে রসদই জোগায়নি, আমাদের আনন্দিত করেছে, আমাদের সামনে রসলাবণ্যময় সৌন্দর্য অভিব্যক্ত করেছে।

কাব্য, দুই শ্রেণীর দ্রুতি ও দীপ্তি। দ্রুতি কাব্য রসের দ্রাবণে আমাদের দ্রব করে। রস অর্থাৎ আনন্দের মধ্যে আমরা নিমজ্জিত হই, সৌন্দর্যের সঙ্গে একাত্ম হই। দীপ্তি কাব্য আমাদের নব বোধ উদ্দীপ্ত করে, আমাদের সামনে জগৎ ও জীবনের কেন্দ্রীয় সত্যকে উন্মোচন (reveal) করে। এ সবই সম্ভব হয় কবির শিল্প চেতনার দ্বারা। এই চেতনার ফলেই কাব্যে-সমর্পিত শব্দ, বাক্যাংশ ও বাক্য বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে নিহিত ধ্বনিময়ত (undertone) ব্যক্ত করে; ফলে, পরিবেশ দেশ ও কালের স্পর্শ-সৌরভ-সঞ্চারিত বিপুল দ্যোতনার সৃষ্টি হয় ; আমাদের সামনে নূতন সৌন্দর্য-জগতের উন্মোচন ঘটে।

বলাকা কাব্যে তাই-ই হয়েছে। কাব্যখানি তার শব্দসম্ভারের বাচ্যাতীত ধ্বনিময়তা, তার বৈদগ্ধ্য-ভঙ্গি-ভণিতি, তার ছন্দগতির প্রবহমানতার মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে অপূর্বপরিচিত এক সৌন্দর্য-বোধিসাতিশয়ী কাব্যের জগৎ উন্মোচিত কোরে দিয়েছে। এই সৌন্দর্য আমাদের আনন্দিত করেছে, এই বোধি আমাদের উদ্বোধিত করেছে, দীপ্ত করেছে, আমাদের কাছে জীবনের নূতন অর্থ সঞ্চার করেছে। আমরা বিপুল প্রকৃতি-জগৎ ও বিশাল মানবজগতের সঙ্গে, তার সৌন্দর্য ও রস, আনন্দ ও বেদনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে, এই বিপুলতা ও বিশালতার সহিত লাভ করেছি। তবে উৎসগুলি আমাদের অনুভূতি-উপলব্ধির সৌন্দর্য-জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমরা দর্শন ছাড়িয়ে সাহিত্যের আনন্দ লাভ করেছি।

উদাহরণ: এই গ্রন্থের 'বলাকা' কবিতাটি (৩৬ সংখ্যক)করি বিশিষ্ট গতিচেতনার নির্বাসিত তত্ত্বরূপ। স্বল্পায়তন এই কবিতাটির মধ্যে অবিরাম গতির জয়গান ধ্বনিত। Becoming, কেবলি হয়ে-চলা, কেবলই গমন-দি কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে নয়, এটিই কবির মুখ্য বক্তব্য। আপাতঃ স্তব্ধতার অন্তরালেও রয়েছে গতির কেন্দ্র,যা স্থিরত্বের মধ্যেও বেগের আবেগ সৃষ্টি করেছে। এই দার্শনিক বক্তব্যই কাব্যে সমর্পিত হয়ে নৈর্ব্যক্তিক তৎ-বৈশিষ্ট্য অতিক্রম কোরে রসামর্থ হয়ে উঠেছে। তার ফলে কবিতাটি ইন্দ্রিয়গ্রায় রূপাব্যিক্তি সাত করেছে।

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা।

আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে-ঢাকা।

বাঁকা তলোয়ার ;

দিনের ভাটার শেষে রাত্রির জোয়ার।

এল তার ভেসে-আসা তাঁরাফুল নিয়ে কালো জলে ;

অন্ধকার গিরিতটতলে।

দেওদার তরু সারে সারে;

মনে হল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,

বলিতে না পারে স্পষ্ট করি, অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।

সহসা শুনি সেইক্ষণে

সন্ধ্যার গগনে

শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।

হে হংসবলাকা,

ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা

রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে

বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

উপরি-উক্ত কাব্যাংশটিতে যে-ফুর্তি আছে, বর্ণনার মধ্যে যে-রহস্যময়তা, বিস্ময় ও উদ্দীপনা আছে, এবং সবকিছু মিলিয়ে যে-আশ্চর্য চিত্রধর্মিতা (images) আছে, তার ফলে এটি একটি সার্থক শিল্পসত্তা লাভ করেছে। আধ-অন্ধকারে ঝিলমের বাকা স্রোতের দীপ্তি, গিরিতটোপরি সার সার স্তব্ধ দেওদার তরু এবং তার বৈপরীত্য (contrast)-রূপে ঝঙ্কা-মদরসে মত্ত' বকপাখির আকাশপরিক্রমা ছবি অতুলনীয়। এরা তত্ত্বের স্থির জগতে আমাদের বদ্ধ থাকতে দেয় না, পক্ষান্তরে এই চিত্রকে অবলম্বন কোরে আমাদের বাসনালোকে একের পর এক আরো চিত্রের তরঙ্গ উঠতে থাকে। আমরা এই জগতের সঙ্গে সহিতত্ব লাভ করি। ঐ রস ও সৌন্দর্যময় প্রকৃতির মধ্যে নিজেদের সম্প্রসারিত কোরে দিই। 'দিনের ভাটার শেষে রাত্রির জোয়ার', 'এল তার তেলে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে', 'সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে', 'অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি', 'শব্দের বিদ্যুৎছটা,' 'ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা' প্রভৃতি বাক্যাংশ বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে অনেক দুর চোলে গেছে, ব্যঞ্জনার অপূর্ব জগত উদঘাটিত করেছে রেখায় রেখায়। ঝিলম নদী হয়েছে অন্ধকারের খাপে ঢাকা তীক্ষমুখ বাঁকা তলোয়ার, দিনরাত এক প্রবহমান নদী স্রোতের মতো একই সঙ্গে নদী

ও বিমূর্ত গতিকে করেছে ব্যক্ত, ঝিলমের কালো জলে তারাদের প্রতিবিম্ব যেন দিবারাত্রির তরঙ্গভঙ্গে ভাসিয়ে-দেওয়া ফুলের মালা, অন্ধকারের আচ্ছন্নতায় প্রকৃতির অর্ধ-অবগুণ্ঠিত প্রকাশ যেন স্বপ্নের আবরণে সৃষ্টির অর্ধস্ফুট বাক্য-উচ্চারণ, আপাতঃ-স্তব্ধ, কিন্তু বাণীবহ। এর সৌন্দর্যময় কাব্যাত্মকতা তুলনাহীন। দ্রুতি এবং দীপ্তিতে, রসে এবং উপলব্ধিতে এ আমাদের অলৌকিক আনন্দের জগতে নিয়ে যায়। সারা কবিতাটির সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত কোরে এই রসের ও দীপ্তির পরিচয়, কোনো বিচ্ছিন্ন স্থানে এ পরিচ্ছিন্ন নয়।

তত্ত্বকে কেন্দ্রে রেখে এমনি কাব্যিক সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি রয়েছে বহু কবিতায়। মনে রাখা দরকার কোনো কবিতা অন্তর্গত বিচ্ছিন্ন চিত্রগুলি খণ্ডিত ভাবে যেমন কাব্যপরিচয়বাহী, তেমনি তারা আবার একটি অখণ্ড সামগ্রিকতায় সমন্বিত হয়ে একটি পরিপূর্ণ রসসত্যের প্রকাশক। অন্যান্য যে-সকল তত্ত্বায়ী কবিতা এমনি সার্থক কাব্যপরিচয়বাহী হয়ে উঠতে পেরেছে, তাদের মধ্যে ছবি' (৬ সংখ্যক) শাজাহান (৭ সংখ্যক), চঞ্চলা' (৮ সংখ্যক), ঝড়ের খেয়া' (৩৭ সংখ্যক) প্রভৃতি উল্লেখ্য।

'ছবি'কবিতায় একটি রেখাবদ্ধ ছবিকে কেন্দ্র কোরে কবির ভালোবাসার পাত্রীকে স্মরণ এবং তার মধ্য দিয়ে স্তম্ভিত গতির উপলব্ধি। কবির গতিশীল জীবন- চেতনার অন্তরে রয়েছে তার প্রেম-প্রেরণারূপ স্থির কেন্দ্রটি (source of potential energy)। এটি শুধু তত্ব নয়, একটি রসউপলব্ধি-ভাই তার প্রেরণার স্পর্শে কবিজীবনের নব নব রূপায়ণ, এই জগতের নূতন নূতন চিত্রসঞ্চার, জীবন নুতন চেতনায় অর্থবহ, প্রকৃতি নব সৌন্দর্যে বিধৃত; ভালোবাসার আলোকেই সব সৌন্দর্যের উন্মোচন :

মরি, মরি, সে আনন্দ থেমে যেত যদি

এই নদী

হারাত তরঙ্গবেগ,

এই মেঘ –

মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।

তোমার চিকন

চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব এতে যদি মিলাইত

তবে

একদিন কবে।

চঞ্চল পবনে লীলায়িত

মর্মর-যুখর ছায়া মাধবীবনের

হত স্বপনের ।

এটি যতটুকু তত্ত্ব, তার থেকে অনেক বেশি কাব্য। কারণ এ অনুভূতির ব্যাপার এবং চিত্রকল্পসমুদয়ের মধ্য দিয়ে এর অভিব্যক্তি। 'শাজাহান' কবিতায় ব্যক্তিসত্তার চিরচঞ্চল গতিময়তার তত্ত্বকথা, কিন্তু কী ট্রাজিক বেদনা ও ধূসর বিষন্নতার কাব্যিক লাবণ্যেই না তার অভিব্যক্তি! সব কিছু ঐশ্বর্যের তুচ্ছ মূল্যহীনতা, বিপুল মোগল সাম্রাজ্যের বিশাল ধ্বংসাবশেষ, গভীর একান্ত কোরে চাওয়ার কী রিক্ত পরিসমাপ্তি, কী করুণ ছেড়ে যাওয়া,আর তার পটভূমিকায় প্রেমকে বাচিয়ে রাখবার, প্রেমের স্মরণমন্দিরকে চিরন্তন কোরে ব্যক্তি সার জয় ঘোষণার কী হাস্যকর প্রচেষ্টা। এই উপলব্ধির চিত্র-অনুভূতি-রস-বন্ধ আশ্চর্য কাব্যিক রূপায়ণ আলোচ্য কবিতাটি। একদিকে ছবির পর ছবি, আশ্চর্য পত কিন্তু অনিত্যতার গভীর বেদনায় নিষিক্ত-সৌন্দর্য ও বেদনার অপূর্ব সম্মিলন, আমাদের অনুভূতির কেন্দ্রে তার অতুলনীয় আবেদন, আবার অন্যদিকে সমস্ত মনুষ্য-প্রচেষ্টার ট্র্যাজিক ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্তার অন্তহীন গতি, এই দুইয়ের মিলনে আমাদের বেধিতে ও বুদ্ধিতে নবচেতনার উন্মেষ ও রসনুভূতির প্রতিষ্ঠা,-সম্মিলিত দ্রুতি ও দীপ্তি কাব্যের পরিচয়বাহী।

দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে ; ..

তব কুঞ্জবনে ,

বসন্তের মাধবীমঞ্জরী -

যেই ক্ষণে দেয় ভরি

মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,

বিদায়-গোধূলি আসে ধুলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।

সময় যে নাই;

আবার শিশির রাত্রে তাই।

নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোল নব কুন্দরাজি

সাজাইতে হেমন্তের অতরা আনন্দের সাজি।

হায় রে হৃদয়,

তোমার সঞ্চয়

দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয় ।

নাই নাই, নাই যে সময় ।

এবং,

সমাধিমন্দির

এক ঠাই রহে চিরস্থির ;

ধরার ধুলায় থাকি

স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি।

জীবনেরে কে রাখিতে পারে।

আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।

তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে,

নম নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।

‘চঞ্চলা’ কবিতাটি বিশ্ব-জাগতিক গতির তাত্ত্বিক রূপায়ণ। কিন্তু নদীর ও নারীর রূপকল্পে বিধৃত, সৌন্দর্য-আতিশয়ী কি অপূর্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ চিত্তমনকারী চিত্রসমুদয়ের সমারোহ। একদিকে নদীর গতিতে অন্তরের গতিময় আনন্দউদ্বেলতা, অপরদিকে নদী ও নারী কেন্দ্রিক অসংখ্য চিত্রসমুদয়ের রসঙ্গে নিমজ্জন। সর্বাপেক্ষা কাব্যসৌন্দর্য-সঞ্চারী চঞ্চলার সেই অভিসারের নিরুদ্দেশ যাত্রা-ঋতুর পুষ্পথালি হাতে উড্ডীন-অঞ্চল এলোকেশী সৌন্দর্য-তিলোতমা, বৈরাগিণী, অভিসারের চঞ্চলতায় বক্ষের মণিহারের দ্যুতি-বিচ্ছুরণ, কর্ণাভরণের বিদ্যুৎ-বিকাশ, যাত্রার আনন্দবেগে সকল পাথেয় ক্ষয়কারী নারীসত্তা

হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী,

চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী,

শব্দহীন সুর।

অন্তহীন দূর

তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া।

সর্বনাশা প্রেম তার, নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া।

উন্মত্ত সে-অভিসারে

তব বক্ষহারে

ঘন ঘন লাগে দোলা-ছড়ায় অমনি

নক্ষত্রের মণি;

আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল;

দুলে উঠে বিদ্যুতের দুল;

অঞ্চল:আকুল

গড়ায় কম্পিত তৃণে,

চঞ্চল পল্লবপুঞ্জে বিপিনে বিপিনে;

বারম্বার ঝরে ঝরে পড়ে ফুল

জুই চাপা বকুল পারুল

পথে পথে।

তোমার ঋতুর থালি হতে।

শুধু ধাও, শুধু বাও, শুধু বেগে বাও

উদ্দাম উধাও;

ফিরে নাহি চাও,

যাকিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।

কুড়ায়ে লও না কিছু কর না সঞ্চয়;

নাই শোক, নাই ভয়,

পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কম ক্ষয়।

‘ঝড়ের খেয়া কবিতার যুদ্ধ-চেতনা ও বিপ্লব-চেতনার সঙ্গে মিলিত হয়। শুনিত, ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উপর খেয়া-পারাপারের ভয়কম্পিত দৃশ্য, মাতা ও প্রেয়সীর অসিক্ত গৃহ-তোরণ দিয়ে মেঘ-গর্জিত, বিদ্যুৎবিদ্ধ আকাশ-তলে নূতন উষার স্বর্ণবার’লক্ষ্য কোরে পথিকের মহাপ্রয়াণ, যুদ্ধ-চেতনার পরিচয়বহ কি গর্তমান মৃত্যুময়তা, তাকে অতিক্রম কোরে আবার নব আশা ও জীবন-বোধদীপ্ত বিপুল চেতনার কি রস সমারহ, উপপ্লবের কেন্দ্রে কি অকুতোভয় উদ্দীপ্ত আহ্বানের কাব্যিক উন্মাদনা

দুর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,

ওরে উদাসীন -

ওই কলনের কলরোল,

লক্ষ যক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।

বহিবন্যা-তরঙ্গের বেগ,

বিষশ্বাস-ঝটিকার মেঘ,

ভূতল গগন।

মূর্ছিত বিহ্বল করা মরণে মরণে আলিঙ্গন;

ওরই মাঝে পথ চিরে চিরে

নূতন সমুদ্রতীরে

তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,

ডাকিছে কাণ্ডারী,

এসেছে আদেশ –

বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,

পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা-কেনা

আর চলিবে না।

ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে

কালোয় ঢেকেছে আলো-জানে না তো কেউ

রাত্রি আছে কি না আছে; দিগন্তে ফেয়ে ওঠে ঢেউ

বাহিরিয়া এল কারা। মা কাদিছে পিছে,

প্রেয়সী দাড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।••

তত্ত্ব কবিতা ছাড়া বলাকায় আরও কিছু কবিতা আছে যেগুলি তত্ত নিরপেক্ষ স্বাভাবিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং অন্তর-অনুভূতির গভীর স্পর্শে ও সুনিবিড় রহস্যময়তায় প্রকৃতকবিতা হয়ে উঠেছে। কখনো কবিতাগুলি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত, কিন্তু উপলব্ধির মানবিকতায় তারা'এই জগতেরই পরসগন্ধসঞ্চারী। যেমন 'উপহার' (১০ সংখ্যক) কবিতা:

তার চেয়ে যবে

ক্ষণকাল অবকাশ হবে,

বসন্তে আমার পুষ্প বনে

চলিতে চলিতে অন্যমনে

অজানা গোপন গন্ধে পুলকে চমকি

দাড়াবে থমকি,

পথহারা সেই উপহার।

হবে সে তোমার।

যেতে যেতে বীথিকায় মোর

চোখেতে লাগিবে ঘোর,

দেখিবে সহসা-

সন্ধ্যার কবরী হতে খসা।

একটি রঙিন আলো কাঁপি থরথরে

ছোঁয়ায় পরশমণি স্বপনের 'পরে,

সেই আলো, অজানা সে উপহার

সেই তো তোমার।

বা,

আজ প্রভাতের আকাশটি এই

শিশির-ছলছল,

নদীর ধারে ঝাউগুলি ঐ

সৌদ্রে ঝলমল, (মানসী/৩৫)

সহজ সরল সরস স্বাভাবিক প্রকৃতি-নৃশ্য। এ যেন ‘পুনশ্চ’ কাব্যের প্রকৃতি-চিত্রের সহজ স্বাভাবিকতার প্রাক-ভূমিকা, তাই স্নিগ্ধ কবিতা। আর একটি কবিতা, অল্প তাশিত কিন্তু বিপুল রস-সঞ্চারী। কবিতাটি ‘দুইনারী’ (২৩ সংখ্যক);

একজন তপোভঙ্গ করি।

উচ্চহাস্য অগ্নি রসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি

নিয়ে যায় প্রাণমন হরি,

দু হাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,

রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,

নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

সৌন্দর্য, উদ্দামতা ও প্রলয়ংকরী শক্তি মিলনে যে প্রমত্তা নারীসত্তা, তারই দিকে যৌবনের অর্থ উৎসর্গীকৃত পঙক্তি কয়টিতে। দীপ্ত কাব্য-সৌন্দর্যই এখানে প্রধান। আর পরের অংশে শান্ত কল্যাণমূর্তি লৌকিক নারীসত্তার কাব্যিক স্পর্শ .....

আরজন ফিরাইয়া আনে

অশ্রুর শিশির স্নানে

স্নিগ্ধ বাসনায়,

হেমন্তের হেমকান্ত-সফল শান্তির পূর্ণতায় ;

ফিরাইয়া আনে।

নিখিলের আবাদ পানে,

অচঞ্চল-লাবণ্যের স্মিতহাস্যসুধায় মধুর।

ফিরাইয়া আনে ধীরে

জীবন মৃত্যুর

পবিত্র সঙ্গম তীর্থতীরে

অন্তরের পূজার মন্দিরে।

এমনিভাবে কবিতাগুলি তকে কেন্দ্রে রেখে বা না-রেশে মানবিক সাং ভূতির স্পর্শসিঞ্চিত অসংখ্য লৌকিক এবং প্রাকৃতিক চিত্রকল্প উপহার দিয়েছে। এবং সেই চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে যে সৌন্দর্য ও আনন্দ ব্যাঞ্জিত ও আভাসিত হয়েছে, তা তাদের প্রকৃত কাব্যর জগতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

রচনার কাব্যসৌন্দর্যের পরিচয় শুধু বিষয়ের মধ্যে থাকে না, বিষয়কে যে আঙ্গিকে ধারণ করা হয় তার মধ্যেও বস্তুত বক্তব্য-অনুসারে আঙ্গিকের বিশিষ্টতা যিনি অনুধাবন করতে না-পারেন তিনি অ-কবি বা ক্ষীণশক্তি কবি। আলোচ্য কাব্যের আঙ্গিক নূতন। নবতর বক্তব্যকে রূপ দেওয়ার জন্যই এই আঙ্গিক। এই আঙ্গিকের শিল্পসৌন্দর্যও অতুলনীয়।

২.৩ গতিবাদ: দর্শন-চেতনা বিজ্ঞান-চেতনা রাষ্ট্র-চেতনা পাশ্চাত্য জীবনের চেতনা ও যুদ্ধ সংঘাত

রবীন্দ্রনাথের জীবন-চেতনা বার বার ভাব থেকে ভাবান্তরে, রূপ থেকে রূপান্তরে গমন করেছে। স্থিতিতে মৃত্যু এবং গতিতে জীবন,-এ কথা কবি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন, এবং তার জীবনে ও সাহিত্যে এই চেতনা বিশিষ্টভাবে প্রতিফলিত, হয়েছ। কখনও এই চেতনা তাঁর সাহিত্যে আবেগরূপে প্রকাশিত, কখনও উপকরূপে, আবার কখনও এই উপলব্ধি গভীর তত্ত্ব-রূপ লাভ করেছে এবং দার্শনিক প্রত্যয়রূপে তার সাহিত্যে হয়েছে

প্রকাশিত, কখনও বা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত রূপে। বলাকা গ্রন্থখানি কবির এই বিশিষ্ট দার্শনিক প্রত্যয়ের বা তত্ত্বের কাব্যিক রূপ। এখানে এ-কথাটি মনে রাখা দরকার যে রবীন্দ্র-জীবনে উপলব্ধীকৃত বিশিষ্ট তত্ব কখন কাব্যবদ্ধ হয়েছে, তখন তা আর তত্ত্বের শুষ্ক কঙ্কাল মাত্র না-থেকে। কাব্যিক রূপ-লাবণ্যে ঝলমল কোরে উঠেছে। বলাকা কাব্যের গতিতত্ত্ব এমনই কাব্যিক সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত। এর কাব্য-সৌন্দর্যের পরিচয় আগেই দিয়েছি। রবীন্দ্র-মানসের গতি-চেতনার বিশিষ্ট পটভূমি রচিত হয়েছে সমকালীন পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য-উপনিষদীয় দার্শনিক চেতনা, উনিশ-বিশ শতকীয় য়ুরোপীয় বিজ্ঞান চেতনা, এবং রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সভ্যতার বিবর্তন-চেতনার সম্মিলিত ফলশ্রুতি দ্বারা। এর সঙ্গে মিলিত ছিল কবির নিজস্ব জীবন-উপলব্ধি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ডারউইনের জৈব বিবর্তনবাদের প্রতিষ্ঠা। বিবর্তনবাদ সমগ্র পৃথিবীর চিন্তাশীল মানুষদের বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। জীবনসংগ্রাম (Struggle for existence), প্রাকৃতি নির্বাচন (Natural selection) এবং যোগ্যতমের সংরক্ষণ (Survival of the fittest) নীতির মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র 'ভাইরাস' লক্ষ কোটি বৎসরের বিবর্তনধারায় পরিবর্তিত হতে হতে আজ উচ্চতম প্রাণী বুদ্ধিশীল মানবসত্তার (Homo sapiens Sapiens) উদ্ভব সম্ভাবিত করেছে। কিন্তু বিবর্তন শুধু জৈব ক্ষেত্রেই নয়, একদিকে আমাদের বিশ্ব (বা বস্তুবিশ্বও) দীর্ঘ বিবর্তনধারার মধ্য দিয়ে পরিবর্তি হতে হতে চলেছে, অপর দিকে মানুষের সমাজ-জীবনও বিবর্তনপথ যাত্রী।নিউটন, আইনস্টাইন, হাইসেনবার্গ, জিন্স, এডিংটন, প্লাঙ্ক প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক এবং হাট স্পেনসার, কোঁৎ, ম্যাকাইভার, পেজ, গিন্সবার্গ প্রভৃতি সমাজতাত্বিক দের গবেষণার দ্বারা এই সত্য প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য দার্শনিকরাও বহুদিন ধরে বিবর্তনবাদের কথা বলে আসছিলেন। অবশ্য প্রাচীন কালের একমাত্র এরিস্টটলের কথা বাদ দিলে, এদের চিন্তা মুখ্যতঃ জৈববিবর্তন-চেতনার প্রভাবের ফলশ্রুতি। হার্বাট স্পেন্সার, আঁরি বের্গস, সিলয়, মর্গান, মুয়েল আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি দার্শনিক দিক দিয়ে বিবর্তনবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আইনস্টাইন, জেমস জিনস, হাইসেনবার্গ, আর্থার এডিংটন প্রভৃতি বিশ্ববিবর্তনবাদীদের মতে এই বিশ্ব তার অভ্যন্তরস্থ সব-কিছু নিয়ে ক্রমপ্রসারণশীল। একটি মতে এই

প্রসারণ এক সময়ে চরম সীমায় আসবে এবং তখন আবার শুরু হবে কমসঙ্কোচ। পেণ্ডুলামের মতো অনন্তকাল ধরে এই ক্রমপ্রসার ও ক্রমসঙ্কোচ চলবে। অন্য মতে প্রসারণের শেষে বিশ্ব বুদবুদের মতো ফেটে যাবে। কেউ-বা বলেন বিশ্বের সমস্ত বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। এই হলো বিশ্বের চরম পরিণতি। একে বলা হয় entropy doom। সেটাই হলো প্রলয়। বিশ্ববিবর্তনের ফলেই এই বিশ্বের বস্তু এবং শক্তি (matter এবং energy)-র সৃষ্টি এবং তার থেকেই বস্তুজগতের বিবর্তন-নীহারিকা, নক্ষত্র, গ্রহ এবং গ্রহের বুকে প্রাণ, প্রাণের নব নব জটিল রূপপরিগ্রহণ। এই বিবর্তনের ফলে স্থান ও কালের (Time এবং Space) অনুভূতি। প্রতি মুহূর্তে এ-বিবর্তন ক্রিয়াশীল।

দার্শনিক বিবর্তন-চেতনাও বৈজ্ঞানিক বিবর্তনচেতনার মতোই, গতিই যে বিশ্বের একমাত্র এবং চরম সত্য, এই মতের সমর্থক। দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারের মতানুসারে বিবর্তন-প্রক্রিয়ার দ্বারা অনির্দিষ্ট অসংবদ্ধ একরূপধারী জড়বস্তু অপেক্ষাকৃত সুনির্দিষ্ট সুসংবদ্ধ বহুরূপের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়। এটি তার First Principles (১৮৬২) নামক গ্রন্থে প্রকাশিত। তার মতে ক্রমবিকাশ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল, যান্ত্রিক (mechanical) এবং বহুলাংশে প্রাক-উদ্দেশ্যনিয়ন্ত্রিত।

দার্শনিক আঁরি বেগ, স্পেন্সারের মতকে আরও উন্নত ও ত্রুটিমুক্ত করেন। তিনি Creative Evolution (১৯০৭) নামক গ্রন্থে তার দার্শনিক বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। বের্গসঁর মতে এই বিশ্বে কাল (Time)-সহ সবকিছুই পরিবর্তনশীল। তিনি তাঁর গ্রন্থে এই বক্তব্য রেখেছেন : To exist is to change, to change is to mature'- প্রাণের স্বরূপ গতি এবং গতির ফলেই তার পরিণতি সম্ভব। তিনি স্পেন্সারের মতো বস্তুর বিবর্তনকে পরিবেশগত ও যান্ত্রিক বা◌েলে স্বীকার করলেন না। পক্ষান্তরে তিনি একে আভ্যন্তরীণ প্রাণশক্তি (elan vital') ক্রিয়াজাত বলে রায় দিলেন। তিনি আরও বললেন যে এই ক্রমবিকাশ কোনো প্রাক্-উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, non-deterministic। কম বিকাশের প্রত্যেক স্তরে নব নব জিনিসের উদ্ভব হয়, অর্থাৎ এই

ক্রমবিকাশ সৃজনশীল। জগতের যাবতীয় পরিবর্তনের পশ্চাতে যদিও একই প্রাণ-প্রেরণা ক্রিয়াশীল, কিন্তু তাদের অন্তিম পরিণতি এক নয়।

বের্গসঁর পরেও মর্গান, আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি গণনিকের বিবর্তনের গতি প্রকৃতি নিয়ে চিন্তা করেছেন। কিন্তু তা বলাকা-উত্তর কালের ব্যাপার,সুতরাং আমাদের আলোচনা-বহির্ভূত। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলা হয়, তিনি বের্গসঁ দার্শনিক চেতনা দ্বারা সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং বলাকাকাব্যে তারই সর্বাধিক প্রতিফলন।

কিন্তু প্রত্যক্ষতঃ রবীন্দ্রমানসের বলাকা রচনাকালীন গতিদর্শন তার রাষীয় ও সামাজিক চিন্তার ফল। সমকালীন য়ুরোপের ও য়ুরোপ-অধিকৃত সারা পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় পটভূমি ও সামাজিক প্রেক্ষাপট কবির মনে এক শ্রেয়-পরিণতিসম্পন্ন বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার চিন্তা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। Industrial Revolution বা শিল্প বিপ্লবের ফলে য়ুরোপ যে প্রভূত যান্ত্রিক শক্তির অধিকারী হয়েছিল, তাকে সফল কোরে য়ুপীয়গণ য়ুরোপের বাইরে অন্যান্য মহাদেশে কলোনি-স্থাপন ও উৎপাদিত সামগ্রীর বাজার পাওয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল। অবশ্য তারও আগে রেনেসাঁসের ফলে য়ুরোপ জগৎ-আবিষ্কারের প্রেরণায়; সমুদ্রযাত্রা করেছিল এবং নূতন নূত্র দেশে গিয়ে পৌছেছিল। এর ফলে নবশক্তির য়ুরোপীয় দেশগুলি অন্যান্য দেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছে এবং স্থানীয় দুর্বল ও সরল অধিবাসীদের নানাভাবে প্রবঞ্চিত ও স্বশাসণ করেছে। প্রাচীন সংস্কারাচ্ছন্ন জীবনসম্পর্কে-হৃতমূল্য স্থানীয় জনসাধারণ এই প্রবঞ্চনা ও শশাষণের বিরুদ্ধে কোনো সার্থক প্রতিরোধ সৃষ্টি বা প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে পারেনি। এমনই ভাবে য়ুরোপের বাইরে প্রায় অয় সকল মহাদেশে য়ুরোপীয়দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আফ্রিকা টুকরো টুকরো হয়ে । য়ুরোপের বিভিন্ন জাতির কলোনির আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করেছে, আমেরিকার স্থানীয় সভ্যতা সমূলে ধ্বংস হয়েছে, এশিয়া-মহাদেশে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ বৃটিশের পদানত হয়েছে, আফিঙ-এর পিণ্ডে চীনকে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত করবার ব্যবস্থা হয়েছে সম্পূর্ণ।

এর পর স্বার্থান্ধ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বেধেছে সংঘাত, কে পৃথিবীর আধিপত্য গ্রহণ করবে। য়ুরোপীয় আধিপত্যের এই অজগর গ্রাস থেকে সমগ্র পৃথিবীকে মুক্ত করবার জন্য

প্রয়োজন দেখা দিয়েছে স্থানীয় অধিবাসীদের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আত্মিক সচেতনতার, শ্রেয় চেতনাত্মক নবতর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সংস্কারমুক্ত নবজীবনায়নের, প্রাচীন স্থবিরত্ব থেকে নবতর জীবনাবেগের মধ্যে পদচারণার। কবিমানসহিত গতিচেতনার প্রত্যক্ষ সমিধ সংগৃহীত হয়েছে এই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক চিন্তা থেকে।

রবীন্দ্রমানসের গতিচেতনা উপরি-উক্ত তিনটি কারণের সম্মিলিত ফলশ্রুতি। সমকালীন দর্শনচেতনা, বিজ্ঞানচেতনা ও রাষ্ট্রিক-সামাজিকচেতনা কবিমানসে যে আলোড়ন ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলো, এবং যে-সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলো, তার ফলে কবি বুঝতে পেরেছিলেন, গতিই সত্য ; নব-নব রূপের মধ্য দিয়ে জীবনের নব নব অভিব্যক্তিই যেমন সৃষ্টির সার কথা, তেমনি সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অত্যাচার-চিহ্নিত স্থিতাবস্থা থেকে মুক্তির জন্য বিপ্লব দরকার। স্থিতি, গতিহীনতা, থেমে যাওয়া বা থেমে থাকাই ব্যক্তিগত, জাতিগত কা প্রাকৃতিক মৃত্যুর কারণ।

কিন্তু উপরি-উক্ত পাশ্চাত্য গতিচেতনার সঙ্গে রবীন্দ্র উপলব্ধীকৃত গতিচেতনার পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য গভীরতলসঞ্চারী। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদ বা দার্শনিক বিবর্তনবাদে যে-গতির কথা আছে, তা কোনো স্থির ধ্রুব গন্তব্যের দিকে : পদসঞ্চারী নয়'; এ শুধু অকারণ ও অবারণ পথচলা, শুধু রূপ থেকে রূপান্তর, কেবলই হয়ে ওঠা-becoming। কিন্তু কেন এই হয়ে ওঠা, কোন্ ধ্রুব শেয়কে অভিব্যক্ত করবার জন্য, তার কোনো সদর্থক উত্তর নেই। একের মৃত্যুতে সেখানে অপরের - অগ্রগতি, সেই অপরও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরবর্তীর অগ্রগতির সূচনা করে। সেখানে

এক-একটি স্তরের সৃষ্টি, কেবলমাত্র পরবর্তী শুরকে অভিব্যক্ত করবার জন্য। চিরন্তন ' এই প্রবাহ-eternal flux। কিন্তু কেন? কোন পরিণতিতে গিয়ে, কোন্ সার্থকতায় গিয়ে, কোন্ গন্তব্যে পৌঁছিয়ে শান্ত হওয়ার জন্য?

যদিও বলাকাকাব্যের কবিমান এই অকার-অবারণ গতির অতি কাছাকাছি গিয়েছিলো, তবুও শেষপর্যন্ত এই অর্থহীন পরিণামহীন গতিকে চরম সত্য বোলে স্বীকার করতে পারেনি। রবীন্দ্রমানস শেষপর্যন্ত শেষ পরিণতি ও ধ্রুব গন্তব্যে বিশ্বাসী। এর অন্যতম কারণ রবীনসহ বিশিষ্ট জীবন-চেতনার উৎস যত-না পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক

চেতনায়, তার অপেক্ষা অনেক বেশি প্রাচ্য উপনিষদীয় চেতনায়। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের স্তনপষ্ট শিশু। আবাল্য তার মন উপনিষদ থেকে সমিধ সংগ্রহ করেছে। উপনিষদেও গতির কথা আছে বটে, অনেক গভীর ভাবেই আছে, কিন্তু সে-গতি অকারণ অবারণ অনির্দেশ্য নয়, তা একটি স্থির সত্যে। ব্যাপ্ত, পরম ঐক্যে বিধৃত। সে গতি স্থির লক্ষ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, নিশ্চিত উদ্দেশ্য দ্বারা চিহ্নিত ; সে গতি পরিণতিতে এক পূর্ণতার তীর্থ-অভিযাত্রী। | ভারতীয় আর্য ভাষায় 'জগৎ' শব্দের অর্থই 'যা গমন করছে' অর্থাৎ যা গতিশীল। ভারতীয় আর্য চেতনায় এই জগৎ বা বিশ্ব সর্বদাই গতিময়, জঙ্গম। এই জগতের সঙ্গে সঙ্গে এর অভ্যন্তরস্থ, এতে প্রতিষ্ঠিত সকল কিছুও গতিশীল। ঈশোপনিষদে'র প্রথম শ্লোকেই বলা হয়েছে,

ঈশা বাস্তমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধন।

(৭ম উদ্বোধন সং থেকে উদ্ধৃত) ।

অর্থ : জগতে অর্থাৎ গতিশীল বিশ্বে যা-কিছু আছে, সবই গতিশীল; কিন্তু এ সবই একমাত্র ঈশ্বরদ্বারা আচ্ছাদিত। অর্থাৎ গতিশীল হওয়া সত্বেও সবকিছুই ঈশ্বরের মধ্যে বিস্তৃত। তাকে অতিক্রম কোনো গতিশীলের পক্ষেই সম্ভব নয়, কারণ সব গতি তাতেই ব্যাপ্ত। এই গতিশীল জগতে ত্যাগের দ্বারা ভোগ করো, কারও ধন আকাকা কোরো না। ত্যাগ করে, অর্থাৎ কোনো কিছুতে স্থায়ীভাবে লিপ্ত হয়ে যেও না। কারণ জীবনোপভোগ বা বেঁচে থাকার অর্থইসব-কিছু ছাড়তে ছাড়তে কেবলই চলা। এই চলার পথে কোনো বস্তুকে পরমঐশ্বর্য মনে কোরে তাতে লিপ্ত হয়ে সেখানে স্থির হয়ে যাওয়াই মৃত্যু। তাতেই জীবনোপভোগ তথা জীবন-প্রবাহের শেষ। তাই ছাড়তে ছাড়তে, ত্যাগ করতে করতে চলাই প্রকৃত পক্ষে জীবন ভোগ করা। কিন্তু তবুও ভয় নেই। কারণ সকল চলমানতাই ঈশ্বরে বিধৃত। আকাশ যেমন কোরে সমস্ত বিশ্বকে ঘিরে আছে, সমস্ত বিশ্বের নীড় বা আশ্রয় যে-আকাশ, তারই মতো। তিনি ধ্রুব, তিনিই পরম। অতএব এই গতি অকারণ অবার অব অভিমুথে পরিচালিত নয়।

এমনভাবে প্রাচ্য উপনিষদে গতির কথা এবং এর গন্তব্যের ইঙ্গিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গতিচেতনা শেষ পর্যন্ত প্রাচ্য উপনিষদীয় চেতনার সমধর্মী। উপনিষদীয় ভাবলালিত রবীন্দ্রমানসের গতিচেতনার পশ্চাতে সম্ভবত এই উপনিষদীয় গতিই প্রেরণা রূপে সঞ্চারিত। আর তারই ফলে রবীন্দ্রনাথ অকারণ অবার গতির কথা বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত গতির পরিণামে এক পরম সত্য, এক অদ্বৈত সত্তাকে উপলব্ধি করেছেন। সমস্ত ক্ষয়িষ্ণু ও পরিবর্তনশীল শক্তি ও মূল্যবোধের সম্মুখে তাই কবির অকম্পিত বাণী,- 'শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক'।

পাশ্চাত্য দার্শনিক-অভিব্যক্তিবাদ বা বিবর্তন-চেতনার মতো উপলব্ধিও উপনিষদে আছে। বের্গসঁর প্রাণবেগের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার ফলে বিস্ফোরণধর্মী বিবর্তন'-চিন্তার বহু আগে উপনিষদের কবিরা চিন্তা করেছিলেন, পরম কারণ বা আদি সত্তা বা ভগবান বিস্ফারিত হয়ে অভিব্যক্তি ঘটাতে ঘটাতে চলেছেন। 'তৈত্তিরীয়োপনিষদে (২।৬) বলা হয়েছে,

সোহকাময়ত-বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোতপ্যত। স তপস্তপ্ত।। ইদং সর্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট। তদেবাভাবিশৎ। (উদ্ধৃতি-ঐ)

অর্থ : সেই পরমাত্মা কামনা করলেন, "আমি বহু হব, আমি উৎপন্ন হব। তিনি সৃষ্টি-বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করলেন। তিনি জ্ঞানালোচনা কোরে সব-কিছু সৃষ্টি করলেন। তিনি সৃষ্ট সব-কিছুর অন্তরে প্রবেশ করলেন।

ছন্দপোনিষদে (৬।২।৩) বলা হয়েছে

অদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোহসৃজত তত্তেজ ঐকত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোস্জত। (৫ম উদ্বোধন সং থেকে উদ্ভূত)।

অর্থ : উক্ত সৎ ঈক্ষণ করলেন, আমি বহু হব, প্রকৃষ্টরূপে আত হব। তিনি তেজ সৃষ্টি করলেন। সেই তেজ ঈক্ষণ করলেন, আমি বহু হব, প্রকৃষ্ট রূপে জাত হব। উক্ত তেজ জল সৃষ্টি করলেন।

উপরি-উক্ত স্থলসমূহে এবং উপনিষদের আরও বহুস্থানে সৃজনশীল বিবর্তন চেতনার অনুরূপ চিন্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই চিন্তার প্রভাব রবীন্দ্রমানসে অস্বীকার করা

যায় না। এই চিন্তাই কবিকে অকারণ অবার গতির খুব কাছে নিয়ে গিয়েও আবার স্থির প্রত্যয় ও পরম গন্তব্যের অভিমুখে পরিচালিত করেছে।

গতির পরিণতিই শুধু স্থির গন্তব্যের অভিমুখে-পদসঞ্চারী নয়, কৰি উপলব্ধি করেছেন সকল গতির কারণ, সকল বিবর্তনের মূলে এক কেন্দ্রীয় স্থির পরম সত্য, এক অদ্বৈত সত্তা। কবির এই চিন্তার সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের মূল উত্বের মিল আছে। potential energy-কে যেমন আপাতগতিহীন মনে হয়, কিন্তু তার থেকেই অভিব্যক্ত হয় kinetic energy (যেমন ব্যাটারির অভ্যন্তরস্থ স্থির বিদ্যুৎ কোথাও আলোক রূপে, কোথাও তাপ রূপে, কোথাও শৈত্য রূপে, কোথাও যান্ত্রিক শক্তি রূপে অভিব্যক্ত), তেমনি বিশ্বের যাবতীয় গতিচেতনার কেন্দ্রে আছে স্থির potential উৎস। বের্গসঁর clan vital বা প্রাণশক্তি সম্পর্কিত চিন্তার সঙ্গে এই চিন্তার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কবির মতে প্রেমই' সেই potential উৎস। প্রেমই প্রেরণারূপে কেন্দ্রে অবস্থান কোরে সকল কিছুকে (ব্যক্তিসহ) ক্রিয়াশীল কোরে তোলে।

সমগ্র বলাকা কাব্যে নানা ভাবে এই গতির কথা রয়েছে। উদাহরণ দিয়ে আমাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করা যাক।

প্রথমে অকারণ অবারণ উদ্দেশ্যহীন গতির কথা। আমাদের এই বিশ্বজগৎ চিরন্তন গতির মধ্য দিয়ে ক্রমঅভিব্যক্ত হয়ে চলেছে, একথা জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞান (Astrophysics)-এর কথা। এই বিশ্বাভিব্যক্তির কথা আলোচ্য কাব্যের চঞ্চলা (৮ সংখ্যক) কবিতায়। স্থানের ত্রিমাত্রা ও কালের একমাত্র দ্বারা গ্রথিত চতুর্মাত্রিক বিশ্বজগৎ এই কবিতায় নদীর রূপে সঙ্কেতিত (symbolised)। বিরাট বিপুল অবিচ্ছিন্ন প্রবহমানতার দ্বারা নদীর মতোই এই বিশ্ব সচল সঞ্জীবিত এবং আবর্জনামুক্ত হয়ে আছে। নদীর তরঙ্গসমূহের পারস্পরিক সংঘর্ষে যেমন ফেরাশি উত্থিত হয়, তেমনি এই গতিশীল বিশ্বপ্রবাহের আভ্যন্তরীণ শক্তি (energy) ও বস্তুকণা-সমূহের পারস্পরিক সংবাতে সৃষ্ট হয় বিপুল বস্তুপুঞ্জের-নীহারিকানক্ষত্র গ্রহ-উপগ্রহের ; বুদবুদের মতো উত্থিত হয় সূর্যচন্দ্রতারা যত' এবং বিশ্ব প্রবাহের ঘূর্ণাবর্তে তারা হয় ঘূর্ণমান

হে বিরাট নদী,

মন্তব্য

অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল

অবিচ্ছিন্ন অবিরল

চলে নিরবধি।

স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে

বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে

পুঞ্জ পুঞ্জ বফেনা উঠে জেগে ;

আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে

ধাবমান অন্ধকার হতে;

ঘূর্ণাচক্রে তুরে ঘুরে মরে ।

স্তরে স্তরে

সূর্ণচন্দ্রতারা যত

বুদবুদের মতো

এই কবিতার মধ্যে কবি পাচাত্য-দর্শনাৰিত অকারণ এবং অবারণ গভির খুব কাছে এসে পৌছিয়েছে। চঞ্চলাকে লক্ষ্য করে কবির উক্তি

হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী,

চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী,

শব্দহীন সুর।

অন্তহীন দূর

তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া।

নদীর গতির মতো বিশ্বপ্রবাহের গতিময়তা বিশ্বকে নির্মল এবং অনাবিল রাখে, অপরিবর্তিত আবর্জনাস্তূপের অচল বিকারে বিশ্ব রুদ্ধ হয়ে যায় না। গতি আছে বোলেই একই রূপের একঘেয়েমিতে বিশ্ব বদ্ধ না-হয়ে নব নব রূপ-বৈচিত্র্যে অপূর্ব হয়ে উঠছে। এই গতির ফলেই বিশ্বে দেখা দেয় নব নব পৃথিবী, পৃথিবীতে দেখা দেয় নব নব ঋতু। গতির স্পর্শেই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নূতন জীবন হয় সম্ভাবিত। প্রসঙ্গতঃ যাত্রা (১৮ সংখ্যক) কবিতাটি স্মরণীয়। স্থির হয়ে থাকা, এক জায়গায় রুদ্ধ হয়ে যাওয়াই সব থেকে দুঃখের, স্থবিরত্বই মৃত্যুর অগ্রদূত, বস্তুতারের নিচে চাপা পড়ে যাওয়ার ফলে বিশ্বের আনন্দযজ্ঞ থেকে নির্বাসন। তাই কবির বাইরে প্রয়াণ, যাত্রার আনন্দগানে জীবনের মূল্য অন্বেষণ

যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি।

ততক্ষণ জমাইয়া রাখি ।

যত-কিছু বস্তুভার।

ততক্ষণ নয়নে আমার

নিদ্রা নাই।

ততক্ষণ এ বিশ্বের কেটে কেটে খাই

কীটের মতন;

আমি তো মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে।

রব না ঘরের কোণে থেমে।

আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা,

হাতে মোর তারি তত বরণডালা।”

ওরে মন,

যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি

অনন্ত গগন।

কবি নিজের অন্তরেও এই বিশ্বজাগতিক গতি অনুভব করেছেন। অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা কবিকে আজ করেছে উতলা এবং কবি তার। নাড়ীতে নাড়ীতে চঞ্চলের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। পশ্চাতের সর্বপ্রকার বাধাকে অস্বীকার কোরে কবি এই গতির আহ্বানে সাড়া দিতে চান। নিজেকে লক্ষ্য কোরে কবির উক্তি, -

সম্মুখের বাণী।

নিক তোরে টানি

মহাস্রোতে ।

পশ্চাতের কোলাহল হতে

অতল আঁধারে-অকুল আলোতে। (চঞ্চলা)

এই পরিণতিহীন অভিব্যক্তির আরও পরিচয় ৩৬ সংখ্যক কবিতায়, যে কবিতাটির নামে সমগ্র কাব্যগ্রন্থটি পরিচিত। কবিতার নাম বলাকা। এই নামটির মধ্যেও গতির অপূর্ব ব্যঞ্জনা-নামকরণ প্রসঙ্গে আমরা সে আলোচনা করেছি। কবি উপলব্ধি করেছেন, আপাতস্থির-প্রতীয়মান এই বিশ্বজগতের অন্তরালে গতির কেন্দ্রটি চিরন্তন রূপে সক্রিয়। বাইরে থেকে দ্রুত বোঝা না গেলেও ভিতরে ভিতরে গভীর পরিবর্তন চলেছে, এবং নব নব বিবর্তিত রূপগুলি দীর্ঘ কালসীমায় নিজেদের অভিব্যক্ত করছে। যাকে বাইরে থেকে স্তব্ধ বলে মনে হয়, তার অন্তরে থাকে 'বেগের আবেগ' বা potential energy। এই শক্তিই বাইরের kinetic energy-রূপে অভিব্যক্ত হয়। এই 'বেগের আবেগের কেন্দ্রীয় তত্ত্বটি বের্গসঁর clan vital'-এর সঙ্গেও তুলনীয়। এরই প্রেরণায় জগৎ সব-কিছুর অভিব্যক্তি। যে নক্ষত্রকে আপাতস্থির-প্রতীয়মান। হয়, আকাশের প্রেক্ষপটে তার মহা-অয়ন ছাড়াও তার থেকে বিকীর্ণ আলোক তরঙ্গও কি বিপুল গতিতেই না বিশ্ব-পরিভ্রমণরত। আলোকের এই তরঙ্গই বিশ্বের অন্ধকারকে কম্পমান কোরে তুলছে। কবি উপলব্ধি করেছেন, পৃথিবীর জল-স্থল পাহাড়-অরণ্য ব্যাপ্ত কোরে যেমন চলেছে ভৌগোলিক বিবর্তন, তেমনি এই পৃথিবীর সকল জীব, মানুষ, মনুষ্য-সভ্যতা, মনুষ্য-

সমাজও দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কম-পরিবতিত ও ক্রম-অভিব্যক্ত হতে হতে চলেছে। কোথায় কোন জৈব বীজ বা চিন্তার বীজ বা আদর্শের বীজ জন্মলাভ কোরে সকলের অলক্ষিতে উদগত-অঙ্কুর হয়ে ফোম বনস্পতির সম্ভাবনাকে দ্যোতিত কোরে চলেছে, সঙ্কীর্ণ কালসীমাবদ্ধ প্রাণীর কাছে তা তখনই ধরা পড়ছে না। কোন অস্পষ্ট সুদূর অতীতে মানুষের কত চিন্তা-ভাবাদর্শের জন্মলাভ! সেই চিন্তাভাবাদর্শ মনুষসভ্যতায় অনঙ্গ থেকে তার নব নব অভিব্যক্তি ঘটিয়ে তাকে সুদুর এখনও-অক্ষুট ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করছে নব রূপায়ণ লাভ করবার জন্য

তৃণদল

মাটির আকাশ-'পরে ঝাপটিছে ডানা;

মাটির আঁধারণীচে, কে জানে ঠিকানা,

মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা।

লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।

দেখিতেছি আমি আজি

এই গিরিরাজি,

এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়

দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।

নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে

চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।

শুনিলাম, মানবের কত বাণী দলে দলে

অলক্ষিত পথে উড়ে চলে

অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।

কবির পরিণততর উপলব্ধি, কোথাও থামা যাবে না; দীর্ঘ পথ-পরিক্রমাকান্ত বিবর্তন-প্রবাহ, সমাজার, মনুষ্য-সভ্যতা যখনই স্থিত হতে চাইছে, তখনই তার 'আভ্যন্তরীণ এবং বিশ্বস্থ গতির আবেগ (বা প্রাণ-প্রেরণা) তাকে নূতনভাবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে,

'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।' -

বহির্জাগতিক গতির কেন্দ্রে এই যে আপাতত 'বেগের আবেগ' বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে আগেই বলেছি potential energy, তার আরও সুন্দর উদাহরণ ও ব্যাখ্যা রয়েছে ৬ সংখ্যক (ছবি) কবিতায়। এই কবিতায় কবি ব্যক্তি-মানুষের (কেবলমাত্র জৈব প্রাণী নয়) স্থির এই শক্তিকেন্দ্রটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। ব্যক্তির সকল প্রকার স্বতঃস্ফূর্ত (যান্ত্রিক নয়)জীবন-অভিব্যক্তি জীবন ক্রিয়া ও জীবন-উপলব্ধির কেন্দ্রে যে স্থির শক্তি বা vital force অবস্থিত থেকে তাকে সকল কিছুতে উদ্দীপ্ত করে তুলছে, সেটি তার প্রেরণা। প্রেমই প্রেরণা রূপে যখন জীবন-কেন্দ্রে অবস্থিত তখন ব্যক্তির কাছে জগৎ ও জীবন, এই জীবন কর্মে অংশগ্রহণ, এই জীবনের পথ-পরিক্রমা সব অপূর্ব সুন্দর হয়ে দেখা দেয় প্রেম-প্রেরণার উৎসটিকে 'তুমি' বলে ডাক দিয়ে কবির বক্তব্য

নয়নসম্মুখে তুমি নাই,

নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাই ।

আজি তাই।

শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।

আমার নিখিল

তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।

নাহি জানি, কেহ নাহি জানে,

তব সুর বাজে মোর গানে ;

কবির অন্তরে তুমি কবি,

নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।

বিশ্বের কেন্দ্রেও আছে ঈশ্বরের প্রেম। তাই বিশ্বাভিব্যক্তির আর-এক নাম ঈশ্বরের লীলা। এই কেন্দ্রীয় ঐশ্বরিক প্রেম-প্রেরণার ক্রিয়াতেই বিশ্ব বিচিত্র রূপের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে চলেছে। কবির নিজের জীবনও চলমান ও অর্থবহ হয়ে উঠেছে এই কেন্দ্রীয় প্রেমের স্থিতিশীল প্রত্যয়ে।ব্যক্তিসত্তা শুধু এক আয়সীমাবদ্ধ নয়, জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়েও তার মহা প্রয়াণ নবতর পরিণততর অভিব্যক্তির দিকে। এই চলমানতার, স্রোতপ্রবাহে কত, বাধা ; কত বিপত্তি, কত শৃঙ্খল এই গতিকে রুদ্ধ করতে চায়। কিন্তু; আপন। জীবন-আবেগে ব্যক্তিসত্তা তাকে অতিক্রম কোরে চোলে যায়। কঠিনতম প্রস্তর-প্রাচীরও তার গতির আঘাতে চূর্ণ হয়ে, ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে। জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্তার এই গতিময়তার পরিচয় রয়েছে ৭ সংখ্যক (শাজাহান) কবিতায়।

সবই গতিময়, সুও ব্যক্তিমন তার সকল প্রমের, সকল সৃষ্টির, সকল কৃতিত্বের, সকল অনুভূতি, সকল উপলব্ধি, সকল সাধনার এব মূল্য অঙ্কিত কোরে রাখতে চায় পৃথিবীর বুকে। মানুষের সারা জীবনের সকল সুগভীর সাধনা ও চরম , উপলবিও এই বিগতির প্রবাহে অস্থির ও অস্থায়ী হয়ে কোনো অদৃশ্য লোকে মিলিয়ে যাবে, মানে কাছে এ অসহনীয়। তাই মানুষের চরম প্রচেষ্টা, তার কৃতিত্ব ও অনুভূতি উপলব্ধিকে এমন কোনো ব মূল্যে অভিষিক্ত করা যায় কিনা,কালপ্রবাহ (Time) খাকে মূল্য দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, তার ত্বক পাও করে না। কিন্তু চরম আঘাতে মানুষ বোঝে যে তা হওয়ার নয়। .ও বাকসভা দুঃখ নেই। কারণ ব্যক্তিসত্তাও তো কোনো চিরশুন রূপকথা নয়। সেও সে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নব নব জীবনপথে পরিশ্রমশশীল।

সম্রাট শাজাহান মনে করেছিলেন, প্রিয়তমা সমাজের প্রতি তার অগভীর প্রেমানুভূতির স্মৃতিকে তিনি পৃথিবীর প্রাঙ্গণে চিরশুন কোরে রাখবেন তাজমহল নামক স্মৃতিস্তম্ভের মধ্য দিয়ে। তার সৃষ্ট তাজমহল-তিকে তিনি তার প্রেমের একটি প্ররিশ্রুত কাব্যিক রূপায়ণে পরিণত করতে চেয়েছিলেন, যার মধ্য দিয়ে অনন্ত কাল যা েরে মমতাজের প্রতি তাঁর অক্ষয় প্রেমের বাণী উচ্চারিত হবে--

‘ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।”

কিন্তু তাই কি সম্ভব? যে-মমতাজের স্মৃতি শক্ষা কোরে স্মৃতিস্তক্সের অশ্রুত প্রেমবাণী প্রচার, সেই মমতাজের কানে, আর সেই বাণী কোনদিন পেছাবে না, কারণ মমতাজ চোলে গিয়েছেন ; চলমান এই পৃথিবীর বিভিন্ন সময়ের মানুষ, যারা এই স্মৃতিস্তম্ভের মহিমাকে উপলব্ধি করবে, তারাও কেউ নিত্যঙ্গের পরিচয়বাহী হয়ে চিরকাল টিকে থাকবে না। এবং যে-শাজাহান এই স্মৃতিস্তম্ভের মধ্য দিয়ে তার প্রেমের অক্ষয় পরিচিতি চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিলেন, সেই শাজাহানও এই স্মৃতিস্তম্ভের আকর্ষণে পৃথ্বীতে জড় হয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকেননি। শাজাহানের প্রেম, তার প্রেমের স্মৃতি, তার প্রিয়তমা, তার বিপুল ঐশ্বর্য, কীর্তি ও খ্যাতি কিছুই তাকে চিরকালের মতো ধরে রাখতে পারেনি এবং ঐ সকল সামগ্রীও কিছু চিরন্তন নয়। নব নব জীবন-পরিক্রমার মধ্য দিয়ে কোন্ দুর্লক্ষ্য ভবিষ্যতের দিকে শাজাহান-সত্তার মহাপ্রয়াণ আমরা জানি না। হয়তো কিছুদিনের জন্য তার স্থাপিত স্মৃতিস্তম্ভ একটি প্রেমের আদর্শের মতো মমতাজ ও শাজাহানের কথা আমাদের মনে করাবে, কিন্তু নিরবধি কালের সীমাহীনতার তুলনায় তা নগণ্য। সর্বপ্রকার বাধা, বন্ধন ও বন্ধুর অক্রিমকারী ব্যক্তিসত্তার চিরচলমানতাম না এই কবিতায়

যত দূর চাই

নাই নাই সে পথিক নাই।

প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ

রুধিল না সমুদ্র পর্বত।

আজি তার রথ

চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে

নক্ষত্রের গানে

প্রভাতের সিংহদ্বারপানে।

ব্যক্তিসত্তার এই চলমানতার সুন্দর পরিচয় রয়েছে ৪৩ সংখ্যক (পথের প্রেম) কবিতায়ও। তৎসহ আরো একটি তাৎপর্য । শাজাহান কবিতায় শাজাহানের অনন্ত গতিপথে কোনো মমতাজই তাকে চিরকালের মতো বাঁধতে পারে না। সবকিছু ছাড়িয়ে শাজাহান সত্তার প্রয়াণ। আর এই কবিতায় ব্যক্তিসত্তা বার বার পথের বাকে বাকে ফেলে যায় তার গান, তার প্রেম। কিন্তু নতুন দিনে নতুন যে আসে। সে ঐ ফেলে-আসা গানের ও প্রেমের একই আন্তর-সত্তা। নব নব জীবনে ও জনমে আমরা যাকে পাই, তা একই প্রেয়সীর নব নব রূপান্তর। তাকে নিয়ে স্থায়ী ঘর বাঁধা যায় না, কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরে সেই এক প্রেয়সীসত্তাকেই ভালোবাসা

জোয়ার-ভাটার নিত্য চলাচলে

তার এই আনাগোনা।

আধেক হাসি আধেক চোখের জলে

মোদের চেনাশোনা।

তারে নিয়ে হল না ঘর-বাধা,

পথে পথেই নিত্য তারে সাধা,

এমনি করেই আসা-যাওয়ার ডোরে

প্রেমেরি জাল-বোনা। আগেই বলেছি, বলাকা কাব্যের গতিচেতনা প্রত্যক্ষতঃ সমকালীন রাষ্টীয় কার্য কায়ণের ফলশ্রুতি। এই কাব্যরচনার কিছু পূর্বে বিশ্বের রাজনীতিক পটভূমিকা কবিমনে যেনবতর পরিবর্তন-চেতনার প্রেরণা সঞ্চার করেছিলো, তার পরিচয় রয়েছে ৪ সংখ্যক (শষ) ৩৭ সংখ্যক (ঝড়ের খেয়া) এবং ৪৫ সংখ্যক (নববর্ষের আশীর্বাদ) কবিতায়। ইয়ুরোপের সর্বগ্রাসী সভ্যতার বীভৎস দংস্ট্রাবিস্তার এবং য়ুরোপেতর মহাদেশগুলিকে আত্মসাৎ করবার তার নির্লজ্জ প্রয়াস কবিকে তীব্র ভাবে আঘাত করেছিলো। কবি উপলব্ধি করেছিলেন, য়ুরোপপ্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্র নীতিক অবস্থা যদি স্থায়ী স্থিতাবস্থায় পরিণত হয় এবং সারা পৃথিবীতে য়ুরোপের অপশাসন ও

শোষণ যদি অব্যাহত থাকে, আর তার সঙ্গে বহুদিনাগত সামাজিক বিশ্বও তার সকল সংস্কার, সঙ্কীর্ণতা, জীর্ণতা ও কলুষতা নিয়ে যদি অপরিবর্তিত বয়ে চলতে থাকে (বিশেষ কোরে আমাদের দেশের মতো দেশে), তাহলে পৃথিবীর মানুষের পক্ষে বড় দিন। চঞ্চলা কবিতায় কবি উপলব্ধি করেছিলেন, গতিময়তাই বিশ্বকে আবর্জনামুক্ত রাখে। সুতরাং রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রেও কবি এমন গতিময়তার আকাঙ্ক্ষা করছিলেন, যা পুরাতন সংস্কারবদ্ধ অত্যাচারলাঞ্ছিত পৃথিবীকে সর্বপীড়ন মুক্ত আশাদীপ্ত নূতন উষার স্বর্ণদ্বারপ্রান্তে পেছিয়ে দেবে। ১৯১৪-র প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে দাড়িয়ে বিধাতার কাছে কবির জিজ্ঞাসা, যে-পরিবর্তন পৃথিবীর মানুষকে সকল অন্যায়-অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করবে, তাকে ঘোষণা করবে, অভ্যর্থনা করবে, বিধাতার যে শঙ্খনাদ, সেই শখ আজ ধরিত্রীর ধুলোয় পোড়ে লাঞ্ছিত কেন? একি সহ্য করা যায়?

' তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে,

কেমন করে সইব।

বাতাস আলো গেল মরে,

একি রে দুর্দৈব। (৪ সংখ্যক)।

ঐ একই কবিতাতে কবি বিধাতার কাছে নুতন শক্তি প্রার্থনা করেছেন। কবি বিধাতার কাছে সেই শক্তি চেয়েছেন, যা সমস্ত মানুষকে পৃথিবীর নব পরিবর্তন আনতে উদ্বোধিত করবে ; গতিহীন আরাম ও অলসতার জড়ত্ব থেকে মুক্ত কোরে নব নব আঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষকে নূতন আলোকিত পৃথিবীতে উত্তীর্ণ করিয়ে দেবে।

তোমার কাছে আরাম চেয়ে।

পেলেম শুধু লজ্জা।

এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে ।

পরাও রণসজ্জা।

ব্যাঘাত,আসুক নব নব,

আঘাত খেয়ে অটল রব,

বক্ষে আমার দুঃখে তব

বাজবে জয়ডঙ্ক।

রাস্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে এই বিবর্তন-চেতনা আরও তীব্রভাবে অভিব্যক্ত কবির ৩৭ সংখ্যক (ঝড়ের খেয়া) কবিতায়। যে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার আর শশাষণের রক্ততাণ্ডবের মধ্যে পৃথিবীর উন্মত্ত পদবিক্ষেপ, তা থেকে মুক্তি বিবর্তনের অতি , বীরপন্থায় সম্ভব নয় বোলে কবি উপলব্ধি করেছেন এবং এর দেখেছেন বিপ্লবের। যুদ্ধের বেশে এই বিপ্লব দেখা দিয়েছে। যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে (১৯১৪-র মহাযুদ্ধ) তাও সম্ভবত বিপ্লবের বাণী। শঙ্খ(৪ সংখ্যক) কবিতা প্রসঙ্গে কবি বলেছিলেন, এ-শঙ্খ বিধাতার আহ্বান শঙ্খ, এতেই যুদ্ধের নিমন্ত্রণ ঘোষণা করতে হয় অকল্যাণের সঙ্গে, পাপের সঙ্গে, অন্যায়ের সঙ্গে। সময় এলেই উদাসীন ভাবে শকে মাটিতে পড়ে থাকতে দিতে নেই। দুঃখস্বীকারের হুকুম বহন করতে হবে প্রচার করতে হবে। ‘ঝড়ের খেয়া’ কবিতায় সেই আহ্বান এসেছে। যুগ-বিধাতা কাণ্ডারী ডাক দিয়েছেন সেই যাত্রায় তার সঙ্গী হওয়ার জন্য। এই যুদ্ধ সেই বিপ্লবের বাণীবহ। যে-যুদ্ধ হয়ে গেল তা নূতন যুগে পৌছবার সিংহদ্বারাপ। এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে সার্বজাতিক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার হুকুম এসেছে। ‘ঝড়ের খেয়া’ কবিতায় যে নবযুগ-কাণ্ডারীর কল্পনা করেছেন কবি, তার এ ইঙ্গিত রয়েছে পাড়ি (৫ সংখ্যক) কবিতায় মত্ত সাগর পাড়ি দিল গহন রাজি কালে। ঐ যে আমার নেয়ে। ঝড় বয়েছে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে আসছে তরী বেয়ে। কালো রাতের কালী-ঢালা জয়ের বিষম বিষে / আকাশ, যেন মূছি পড়ে সাগর সাথে মিশে,/ উতল ঢেউয়ের দল খেপেছে, না পায় তারা দিশে,/ উধাও চলে ধেয়ে।/ করি বুঝতে পেরেছেন, আমাদের বহুদিনের অতি পুরাতন পাপের জগদ্দল পাথর থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করবার জন্য প্রয়োজন সর্বাণী ও সার্বজনীন বিপ্লবের। উদাসীন হয়ে দূরে থেকে কোনো লাভ নেই। তাই এই বিপ্লবের মৃত্যু-মহোৎসবে অকুতোভয় অংশ গ্রহণের জন্য কবি সমস্ত মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন-

- দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,

ওরে উদাসীন,

ওই ক্রন্দনের কলরোল,

লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।

বহ্নিবন্যা-তরঙ্গের বেগ,

বিষশ্বাস-ঝটিকার মেঘ,

ভূতল গগন

মূর্ছিত-বিহ্বল-করা মরলে মরণে আলিঙ্গন

ওরই মাঝে পথ চিরে চিরে

নূতন সমুদ্রতীরে।

তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি

ডাকিছে কাণ্ডারী

এসেছে আদেশ

বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,

পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা

আর চলিবে না। (ঝড়ের খেয়া)

পুরাতন পাপ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করবার জন্য কবি যে-বিপ্লবাত্মক যুদ্ধের স্বপ্ন দেখেছেন, তার সামনে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন ; অনেক অন্ধকারাবৃত রাত্রি, অনেক মেঘপুঞ্জিত ঝন্থা-উৎক্ষিপ্ত প্রান্তর ; অনেক ফেন-উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ-গর্জিত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে, অনেক সঙ্কোচ, বহু মৃত্যু, ধ্বংস এবং প্রিয়জনের বিচ্ছেদবেদনা অতিক্রম কোরে বিপ্লবোত্তর বা যুদ্ধোত্তর সার্থকতার স্বর্ণদ্বারপ্রান্তে পৌঁছনো যাবে। আরাম সুখ বিসর্জন দিয়ে নূতন জীবনপ্রান্তে পৌছনোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে তবেই জাতির জীবনে

সেই নূতন প্রভাতের সূচনা হবে। এই কবিতাতেই কবির পূর্বোক্ত অকারণ অবারণ গন্তব্যহীন নিরুদ্দেশ গতি সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছে। যে-গতি পরিণতিতে কোনো সার্থকতার প্রান্তস্পর্শী নয়, কোন পূর্ণতর তীর্থ-অভিযাত্রী নয়, সে গতি অর্থহীন। যে-বিপ্লব শুধু অসংখ্য মৃত্যু-পরিকীর্ণ, অথচ পরিণতিতে কোনো শ্রেয়, কল্যাণচিহ্নিত, মঙ্গলময় গন্তব্যের দিকে পদসঞ্চারী নয়, যা শুধু পরিবর্তনের একটি পর্যায় মাত্র, কোনো স্থিরপ্রত্যয়ের, ধ্রুব অস্তিত্বের স্বর্গলোক-উত্তীর্ণ নয়, সেই বিপ্লব, সেই মৃত্যু-লাইনা অর্থহীন অকারণ নির্বোধ উন্মত্ততা মাত্র । গন্তব্যহীন যে-গৃতিচেতনা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-দর্শনের মর্মমূলে, কবি শেষপর্যন্ত সেই অকারণ গতিতে আস্থাহীন। কবির বিপ্লবচেতনা কল্যাণময় পরিসমাপ্তিতে বিশ্বাসী। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বহু মৃত্যুর মুল্যে যেখানে আমরা পৌঁছতে চাই, ধ্রুব মঙ্গল এবং শাশ্বত কল্যাণ সেখানে আছে বলেই না আমরা চাই, তার জন্যেই না আমাদের প্রাণদান,-

তোর চেয়ে আমি সত্য এ-বিশ্বসে প্রাণ দিব,দেখ। .....

শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।

বিপ্লবের বা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা এই সত্যে পৌছুতে চাই। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চাই মৃত্যু-অতীত অমৃতের স্থির সার্থকতা। অন্ধকারের মধ্যে বসে আমাদের সকল তপস্যা দিবা-দীপ্ত অকম্পিত প্রত্যয়ের সার্থকতায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য। নচেৎ সব বিপ্লব ব্যর্থ, সব মৃত্যু অর্থহীন -

বীরের এ রক্তস্রোত, মার এ অশ্রুধারা

এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা।

স্বর্গ কি হবে না কেনা।

বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না

এত ঋণ?

রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন।

নিদারুণ দুঃখরাতে

মৃত্যুঘাতে

মানুষ চুর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা ।

তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?

সভ্যতা চায় নবনব রূপে ধৃত হয়ে সার্থক হয়ে উঠতে। যুদ্ধের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সভ্যতার নবরুপে বৃত-হওয়ার ভূমিকা রচিত হয়। মানুষ সহজে অতীতকে ত্যাগ করতে ও নূতনের ভূমিকা রচনা করতে পারে না। যুদ্ধই ক্ষয়িষ্ণু পুরাতন থেকে মুক্তি দেয়। তারই দ্যোতনা রূপ (১৬ সংখ্যক) কবিতায়। যুগান্তর এখনো-অলক্ষ্য কোনো নবরূপের মধ্যে, নূতন নির্মাণের মধ্যে সভ্যতাকে সার্থক কোরে তুলবে, তারি সম্ভাব্য যজ্ঞভূমি এখনো ভবিষ্যতের গর্ভে। তবুও বর্তমান যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র সমূহের প্রবল বিক্ষোরধ্বনিতে তারই আহ্বান-নাদ তার তরে কোথা রচে ঠাই

অরচিত দূর যজ্ঞভূমে।

কামানের ধূমে

কোন্ ভাবী জীবন সংগ্রাম

রণশৃঙ্গে আহ্বান করিছে তার নাম। (রূপ)

কিন্তু পাশ্চাত্য চেতনার মূলকথা, বিবর্তন যেমন তেমনি বিপ্লবও একটা স্থায়ী পদ্ধতি, eternal process, এবং কোথাও তার সমাপ্তি নির্দেশিত নয়। তাই বিপ্লবের স্থান যুদ্ধ নিতে পারে না। অতএব রবীন্দ্র-গতিচেতনার সঙ্গে তার পার্থক্য স্বতঃপ্রকাশ। পাশ্চাত্য দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক প্রভাব নয়, শেষ পর্যন্ত কবি যে উপনিষদের প্রত্যয়েই প্রতিষ্ঠিত, আলোচ্য ঝড়ের খেয়া কবিতাটি তারই পরিচায়ক।

কবির গতিচেতনার আরও পরিচয়, এই কাব্যগ্রন্থের মানবচেতনাশ্রিত কবিতাবলী (১৭, ২৮ এবং ২৯ সংখ্যক কবিত) এবং নবীনবরণের কবিতাবলীতে (১,২,৩,৩৭ ও সংখ্যক কবিতা)। মানুষকে কবির শ্রদ্ধা জানানোর অন্যতম কারণ মানুষ বির্বতনধারার

সাম্প্রতিকতম পরিণতি। আর নবীনকে কবি বরণ করেছেন, কারণ নবীনই পুরাতনের জীর্ণ ধমনীতে নূতন রক্ত সঞ্চারিত করতে পারে। সেই তত পরিবর্তনের অগ্রদূত। এমনই ভাবে সমস্ত কাব্যগ্রন্থখানি গতিচেতনার পরিচয় নিয়ে এসেছে।

২.৪ মানবচেতনা

মানব রবীন্দ্রনাথের জীবনচেতনা তিনটি কেন্দ্রীয় প্রত্যয়ের সমন্বয়ের ফল। এই ত্রয়ীপ্রত্যয় যথাক্রমে তার মানবপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রীতি ও ঈশ্বরপ্রীতি; কিংবা বলা যেতে পারে উক্ত তিনটি প্রতি একই কেন্দ্রীয় প্রত্যয়ের ত্রিধা অভিব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের প্রাথমিক শর্ত তার সুগভীর মানবপ্রেম। মানুষের প্রতি গভীর ভালাোবাসাই তাঁর কাব্যচেতনার প্রধান নিয়ামক। বাল্যথেকে বার্ধক্যপর্যন্ত কবির সকল সাহিত্যের অন্তরালস্থিত প্রেরণারূপে বিরাজিত থেকেছে তাঁর গভীর মানবিক ভালোবাসা। এই ভালোবাসা কোনো 'ইজম' বা তত্ত্ব বা অহং-পরিতৃপ্তি (ego satisfaction)-র উদাহরণরূপে তাঁর কবিমানসে প্রতিষ্ঠিত নয়; এ সহজাত, স্বতঃ উৎসারিত। আবেগ এবং যুক্তি, উভয় উৎস থেকেই এই ভালোবাসার প্রাণধারা আহরণ। এই মানবপ্রীতি তার জীবনের সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত কোরে যে কী গভীর প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত, শেষ জীবনে মৃত্যুর মুখখামুখি দাঁড়িয়ে কবির অকুণ্ঠ স্বীকৃতিতে তার পরিচয়,- "আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট •••

'আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে, এখানে সর্বদেশ সৰজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা,-তারি বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।' এবং শঙ্খঘন্টা বাজিয়ে যারা আমাকে উচ্চ মঞ্চে বসতে চান, তাদের আমি বলি,

আমি নিচেকার স্থান নিয়েই জন্মেছি; প্রবীণের প্রধানের স্থান থেকে খেলার ওস্তাদ আমাকে ছুটি দিয়েছেন। এই ধুলো মাটি ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম,

বনস্পতি ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতের মানুষ, যারা মাটিতে হাটতে আরম্ভ করে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু আমি কবি।

বিদায়ের কিছু আগে এই ধরণীর মানুষকে লক্ষ্য কোরে তার একান্ত কামনা,

সেতারেতে বাধিলাম তার,

গাহিলাম আরবার –

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,

আমি তোমাদেরি লোক

আর কিছু নয়,

এই হোক শেষ পরিচয়। (পরিচয়। সেঁজুতি)

কবির মানবপ্রেমের বিচিত্র বিকাশ আমরা দেখেছি তার সামগ্রিক সাহিত্যের মধ্যে। ছোটো গল্পসমূহে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে গভীরতম মানবিক সহানুভূতির অতি পুখানুপুঙ্খ পরিচয়-চিহ্নিত চিত্র রচিত হয়েছে। অবহেলিত অত্যাচারিত মানুষের প্রতিষ্ঠার সুগভীর ভালোবাসা এবং অত্যাচারীর প্রতি তীব্র ঘৃণার পরিচয় - তাঁর কাব্যের স্বল্পস্থান জুড়ে নেই। তার প্রায় সমস্ত কাব্যেই মানবপ্রেমের পরিচয়। তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য চিত্রা, চৈতালি, গীতাঞ্জলি, পলাতকা, পরিশেষ, শেষ সপ্তক, পত্রপুট, সেঁজুতি, জন্মদিনে। মানুষের অত্যাচারীর প্রতি তীব্রতম ধিক্কার ব্যক্ত হয়েছে আঁর পত্রপুট কাব্যে। রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে অত্যাচারীর স্বরূপ উদঘাটন কালান্তর প্রবন্ধ সংগ্রহে। 'সভ্যতার সংকট' নামক প্রবন্ধে মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে মানুষের প্রতি কী গভীর ভালোবাসারই না পরিচয়। মৃত্যুর প্রায় বছর তিনেক আগে লেখা জন্মদিন (সেঁজুতির অন্তর্ভুক্ত) কবিতায় কী অকুণ্ঠ দৃঢ়তায়-না সভ্যতার অপহকারী অত্যাচারীর পরিচয় উদঘাটন, আবার তারই সঙ্গে অত্যাচারীর কলঙ্কমুক্ত নিষ্কলুষ ভবিষ্যতের প্রতি গভীর আস্থা জ্ঞাপন,

শুনি তাই আজি

মানুষ-জন্তুর হহংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।

মানুষের দেবতার

ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে

তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব, এ প্রহসনের

মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের;

নাট্যের কবরূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি

দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।

বলে যাব, দূতচ্ছলে মানবের মূঢ় অপব্যয়

গ্রন্থিতে পারে না কছু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।'

বলাকা কাব্যের মধ্যেও কবির মানবিক চেতনা অকুণ্ঠ প্রত্যয়ে উদ্ভাসিত। মানবিক চেতনার প্রকাশ এই কাব্যে তিন ভাবে ঘটেছে। একদিকে যুগ-যুগান্তর ধরে লাঞ্ছিত মানবাত্মার মুক্তির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে বিশ্ব-বিবর্তনের আধুনিকতম (latest) পরিণতিকাপে মানুষকে স্বীকৃতি দান, এবং তৃতীয়ত, সখি আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যে মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিপ-রূপে উপকি। অত্যাচারীর এত ধিক্কার নয়, আত্মশক্তির জাগরণের পর অত্যাচারিতকে প্রেরণা দান,-এই কাব্যের মানবিক চেতনার বৈশিষ্ট্য। একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, প্রাকৃ-বলাকা রবীন্দ্রকাব্যের মানবিক সহানুভূতি তথা মানবপ্রেম কবির অনুভূতি-নির্ভর এবং আবেগের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত। কিন্তু বলাকা ও বলাকা-উত্তর রবীন্দ্রকাব্যের মানব-চেতনা মুখ্যতঃ বুদ্ধিদীপ্ত, যদিও আবেগ-বিবজিত নয়। তার মতো সন্তানকে শুধু ভালোবাসা নয়, মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে কবি এই কাব্যে যুক্তি পথে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাকেই প্রকাশ করেছেন অকম্পিত লেখনীতে। কবির প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে মানবিক চেতনা যেমনভাবে ধরা পড়েছে, এই কাব্যের মানব-চেতনার সহধর্মী।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত কবি তাকে কাব্যসৌন্দর্যে মণ্ডিত করে প্রকাশ করেছেন। কবির মানব-চেতনা এই কাব্যে তিনভাবে প্রকাশিত। প্রথমত, দীর্ঘদিন ধরে শক্তিমানের দ্বারা এবং বহুযুগাগত সংস্কারের দ্বারা যে-মানুষ লাঞ্ছিত হয়েছে, তার মুক্তি কামনা অতি তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে এই কাব্যের কয়েকটি কবিতায়। এই চেতনা আরও বিশিষ্টতা লাভ করেছে সমকালীন রাষ্ট্রনীতিক পটভূমিতে। একদিকে বহু যুগাগত সংস্কার মানুষের সুস্থ মানসবিকাশকে স্তব্ধ করে দিয়েছে, অপরদিকে পৃথিবীর শক্তিমান আতিসমূহ দুর্বল জাতির উপর নিপীড়নের চক্র পরিচালিত করেছে। একদিকে প্রবলের উদ্ধত অন্যায় ও লোভীর বীভৎস লোভ এবং অপরদিকে ভীরুর ভীরুতা ও বঞ্চিতের ক্ষোভ-এই। দুইয়ের সংঘর্ষে পৃথিবীর মানব-সভ্যত। মৃত্যুপথযাত্রী হয়েছে। এই নাগপাশ-থেকে মানবমুক্তির ও বিপ্লবের বাণী তীব্র উদ্দীপনায় প্রকাশিত ৪, ৩৭ ও ৪৫ সংখ্যক (শঙ্খ, ঝড়ের খেয়াও নববর্ষের আশীর্বাদ) কবিতায়। ঝড়ের খেয়ায় কবির অনুভব

ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,

লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,

বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,

জাতি-অভিমান,

মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান

বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া

ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।

(৩৭ সংখ্যক/ ঝড়ের খেয়া)

কবির মানবিকতার মূল ভিত্তি অত্যাচার-লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি গভীর আন্তর সহানুভূতিতে এবং অত্যাচারীর প্রতি তীব্র ধিক্কারে। অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য কবির ডাক ৩৭ সংখ্যক কবিতার প্রথম দুই স্তবকে। অপরদিকে আলোচ্য কবিতায় প্রথম মহাযুদ্ধের যে বিধ্বংসী চিত্র ব্যক্ত সেই যুদ্ধের মধ্যেই হয়তো আভাসিত হচ্ছে।

মানবজাতির নব জীবনাগমনের সম্ভাবনা, এমন ভাবনাও কবির মনে জেগেছে। পূর্বোক্ত কবিতার এবং রূপকবিতার শেষ স্তবক কবির সেই ভাবনাকেই ধারণ কোরে আছে।

দ্বিতীয়তঃ, কবি মানুষকে তার শ্রদ্ধা জানিয়েছে, কারণ মানুষ বিবর্তন ধারার সাম্প্রতিকতম (latest) পরিণতি। বলাকা গতিবাদের কাব্য। এই কাব্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-বিবর্তন, জৈব-বিবর্তন, এবং সমাজ-বিবর্তনের এক প্রগাঢ় ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিবর্তনের পথে জড়বিশ্ব ক্রম-অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে প্রাণে' এসে পেছিয়েছে এবং প্রাণ দীর্ঘ বিবর্তন পথে ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়ার মধ্য দিয়ে এককোষী আদ্যপ্রাণী (Protozoa), তার থেকে বহুকোষী প্রাণী এবং তারপর মেরুদণ্ডী প্রাণীতে এসে পৌঁছিয়েছে। মেরুদণ্ডী প্রাণীরও বিবর্তন চলেছে যথাক্রমে মৎস্য, উভচর, সরীসৃপের মধ্য দিয়ে,-এবং এসে পৌছিয়েছে শুন্যপায়ী ও পাখিতে। স্তন্যপায়ীর চরমতম পরিণতি বুদ্ধিশীল মানুষ (Homo sapiens Sapiens)। পাশ্চাত্য দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকের মতো রবীন্দ্রনাথের শেষ বিশ্বাস এই নয় যে, বিশ্ববিবর্তন অকারণ এবং অবারণ। তার মতে, বিবর্তনের কেন্দ্রীয় শক্তি একটি চরম অভিব্যক্তির দিকে বিশ্বকে পরিচালিত করছে। সেই অভিব্যক্তিরই আধুনিকতম সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন কোরে দেখা দিয়েছে মানুষ। উপনিষদের কবির মতো রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন, মানুষের অভিব্যক্তি হলো বলেই, বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরের একাকীত্ব থেকে মুক্তি ঘটলো। এক আমি বহু হব-বিরাট আমি বিচিত্র হব,'—বিশ্বের কেন্দ্রীয় শক্তির এই যে অন্তর্লীন আকৃতি, তা সার্থকতায় বিধৃত হলো মানুষের উদ্ভবে, কারণ বিপুল বিশাল প্রাণহীন জড়পিণ্ডসমূহ বা অনুভূতি-উপলব্ধিহীন মনুষ্যেতর জৈব-জগৎ, কিছুই ঈশ্বরের একাকীত্ব দূর করতে পারে না। কারণ একাকীত্ব দুরের জন্য দরকার সহমর্মিতা; অনুভূতিহীনের কাছে তা প্রাপ্তব্য নয়। মানুষ অনুভূতিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান, তাই তার কাছে ঈশ্বরের মহর ধরা পড়ে। এই বিপুল সৃষ্টির সৌন্দর্য সার্থকতা অপূর্বতা রহস্যময়তা একমাত্র মানুষের কাছেই উপলব্ধীকৃত হয়। পাঠক ছাড়া যেমন কাব্য অর্থহীন, এই বিশ্ব কাব্যের পাঠক মানুষ ছাড়াও তেমনি এই বিশ্ব অর্থহীন। এর বিপুলায়তন কিন্তু জড় নীহারিকা, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, পাহাড়-পর্বত, কান্তার-বনানী, সমুদ্র-প্রান্তর কিছুরই কোন মূল্য নেই, যতক্ষণ-না তারা

মনুষ্যচেতনা দ্বারা অভিসিঞ্চিত। তাই তো মানুষের সার্থকতা, তার মূল্য। কবির কল্পনা,শুধু আমাদের এই পরিচিত পৃথিবীতেই নয়, মানুষের আগমন সম্ভাবিত করবার জন্য বিবর্তন চলেছিল গ্রহে গ্রহে, জাতে-জগতে। এই মানুষের আগমন সম্ভব করবার জন্যই বিশ্বের বিপুল পরীক্ষাশালায় (laboratory-তে) পরীক্ষা চলছিল। জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে, বিচিত্র রূপের মধ্য দিয়ে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে, পুল-পত্র ও প্রাণীজগতের বিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে সব পথ এই দিকেই চলেছিল। সেই পথের সার্থক তীর্থ মানুষ, বিশ্বের অভিব্যক্তির আধুনিকতম অ-পূর্ব-পরিণাম। তাই কবি মানুষকে শুক্কা আনান। কবির মানব-চেতনার দ্বিতীয় কারণ এইটি। মানুষেরও সার্থকতা এই বিশ্ব তথা বিশ্বস্রষ্টাকে উপলব্ধিতে। আপন জীবনযাত্রায় প্রাচীরবদ্ধ মানুষ সব সময় বিশ্বস্রষ্টার এই মহত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না। তার জন্যই তাকে বরণ করতে হয় সাধনার অপরিসীম কষ্ট। সরাতে হয় অনেক সংস্কারের অবগুণ্ঠন। সেই সাধনার সিদ্ধিতেই মানুষের সার্থকত। এবং সেই পরিচয় মানুষের প্রতিই কবির শ্রদ্ধা নিবেদন। বিশ্বস্রষ্টাকে লক্ষ্য কোরে তাই মানুষের প্রতিনিধিরূপে কবির উক্তি

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা

আপনাকে তো হয় নি তোমার দেখা।

সেদিন কোথাও কারও লাগি ছিল না পথ-চাওয়া;

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম, ।

শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ কুসুম।

আমায় তুমি ফুলে ফুলে।

ফুটিয়ে তুলে

দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।

আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে।

আমায় তুমি মরণ-মাঝে লুকিয়ে ফেলে ।

ফিরে ফিরে নূতন করে পেলে।

এবং,

আমার চোখে লজ্জা আছে, আমার বুকে ভয়,

আমার মুখে ঘোমটা পড়ে রয়;

দেখতে তোমায় বাধে ব'লে পড়ে চোখের জল।

ওগো আমার প্রভু,

জানি আমি, তবু –

আমায় দেখবে বলে তোমার অসীম কৌতুহল,

নইলে তো এই সূর্যতারা সকলই নিস্ফল। (২৯/ তুমি আমি)

এই কাব্যের মানবিক চেতনার তৃতীয় কারণ,-কবির কাছে মানুষই একমাত্র ঈশ্বরের সমবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। বিবর্তনের ফলে মানুষ, এমন এক স্থানে এসে, পৌছিয়েছে, প্রকৃতি জগৎ এবং মনুষ্যেতর জৈবজগৎ যার কোনো নাগালই পায় না। ক্রম-অভিব্যক্তিত্ব মধ্য দিয়ে মানুষ এমন সব গুণের অধিকারী হয়েছে, যা একমাত্র বিধাতাতেই সম্ভব। ১৭ সংখ্যক (প্রেমের পরশ) এবং ২৮ সংখ্যক (দেনা-পাওনা) কবিতার মধ্যে কবির আলোচ্য চেতনার প্রকাশ। কবির উপলব্ধি-প্রাণী জগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অপূর্ববনির্মাণক্ষম-প্রজ্ঞায়' (creative wisdom of genius-এ); এবং অনুভূতি শক্তি তথা তার সর্বোত্তম বিকাশ প্রেমানুভূতিতে। এই বিশে মনুষ্যেতর আর কোথাও (একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া) এই ক্ষমতা নেই। এই জগতে জড় বস্তুসমূহ যেসকল বৈশিষ্ট্যের (properties) অধিকারী এবং মনুষ্যেতর জীবজগৎ প্রকৃতির

কাব্য কাছ থেকে সহজাত বৃত্তি (instincts)-রূপে যে-শুণাবলীর অধিকারী, ততটুকুই মাত্র সে প্রকাশ করতে পারে। তার বেশি পারে না। কিন্তু মানুষ পারে। প্রকৃতিদত্ত বা

বিধাতাদত্ত উপকরণের সাহায্যে সে সম্পূর্ণ অভূতপূর্ববস্তু সৃষ্টি করবার প্রতিভার অধিকারী, এবং তার ফলে সৃষ্টিকর্তার সমান ক্ষমতাসম্পন্ন। এই বিশ্বকে সৃষ্টি করে ছিলেন বিধাতা; এর কোনো অনুরূপ ছিল না। এ অপূর্ব। তিনি তাই স্রষ্টা। মানুষ অবশ্য উপকরণগুলি ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছে বটে, কিন্তু তারই সাহায্যে সেও যা রচনা করে তা নব সৃষ্টি হয়ে ওঠে। তারও কোনো তুলনা মেলে না। তাই মানুষ বিধাতা-তুল্য, সেও স্রষ্টার আসনের অধিকারী। মানুষের প্রতিনিধিরূপে

'দেনা-পাওনা' কবিতায় বিধিতার কাছে কবির নিবেদন,

পাখিরে দিয়েছ গান, গায়, সেই গান,

তার বেশি করে না সে দান।

আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান,

আমি গাই গান।

বাতাসেরে করেছ স্বাধীন,

সহজে সে ভৃত্য তব বন্ধনবিহীন।

আমারে দিয়েছ যত বোঝা,

তাই নিয়ে চলি পথে, কভু বাকা, কভু সোজা।

একে একে ফেলে তাঁর মরণে মরণে

নিয়ে যাই তোমার চরণে ...

নিয়ে যাই তোমার চরণে ...

একদিন রিক্ত হস্ত সেবায় স্বাধীন ;

বন্ধন যা দিলে মোরে করি তারে মুক্তিতে বিলীন।

পূর্ণিমারে দিলে হাসি ;

সুখস্বপ্ন- রসরাশি

ঢালে তাই, ধরণীর করপুট সুধায় উচ্ছ্বসি।

দুঃখখানি দিলে মোর তপ্ত ভালে থুয়ে,

অশ্রুজলে তারে ধুয়ে ধুয়ে :

আনন্দ করিয়া তারে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে

দিনশেষে মিলনের রাতে। (২৮/দেনা-পাওনা)

মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন এবং হৃদয়প্রধান জীব। এবং এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই প্রাকৃতিক স্বতঃ-বিবর্তন ছাড়াও মনুষ্যসাজ আপন প্রচেষ্টায় নব নব অভিব্যক্তির মধ্যে সার্থকতার পথ অনুসন্ধান করছে। প্রাণীজগতে বেঁচে থাকবার জন্য যে জীবন সংগ্রাম, মানুষের জগতেও তা কিছু কম নয়। কিন্তু জীবন সংগ্রামের এই পরিশ্রম যন্ত্রণাকে অতিক্রম কোরে দীর্ঘ বেদনা ও সাধনার মধ্য দিয়ে মনুষ্য-সভ্যতা নূতন সার্থকতার পথ অনুসন্ধান কোরে চলেছে। মানুষ সকল বেদনাকে সাধনার মধ্য দিয়ে এক অপূর্ব আনন্দে পর্যবসিত করতে পেরেছে। সহজাত বৃত্তিতে পশুপক্ষী যেখানে স্বভাবতই সীমাবদ্ধ, মানুষ সেখানে নিজের নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার দ্বারা সম্পূর্ণ নুতন জিনিস সৃষ্টি করেছে। স্বরকে সে পরিণত করেছে সঙ্গীতে, শব্দকে পরিণত করেছে সাহিত্যে, রেখাকে পরিণত করেছে চিত্রে, বেদনাকে পরিণত করেছে আনন্দে, শূন্যকে পৌছিয়ে দিয়েছে পুর্ণের চরপ্রান্তে। জন্মমুহূর্তে প্রকৃতির পরাধীনতম এবং সর্বাপেক্ষা অসহায় ও দুর্বল জীব মানুষ পরিণতিতে সর্বাপেক্ষা শক্তি ধর ও স্বাধীন। জাগতিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক, বিবর্তন পথের সর্বপ্রকার বাধাকে সরিয়ে দিয়ে মনুষসভ্যতাকে বিপুল সার্থকতার প্রান্তে পৌছিয়ে দিয়েছে মানুষ, তার শত-সহস্র বৎসরের সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সামাজিক সাধনার বারা। মনুষউদ্ভবের প্রথম যুগের সেই ভয়ঙ্কর, প্রচণ্ড, রুদ্র ধরিত্রী মানুষের সচেতন প্রচেষ্টায় আজ মানুষের আনন্দময় স্বর্গলোকে পরিণত। মানুষের এই সৃষ্টি প্রতিভার আরো পরিচয় রয়েছে এই কাব্যের ‘তাজমহল’ ও ‘রূপ’ কবিতায়। মানুষ স্রষ্টা তাই কবির কাছে মানুষ প্রণম্য।

অনুভূতিশক্তি (feeling) এবং উপলব্ধি-ক্ষমতা (cognition)-তেও মানুষ ঈশ্বরের সমান। আবার অনুভূতিশক্তির সার্থকতম বিকাশ প্রেমানুভূতিতে। মানুষ। ছাড়া আর কোনো কিছুরই এই শক্তি নেই। তাই মানুষ যদি সৃষ্ট না-হতো, তা হলে ঈশ্বর-সৃষ্ট এই বিপুল বিশ্বের ধারণাতীত বৈচিত্র্য কোথাও কোনো সার্থক মূল্যে স্বীকৃত হতো না। মানুষ নিজের অনুভূতি ক্ষমতার দ্বারা এই বিশ্বের সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছে, অনুভব করেছে এর অপূর্ব বৈচিত্র্য, এবং প্রেমানুভূতিতে এর সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেছে, একে ভালোবেসেছে। বিশ্বের প্রতি এই ভালোবাসা বিশ্বস্রষ্টার প্রতি ভালোবাসায় পরিণত হয়েছে। তাই এই বিষে মানুষের আবির্ভাব যদি না হতো তাহলে বিপুল বিশাল প্রজ্বলন্ত ও নির্বাপিত বস্তুপিণ্ডসমূহসহ চেতনাহীন, অনুভূতিহীন ও উপলব্ধিহীন জৈবজগৎ নিয়ে সেটি একটি অর্থহীন, মূল্যহীন অপচয়ের পরিচায়ক হয়ে থাকতো। স্রষ্টা ও সৃষ্টির সার্থকতা অনুপলব্ধ থেকে যেত। ঈশ্বর নিজের সৃষ্টির মূল্য ও সার্থকতার আনন্দ উপভোগ করতে পারতেন না। মানুষের আবির্ভাবেই এবং ঈশ্বরের প্রতি মানুষের প্রেম নিবেদনেই ঈশ্বর এই আনন্দ উপভোগ করতে পারছেন। তাই সকল মানুষের হয়ে কবির বক্তব্য,

হে ভুবন

আমি যতক্ষণ

তোমারে না বেসেছি ভালো

ততক্ষণ তব আলো

খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন।

ততক্ষণ

নিখিল গগন

হাতে নিয়ে দীপ তার শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে।

মোর প্রেম এল গান গেয়ে ;

কী যে হল কানাকানি,

দিল সে তোমার গলে আপন গলার মালাখানি।

মুগ্ধচক্ষে হেসে

তোমারে সে

গোপনে দিয়েছে কিছু, যা তোমার গোপন হৃদয়ে

তারার মালার মাঝে চিরদিন রবে গাঁথা হয়ে।

কালাতীত অনান্যস্ত দিকশূন্য ও দিবস-নিশাবিহীন মানুষের কল্পনারাজ্য, শূন্যতায় ব্যাপ্ত এক অর্থহীনতা মাত্র। মানুষের অনুভবে ও অভিব্যক্তিতেই স্বর্গের প্রকাশ। স্বর্গ ও স্বর্গস্থ ঈশ্বরের সার্থকতা মানুষের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে রূপপরিগ্রহ করায় -

স্বর্গ আজি কৃতার্থ তাই আমার দেহে,

আমার প্রেমে, আমার স্নেহে,

আমার ব্যাকুল বুকে,

আমার লজ্জা, আমার লজ্জা, আমার দুঃখে সুখে।

আমার জন্ম-মৃত্যুরই তরঙ্গে

নিত্যনবীন রঙের ছটায় খেলায় সে-যে রঙ্গে।

আমার গানে স্বর্গ আজি

ওঠে বাজি,

আমার প্রাণে ঠিকানা তার পায়,

আকাশভরা আনন্দে সে আমারে তাই চায়। (২৪ সংখ্যক/ স্বর্গ)

পূর্ণের অভাব ও প্রেমের বিকাশ কবিতায় সমধর্মী বক্তব্য, অবশ্য একটু পার্থক্যও আছে। পূর্বোক্ত ১৭ সংখ্যক কবিতায় আমরা দেখেছি, মানুষ বিবর্তন ধারাপথে যখন আবির্ভূত হয়েছে, ঈশ্বরকে অনুভব করেছে, ভালোবেসেছে, তখনই ঈশ্বরের সার্থকতা এবং তার আনন্দানুভব। ৩১ সংখ্যক-এও কবির বক্তব্য ঈশ্বর পূর্ণ, অভাবহীন, কিন্তু অপরিতৃপ্ত। মানুষের অনুভূতিতে যখন ঈশ্বরের মহিমা ধরা পড়ে, তখন ঈশ্বর নিজের সার্থকতা ও আনন্দ অনুভব করেন, তখনই তিনি তৃপ্ত হন। তাই মানুষকে তিনি তাঁর সব ঐশ্বর্য, ঐশ্বরিক অনুভব-ক্ষমতা, ঐশ্বরিক ভালাোবাসা দান করেন, মাধুর্যের কাছ থেকে ঐসব ফিরে পেয়ে পরিপূর্ণরূপে তৃপ্ত হবেন বাোলে। তাই মানুষের যত বিশিষ্ট, তার প্রতিভা, প্রজ্ঞা, অনুভূতি, প্রেম,-তা মানুষকে ঈশ্বরেরই দেওয়া ঈশ্বরের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। মানুষের কাছ থেকে ঈশ্বর যে-প্রেম পান, তা আসলে ঈশ্বরেরই প্রেম, যা তিনি মানুষকে দিয়েছেন, তা আবার ফিরে পাওয়ার জন্য, 'ফিরে পেয়ে আনন্দিত হওয়ার জন্য, এবং মানুষকেও সার্থকতম সদর্থকতায় উন্নীত করার জন্য।

নিত্য তোমার পায়ের কাছে
তোমার বিশ্ব তোমার আছে
কোনোখানে অভাব কিছু নাই।
পূর্ণ তুমি, তাই
তোমার ধনে মানে তোমার আনন্দ না ঠেকে।
তাই তো একে একে
যা-কিছু ধন তোমার আছে আমার করে লবে।
এমনি করেই দিনে দিনে
আমার চোখে লও যে কিনে
তোমার সূর্যোদয়।
আপন প্রেমের পরশমণি, আপনি যে লও চিনে
আমার পরান করি হিরন্ময়।

(৩১ সংখ্যক । পূর্ণের অভাব)

ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া ঈশ্বরের প্রেম মানুষ ক্রমশঃ আত্তীকৃত কোরে নিজের প্রেমে পরিণত করে। মানুষের মধ্যে এই প্রেমের বিকাশ ও পরিণতি যেমন এক দিকে ঈশ্বরকে গভীরভাবে আত্মস্থ করতে মানুষকে সহায়তা করে, অপরদিকে মানুষের এই প্রেম ঈশ্বরকে গভীর আনন্দে পূর্ণ করে। এবং তার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সেই আনন্দ ব্যক্ত হতে থাকে

জানি আমার পায়ের শব্দরাত্রে দিনে শুনতে তুমি পাও,

খুশি হয়ে পথের পানে চাও।

খুশি তোমার ফুটে ওঠে শরৎ-আকাশে -

অরুণ-আভাসে।

আমি যতই চলি তোমার কাছে।

পথটি চিনে চিনে,

তোমার সাগর অধিক করে নাচে

দিনের পরে দিনে।

জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে

ফোটে তোমার মানসসরোবরে -

সূর্যতারা ভিড় করে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কূলে কূলে

কৌতূহলের ভরে।

তোমার জগৎ আলোর মঞ্জরী

পূর্ণ করে তোমার অঞ্জলি।

তোমার লাজুক স্বর্গ আমার গোপন আকাশে

একটি করে পাপড়ি দোলে প্রেমের বিকাশে।

(৩৩ সংখ্যক / প্রেমের বিকাশ)

খোলা জানালা (৩৪ সংখ্যক) কবিতাটি এই সমধর্মী।

মানুষের প্রতিনিধিরুপে কবি অনুভব করেন, মানুষ যখন ঈশ্বরকে ভালোবাসতে গিয়ে তার সৃষ্টিকে গভীর ভাবে ভালোবাসে, যেসৃষ্টি ঈশ্বরেরই প্রকাশ-রূপ, তখন সে ঈশ্বরের সেই সৃষ্টির সঙ্গে, তার বিভিন্ন বোধের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। তখন কবির সুগভীর অনুভব

আমি বাণীর সাথে বাণী,

আমি গানের সাথে গান,

আমি প্রাণের সাথে প্রাণ, (৩৫ সংখ্যক মানসী)

মানুষ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ পর্যন্ত সৃষ্টির সার্থকতম পরিণতি-অনুভূতি শক্তিতে, অপূর্বনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞায়, সৌন্দর্যনুভবে, প্রেমচেতনায়, এবং শেষ পর্যন্ত এই সকলের সামগ্রিক পরিণাম রূপে শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টিতে। শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়ে সে এই মরণশীল এবং মৃত্যুআকীর্ণ জগতে চিরন্তনতার রাখতে চেয়েছে। এ যেন অবশ্যম্ভাবী হত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে সত্যুকে মানুষের প্রতিস্পর্ধা (challenge)।

তবুও, মানুষ ভাবে, একমাত্র শিল্প, সুন্দর সৃষ্টিই চিরন্তন আনন্দ-বাহী হয়ে থাকে। A thing of beauty is a joy for ever। এই জগতে সবই নশ্বর, অন্তহীন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধ্বংসই তার একমাত্র গতি। এর মধ্যে একমাত্র শিল্পই চিরন্তন। শিল্প-সৃষ্টিতেই মানুষের চরমতম সার্থকতা। একমাত্র সৌন্দর্যময় শিল্পই পৌছিয়ে দিতে পারে মানুষের প্রেমানুভব সৌন্দর্যানুভব ও মৌল সৃষ্টিদক্ষতার পরিচয়কে মানবসাধারণের কাছে। (অবশ্য, বস্তুতঃ শিল্পের সে-ক্ষমতা আছে কি-না তা সংশয়ের। এর কারণ শিল্পের প্রকাশগত সীমাবদ্ধতা নয়, এর কারণ শিল্পবস্তুর ক্ষয়শীলতা। শিল্পসামগ্রীও অন্য যে-কোনো সামগ্রীর মতো ধ্বংস-পরিণামী। শিল্পী, শিল্প-উপভোক্তা,

সমগ্র মানবজাতি কেউই ধ্বংস এড়াতে পারে না। অতএব a thing of beauty is a joy for ever এ-কথা অযথার্থ ।) তবুও মানুষ মনে করে শিল্প সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সে তার ভালোবাসাকে, তার সৌন্দর্যমুভবকে, তার ঈশ্বরানুভবকে চিরস্থায়ীরূপে পৌছিয়ে দেবে বিশ্বের সহৃদয় রসিকদের কাছে চির কালের অঙ্গ। এই বক্তব্য বিশেষ ভাবে ব্যক্ত ৭ সংখ্যক (শাজাহান) ও ১ সংখ্যক (তাজমহল) কবিতায়।

সবই নশ্বর, অচিরস্থায়ী। জীবন-যৌবন-ধন-মান কালস্রোতে সর্বদা ভাসমান। সম্রাট শাজাহানের বজ্রকঠিন রাজশক্তি সন্ধারক্তরাগসম মিলিয়ে যায় কালের দিগন্তসীমায়, সম্রাটের অপরিমেয় ঐশ্বর্য হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটার মতো দ্রুত শূন্যতায় বিলীয়মান। তবুও শাজাহানের কবিসত্তা চায় মমতাজের প্রতি তার প্রেমকে চিরস্থায়ী কোরে রাখতে ও অনাগত সকল মানুষের কাছে পৌছিয়ে দিতে তার প্রেম-অভিব্যক্তিকে। সম্রাট রচনা করতে চান সৌন্দর্য ময় একটি অপরূপ শিল্পসামগ্রী, চির অম্লান স্থাপত্য ‘তাজমহল’, যা চিরন্তন বেদনা বিধৃত একটি দীর্ঘশ্বাসের-মত-অনুভবকে বর্তমান ও অনাগত কাল ধোরে সকল রসিকের চিত্তে সঞ্চারিত কোরে দেবে। তা যেন হবে মহাকালের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর শুভ্র কপোলতলে টলটল করতে-থাকা এক বিন্দু অশ্রুর একটি নিটোল মুক্তো

রাজশক্তি বজ্র সুকঠিন,

সন্ধারক্তরাগসম শ্রাতলে হয় হোক লীন,

কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস

নিত্য-উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ,

এই তব মনে ছিল আশ ।

হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা

যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা

যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,

শুধু থাক্

একবিন্দু নয়নের জল

কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জল

এ তাজমহল। (৭ সংখ্যক / শাজাহান)

ধ্বংস-পরিণামী জগৎ-প্রেক্ষাপটে শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানব-শ্রেষ্ঠত্বের যে-পরিচয় ব্যক্ত, তা হল, ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতে মানুষই একমাত্র অনুভব করে, অনুভবের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ভালোবাসা একমাত্র তারই মধ্যে, এবং ভালোবাসাকে চিরন্তন কোরে রাখবার জন্য শিল্পসৃষ্টির আকৃতি, এবং এই আকৃতিকে সার্থক কোরে তুলবার জন্য যে শিল্পপ্রতিভা তা একমাত্র তারই মধ্যে। আর এই বিশিষ্টতাগুলির মিলনে সে রচনা: করে অপরূপ শিল্প। শাজাহানের মধ্য দিয়ে মানব শ্রেষ্ঠত্বের এই বাণীই ব্যক্ত।

শিল্প সৃষ্টি করে যে-ব্যক্তিত্ব, শাজাহান কবিতায় মুখ্যত তারই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে, আর তাজমহল (১ সংখ্যক) কবিতায় প্রধানত প্রকাশিত শিল্পবস্তুর মহিমা। শিল্পের প্রাণ প্রেম ও সৌন্দর্য। এই প্রেম ও সৌন্দর্যই শিল্পকে অমৃতরস জোগায়, মানুষের আকৃতি শিল্পের মধ্য দিয়েই স্বর্গলোকের দিকে ধরণীর আনন্দমঞ্জরী তুলে ধরে, একজনের প্রেম, বেদনা যখন শিল্পের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়, তখন তার মধ্য দিয়ে সর্বমানবের বেদনা রূপ লাভ করে। কারো ফেলে-আসা, জীবন, কারো ভুলে যাওয়া গান, কারো ম্লান হয়ে যাওয়াতি , কারো আসন্নবসন্তের বিষয় নিশাস সব কিছুকে সমন্বিত কোরে ধরে রাখে শিল্প যেমন কোরে ধরে রেখেছে তাজমহল

কে তোমারে দিল, প্রাণ।

রে পাষাণ?

কে তোমারে জোগাইছে এ অমৃতরস

বরষ বরষ ?

তাই দেবলোক-পানে নিত্য তুমি রাখিয়াছ ধরি

ধরণীর আনন্দমঞ্জরী;

তাই তো তোমারে ঘিরি বহে বারোমাস

অবসন্ন বসন্তের বিদায়ের বিষয় নিশ্বাস ;

মিলনরজনীপ্রান্তে ক্লান্ত চোখে

ম্লান দীপালোকে।

ফুরায়ে গিয়েছে যত অশ্রু-গলা গান

তোমার অন্তরে তারা আজিও জাগিছে অফুরান,

হে পাষাণ, অমর পাষাণ।

আজ সর্বমানবের অনন্ত বেদনা।

এ পাষাণসুন্দরীরে

আলিঙ্গনে ঘিরে

রাত্রিদিন করিছে সাধনা। (১ সংখ্যক/তাজমহল)

মানুষের এই প্রেমানুভূতিই কবির কাছে মানবশ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম প্রধান কারণ বোলে মনে হয়েছে। এমনভাবে এই কাব্যে বিভিন্ন দিক দিয়ে কবি মানুষকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তাকে উদ্বোধিত করেছেন; অকুণ্ঠ স্বাক্ষর রেখেছেন তার মানবচেতনার, মানবিক প্রত্যয়ের। প্রসঙ্গত আমরা অনুভব করলাম কবির মানবিক চেতনা তার ঈশ্বর চেতনার সঙ্গে বিমিশ্র, ওতপ্রোত।

২.৫ ঈশ্বরচেতনা

রবীন্দ্র-তাত্ত্বিকেরা বলেছিলেন, বলাকার পূর্ববর্তী সংশয়ের পর্যায়ে কবি জগতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণেই আত্মস্থ হতে চেয়েছিলেন। গতি পর্যায়ে (বলাকা-পর্বে) কবির সেখান থেকে নিক্রমণ ও মানুষের প্রাঙ্গণে প্রবেশ। যে-পাশ্চাত্য

দেশে মানুষকে নিয়ে নব নব গবেষণা, যেখানে দেদার অফুরন্ত প্রাণ ছড়িয়ে পড়ছে, যেখানে সর্বনাশের আগমন সম্ভাবনার বেদনার বান ডেকেছে, তবুও তারই মধ্যে জয়ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে মানুষের, যেখানে ঈশান বিশ্ব বাজিয়ে মৃত্যুসাগর মন্থন কোরে অমৃতরস তুলে আনছে, যেখানে যৌবনের স্পর্শমণি-স্পর্শে দীপক তানে জেগে উঠেছে দীপ্ত প্রাণের হর্ষ, সেখান থেকে এসেছেকবির আহ্বান। তাই ঈশ্বরের কাছ থেকে কবির বিদায় গ্রহণ।

কিন্তু একথা ঠিক নয়। কবিচেতনা সারাজীবন ধরে কখনো ঈশ্বর-বিবিক্ত নয়। জীবনের প্রথম থেকে উপনিষদীয় ঈশ্বর-চেতনা তাঁর চিত্তে স্বীকৃত; তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভক্তি-চেতনা, প্রেম-চেতনা ও সুগভীর আকি উপলব্ধি। তার কবিমানসে উপনিষদের 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে । পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে' যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে,

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই

প্রিয়জনে-প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই

তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা!

দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

(বৈষ্ণব কবিতা / সোনার তরী)।

প্রিয়তম আর তার ঈশ্বর এক হয়ে গিয়েছেন। তাই তার অনুভব –

বাসর ঘরের দুয়ারে করালে পূজার অর্ঘ বিরচন ।

(আবির্ভাব | ক্ষণিকা)

আবার গীতাঞ্জলিতে এসে কবির উপলব্ধি

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহপ্রাণ ।

কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।

আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি

দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব, কবি

আমার মুখ শ্রবণে নীরব রহি

শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান। (গীতাঞ্জলি থেকে)

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তার ঐশ্বরিক উপলব্ধি উপনিষদের মন্ত্রের মত উদগীত হয়েছে। একদিকে সুগভীর প্রজ্ঞায় ঈশ্বরের অনুভবের প্রকাশ, অপর দিকে সীমাময়-জগতের মধ্যে অসীম উপলব্ধির ব্যঞ্জনা।

বলাকা কাব্যেও ঈশ্বরের অনুভব ও সেই অনুভবত কবিতার অভাব নেই। বরঞ্চ বলা যায় অন্যান্য বিষয়ক কবিতা অপেক্ষা বলাকায় ঈশ্বর-সম্পর্কিত কবিতার সংখ্যা সব থেকে বেশি। বলাকার পঁয়তাল্লিশটি কবিতার মধ্যে অবিমিশ্র ঈশ্বর চেতনাশিত কবিতার সংখ্যা তেরো-১০, ১১, ১২, ১৭, ২২, ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩। এগুলি ছাড়া অন্যভাবেও ঈশ্বরচেতনাশ্রিত কবিতা আরো আছে।

বলাকা কাব্যের ঈশ্বর-চেতনাশ্রিত কবিতাগুলিতে একটি বিশিষ্ট মাত্রা যোগ হয়েছে। গীতাঞ্জলির ঈশ্বর-সম্পর্কিত কবিতার মূল সুর ছিলো ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ বলতে যা বোঝায় বলাকায় তা নেই। অবশ্য গীতাঞ্জলিতে মূল সুর আত্মসমর্পণ ছাড়াও অন্য সুর ছিল, যদিও তা অপ্রধান। একটু আগেই আমরা গীতাঞ্জলির যে পঙক্তিগুলি উদ্ধৃত করেছি, বলাকার ঈশ্বর-চেতনার মূল কথাও তাই যদিও গৌণ কথা আরো আছে-'আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি/দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব, কবি।' আমরা বলাকার ঈশ্বর প্রসঙ্গে আগেই যে-কথা বলেছি, এখানে আবার তারই উল্লেখ করি। 'মানুষের অহংকার পটে' উপলব্দীকৃত ঈশ্বরের স্বরূপ ও সত্তা অনুধাবনই বলাকা-কাব্যের ঈশ্বর-চেতনার মূল মর্ম। এবং তাও কোনো মরমিয়া ভক্তের অনুভবের মতো ব্যক্ত নয়। সচেতন বুদ্ধিদীপ্তিময় পরিশীলিত মানুষের উপলব্ধি এখানে প্রকাশিত। কোনো ভাবের ঘোর বা ভক্তির আচ্ছন্নতা এখানে নেই, এ সম্পূর্ণ স্পষ্ট এবং বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষিত।

রবীন্দ্র কবিজীবনে মানুষ ঈশ্বর ও প্রকৃতি মিলেমিশে একাকার। বলাকা কাব্যে ঈশ্বর ও মানুষ একই সঙ্গে ওতপ্রোত। ঈশ্বরের চরম সার্থকতা মানুষের অনুভবের মধ্যে ধরা পড়ায়, আর মানুষের পরম প্রাপ্তি ঐশ্বরিক বিশিষ্টতা আত্তীকৃত কোরে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করবার উপযুক্ত হয়ে ওঠা। বলাকার ঈশ্বর-চেতনার মূল কথা এই। তবুও এরই সঙ্গে কিছু বিশিষ্টতা আছে। মোটের উপর ঈশ্বর চেতনার বিশিষ্টতাগুলি আলোচ্য কাব্যে অনুসরণযোগ্য :

১. বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর মানুষকে তার সার্থকতম ঐশ্বর্যগুলি দান কোরে তাকে জৈব বিবর্তনের শ্রেষ্ঠ পরিণামী সত্তায় পরিণত করেছেন।

২. ঈশ্বর মানুষকে তার শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য দান করেন, কারণ মানুষের কাছ থেকে ঐগুলি ফিরে পেলে তিনি পরম তৃপ্তি লাভ করেন।

৩. ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক-সম্বন্ধ-আত্মীয়তা নানা ভাবে ও নানা মাত্রায়। আমাদের মানবিক অহমিকা ও বিশেষ ঝোক (bias) আমাদের যথাযথ ঈশ্বর-উপলব্ধির পথে বাধা। আমরা আমাদের এই বিশেষ বায়াস'-এর উপর নির্ভর কোরে, আমাদের মানস-চাহিদার অনুবর্তী হয়ে, ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ-প্রনোদিত আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ঈশ্বরের প্রসাদ যাচ্চা করি। অপ্রাপ্তিতে ভাবি ঈশ্বরের অবিচার। ঈশ্বরকে আরাধনা করতে চাই আমার অহমিকা-নির্বাচিত উপকরণের দ্বারা; ঈশ্বরের বিচার বোধের অসঙ্গতি অনুভব করি যখন দেখি আমাদের বিবেচনায় পাপী পার্থিব সুখ ভোগ করছে, পুণ্যবান কষ্ট পাচ্ছে, আমাদের বুদ্ধিতে যারা ঈশ্বরদ্বেষী তারাই ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করেছে (আমাদেরই বিচারে), আর নিস্পাপ ও পাপীরা ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ কোরেও তার আশীর্বাদবঞ্চিত, তখন আমরা ভাবি ঈশ্বর একই সঙ্গে বিচারবুদ্ধিহীন ও নির্দয়। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি আংশিকতায় আক্রান্ত, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা প্রকৃত সত্যানুভবের অন্তরায়। আমাদের অহমিকা আমাদের ঈশ্বর আরাধনার সব থেকে বড়ো বাধা। আমরা ঈশ্বরকে আমাদের অহমিকা-নির্বাচিত দানের দ্বারা পরিতৃপ্ত : করতে চাই, আমাদের শ্রেষ্ঠ দানের দ্বারা নয়। এ-সবেরই পরিচয় বিভিন্ন কবিতায়।

আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে,

দেখা দেয়, মিলায় পলকে।

বলে না আপন নাম, পথের শিহরি দিয়া সুরে

চলে যায় চকিত নূপুরে।

সে পথ নাহি জানি,

সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী।

বন্ধু তুমি যেথা হতে আপনি যা পাবে।

আপনার ভাবে,

না চাহিতে, না জানিতে, সেই উপহার।

সেই তো তোমার।

আমি যা দিতে পারি সামান্য সে দান

হোক ফুল, হোক তাহা গান। (১০ সংখ্যক/উপহার).

উদ্ধৃতিটিতে কবির বক্তব্য ;

আমাদের শ্রেষ্ঠ বিকাশ আমাদের তৎপরতা বা প্রচেষ্টা-লক নয়। কখন কোন্ অভাবিত পথে বেরিয়ে আসে তা আমরা জানি না। ঈশ্বরকে আমরা দিতে পারি আমাদের শ্রেষ্ঠ দান। সেই শ্রেষ্ঠত্ব কোনো অর্থমূল্য দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না। তা আমাদের প্রেমের প্রকাশ, গভীরতম অনুভূতির প্রকাশ বা সৌন্দর্যের প্রকাশ, প্রতিভার প্রকাশ। মানুষ নিজেই বেয়ে না কথন তার ভিতর থেকে প্রস্ফুটিত হবে সে বৈশিষ্ট্য। তাই মানুষের স্বকীয় প্রচেষ্টা বা নিজস্ব মতাদর্শ রচিত কোনো নিবেদনের রাক্ষরের পূজা যথাযথ না-ও হতে পারে। ঈশ্বরেরই প্রত্যয় ধরা পড়ে মানুষের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয় তার অর্থ। প্রিয়তম ঈশ্বরের পূজা তাই দিয়েই। কবিতাটিতে ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের সুগভীর ঈশ্বর-প্রেম। এবং বস্তুচেতনাতীত হৃদয়ানুভূতির স্বতঃ প্রকাশিত অর্ঘ্যের দ্বারা ঈশ্বরকে ভালোবাসা নিবেদন।

মানুষকে ঈশ্বরের মার্জনা ও শাস্তি প্রদান আমরা পার্থিব মাপকাঠিতে বিচার (১১ সংখ্যক/ বিচার) কোরে বিভ্রান্ত হই। ঠিক-বেঠিক বুঝতে পারি না। ঈশ্বরের ভালোবাসা ও অন্যায়ের বিচার হাতে হাতে নগদ বিদায় নয়। তার কাজ চলে অন্তরালে দীর্ঘকাল ধরে, দীর্ঘকাল পরে প্রকাশিত হয় তার ফল। আপাতফল লুব্ধ আমাদের জ্ঞানের অন্তরালে রয়ে যায় ঈশ্বরের কর্ম-প্রণালীর সার্থকতা। যারা পথের প্রমোদে মেতে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে কলঙ্কিত করে, কবি দেখেন শাস্তির পরিবর্তে

নীরবে প্রভাত-আলো পড়ে

তাদের কলুষরক্ত নয়নের 'পরে ;

শুভ্র বনমল্লিকার বাস

স্পর্শ করে পালসার উদ্দীপ্ত নিশাস ;

কখনও বা,

জননীর স্নেহ-অশ্রু ঝরে

তাদের উগ্রতা-'পরে ;

প্রণয়ীর অসীম বিশ্বাস

তাদের বিদ্রোহ-শেল বক্ষে করি লয় গ্রাস।

আবার কখনও যখন চোরাধনের দুর্বহ ভারে পীড়িত পাপীয় অনুতপ্ত অঙ্গ পাতনে করুণাসিক্ত কবি ঈশ্বরের কাছে তাদের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করেন, তখন কবি লক্ষ্য করেন ঈশ্বরের মার্জনা নেমে আসে।

ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা শুধু দাও, দাও, দাও। অর্থ ও, বিত্ত দাও, এতিপত্তি দাও, জয় দাও, যশ দাও। ঈশ্বর দিচ্ছেনও অজ, কিন্তু সেই সানের মূল্য কি আমরা বুঝি? আমরা তাকে ফেলি, ছড়াই, হারাই, না করি। আবার এত মন পেয়েও আমাদের তৃপ্তি নেই। পেয়ে প্রত্যাশা বেড়ে যায়, আরো চাই। কবির কাছে শেষ পর্যন্ত দুসহ মনে

হয় সারা জীবন এমন তিক্ষায় ভরিয়ে তুলতে। গানের তার কবির কাছে দুর্বল হয়ে ওঠে।

এই দান এত পেয়েও আমাদের সার্থকতা নেই। দানের স্তূপ আমাদের চাপা দেয়, যেমন করে সমাধিতে মৃত্তিকাপে চাপা পড়ে মৃত মানুষ। মানুষের সার্থকতা অবারিত মুক্তির মধ্যে আত্মপ্রকাশে । দান-সামগ্রীর চাপে নিষ্পেষিত হওয়ায় নয়। তাই ঈশ্বরের কাছে কবির আবেদন, দান-সামগ্রীতে কবিকে ভরিয়ে দিয়ে নয়, কবিকে কবে তিনি গ্রহণ করবেন, প্রেমের মধ্যে, নির্মলতার মধ্যে, অসীমের মধ্যে

লবে তুমি, মোর তুমি লবে, তুমি লবে

এ প্রার্থনা পুরাইবে কবে ?

শূন্য পিপাসায় গড়া এ পেয়ালাখানি

ধুলায় ফেলিয়া টানি

আমার কণ্ঠের মালা তোমার গলায় পরে

লবে মোরে, লবে মোরে

তোমার দানের স্তুপ হতে

তব রিক্ত আকাশের অন্তহীন নির্মল আলোতে।

(১২ সংখ্যক/ দেওয়া-নেওয়া)

২২ সংখ্যক (মুক্তি) কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। এর কারণ কবিতাটির কাব্যিক বৈশিষ্ট্য নয়, এর কারণ কবিতাটি কবির একটি বিশেষ অধ্যাত্ম-উপলব্ধির পরিচায়ক। এ-প্রসঙ্গে কবি আমার ধর্ম প্রবন্ধে (সবুজপত্র, ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রভুর ভালোবাসায় ভৃত্যের ভয়, কখন অসাবধানে প্রভুর মনে আঘাত দিয়ে সেই ভালোবাসা সে হারিয়ে ফেলবে। মহতের আদরে কুরেও একই ভয়। আবার প্রিয়জনের সঙ্গে একাত্মতায় মিশে একাকার হয়ে

গেলেও প্রেমানুল হয় না। তখন কে কাকে অনুভব করবে। বৈষ্ণব সাহিত্য তাই ভক্তির কথা বলে। ভক্তির অর্থ ভাগ। আলাদা হয়ে যাওয়া। যখন নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে দৃঢ় যুক্ত মনে করি, ঈশ্বরের সঙ্গে সত্তা একেবারে একান্ত, তখন আমরা ঈশ্বরের কৃতদাস। ত্খন ঈশ্বরকে আমার অনুভবের বিষয় রূপে পাই না। তখন আমরা শৃঙ্খলিত। যেমন পর্বতকে ঠিক মতো দেখতে হলে কিছু দূরে যাওয়া দরকার, পর্বতের উপর দাড়িয়ে পর্বতের সামগ্রিক রূপ বোঝা যায় না, তেমনি আবার মানস-মুক্তি ছাড়া, ভালোবাসার জনকে ভালোবাসা যায় না। যতক্ষণ আমি ঈশ্বরের নির্বশাসিত,ততক্ষণ আমি তার দাস, ততক্ষণ তাকে ঠিক মতো পাই না। যখন তার থেকে নিজেকে মুক্ত করি, তখনই তৈরি হয় তার সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক। মাতৃগর্ভে যখন সন্তান, মায়ের সঙ্গে তখন তার নাড়ির যোগ যতই তীব্র এবং অব্যবহিত হোক-না-কেন, তখন সে মাকে অনুভবই করে না। গর্ভ ছেড়ে যখন মাটিতে তুমি তখনই ছেলে আপন মাকে দেখতে পায়। তেমনি ঈশ্বরকে অনুভবের জন্য চাই মুক্তির অবকাশ; ঈশ্বরের সঙ্গে একাকার হয়ে যাওয়া নয়, বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে তাকে অনুভব।

রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটির তাৎপর্য প্রসঙ্গে উপনিষদ এবং ইহুদি-পুরাণ অনুসরণ করেছেন। বলেছেন, ‘সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। শান্তং শিবং অদ্বৈতম। ইহুদী পুরাণে আছে- মানুষ একদিন অলোকে বাস কত। সে লোক স্বর্গলোক। সেখানে দুঃখ নেই, মত্যু নেই। কিন্তু যে কে দু:খের ভিতর দিয়ে, মন্দের সংঘাত দিয়ে না করতে পেরেছি, সে স্বর্গ তো জ্ঞানের স্বর্গ নয়—তাকে স্বর্গ বলে জানিই নে। মায়ের গর্ভের মধ্যে মাকে পাওয়া যেমন মাকে পাওয়াই নয়, তাকে বিচ্ছেদের মধ্যে পাওয়াই পাওয়া।

গত ছেড়ে মাটির 'পরে

যখন পড়ে

তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।

তোমার আদর যখন ঢাকে,

জড়িয়ে থাকি তাই নাড়ীর পাকে,

তখন তোমায় নাহি জানি।

আঘাত হানি।

তোমারই আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি

সে বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি

দেখি বদনখানি।

তাই সেই অচেতন লোকে জ্ঞান এল। সেই জ্ঞান আসতেই সত্যের মধ্যে আত্ম বিচ্ছেদ ঘটল। সত্য-মিথ্যা, ভাল মন্দ,জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্ব এসে স্বর্গ থেকে মানুষকে লজ্জা, দুঃখ-বেদনার মধ্যে নির্বাসিত করে দিলে। এই দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে যে অখণ্ড সত্যে মানুষ আবার ফিরে আসে, তার থেকে তার আর বিচ্যুতি নেই। কিন্তু এই বিপরীতে বিরোধ মিটতে পারে কোথায়?-অনন্তের মধ্যে। তাই উপনিষদে আছে: সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। প্রথমে সত্যের মধ্যে জীব সকলেরই সঙ্গে এক হয়ে মানুষ বাস করে, জ্ঞান এসে বিরোধ ঘটিয়ে মানুষকে সেখান থেকে টেনে স্বতন্ত্র করে, অবশেষে, সত্যের পরিপূর্ণ অনন্ত রূপের ক্ষেত্রে আবার তাকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। ধর্মবোধের প্রথম অবস্থায় শান্ত-মানুষ তখন আপন: প্রকৃতির অধীন ; তখন সে সুখকেই চায়, সম্পদকেই চায়, তখন শিশুর মতো কেবল তার রসভোগের তৃষ্ণা, তখন তার লক্ষ্য প্রেয়। তার পরে মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে; তখন সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ, এই দুই বিরোধের সমাধান সে খোঁজে।তখন দুঃখকে সে এড়ায় না, মৃত্যুকে সে ডরায় না সেই অবস্থায় শিবং, তখন তার লক্ষ্য শ্রেয়। কিন্তু এখানেই শেষ নয় ; শেষ হচ্ছে প্রেম, আনন্দ। সেখানে সুখ ও দুঃখের, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও মৃত্যুর গঙ্গাযমুনা সংগম। সেখানে অদ্বৈতং। সেখানে কেবল যে বিচ্ছেদের ও বিরোধের সাগর পার হওয়া তা নয়, সেখানে তরী থেকে তীরে ওঠা। সেখানে যে আনন্দ সে তো দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়। ধর্মবোধের এই-যে যাত্রা এর প্রথমে জীবন, তার পরে মৃত্যু, তার পরে অমৃত। মানুষ সেই অমৃতের অধিকার লাভ করেছে। কেননা, জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেয়ের ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম পথে

দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করেছে। সে সাবিত্রীর মতো যমের হাত থেকে আপন সত্যকে ফিরিয়ে এনেছে। সে স্বর্গ থেকে মর্তলোকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তবেই অমৃত লোককে আপনার করতে পেরেছে। ধর্মই মানুষকে এই দ্বন্দ্বের তুফান পার করিয়ে দিয়ে এই অদ্বৈতে, অমৃতে, আনন্দে, প্রেমে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়। যারা মনে করে তুফানকে এড়িয়ে পালানোই মুক্তি, তারা পারে যাবে কী করে? সেইজন্যেই তো মানুষ প্রার্থনা করে: অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃত গময়। গময় এই কথার মানে এই যে, পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই।

২৭ সংখ্যক (রাজা) কবিতাতেও উপরে উদ্ধৃত কবির ব্যাখ্যার অনুরূপ চেতনা। সেখানেও ঈশ্বর (বা রাজার রাজত্বে বাসা পেতে হলে, রাজার সব দেনা মিটিয়ে দিয়ে নিজের স্বত্বেই নিজেও জোরেই বাসা মেলে। রাজার করুণার দানে নয়, বা রাজার দেনা এড়িয়ে গিয়েও নয়।

- ৩২ সংখ্যক (সন্ধ্যায়) ও ৩৪ সংখ্যক (খোলা জানালায়) কবিতায় ক্ষণ মুহূর্তের চিরন্তনত্ব লাভ-a moment becomes deified to eternity। ঈশ্বরের ভালোবাসার দ্যুতি যখন বিচ্ছুরিত হয় তাঁর বিশ্বপ্রকৃতি থেকে, তখনই ক্ষণিকের এই অনন্যয়ন ধরা পড়ে। তখনই ঈশ্বরের নির্মাল্য আমাদের ছুয়ে যায়। তখন কবি অনুভব করেন,

এমনি করেই প্রভু,

এক নিমেষের পত্রপুটে ভরি

চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নূতন করি।

(৩২ সংখ্যক / সন্ধ্যায়)

আর খোলা জানালায় (৩৪ সংখ্যক)

আমার মনের জানলাটি আজ হঠাৎ গেল খুলে

তোমার মনের দিকে।

সকালবেলার আলোয় আমি সকল কর্ম ভুলে

রইনু অনিমিখে ।

দেখতে পেলেম, তুমি মোরে।

সদাই ডাক যে নাম ধ'রে

সে নামটি এই চৈত্রমাসের পাতায় পাতায় ফুলে।

আপনি দিলে লিখে।'...

বলাকা কাব্যগ্রন্থের শেষ ঈশ্বর-সম্পর্কিত কবিতা ৪২ সংখ্যক (অপমানিত)। আমরা সারাজীবন ধরে অভিযোগ কোরে যাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাই না বোলে, আমাদের জীবনে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনাহূত থাকে বোলে। কিন্তু তিনি বার বার আসেন, আমাদের দুয়ারে এসে সাড়াও দিয়ে যান। কিন্তু আমরা ভুল ভাবি। অনাহুত অতিথি ভাবি তাকে। তাকে অবহেলা করি, এড়িয়ে যাই, চিনবার চেষ্টাই করি না। আমরা আধ-তন্দ্রাচ্ছন্নতায় জীবন কাটিয়ে দিতে চাই, ঘুমিয়ে থাকতে গই, চেতনার আলোক আমাদের সহ্য হয় না। কখনো বা ক্ষুদার্থের বেশে তার আবির্ভাব আমাদের জীবনে নবতর তাৎপর্য সৃষ্টি করবার জন্য। তখনও আপদ ভেবে তাকে বিদায় করি।

তোমারে কি বার বার করেছিনু অপমান?

এসেছিলে গেয়ে গান

ভোরবেলা;

ঘুম ভাঙাইলে বলে মেরেছিনু ঢেলা

বাতায়ন হতে,

পরক্ষণে কোথা তুমি লুকাইলে জনতার স্রোতে !

ক্ষুধিতদরিদ্রতম

মধ্যাহ্নে এসেছ দ্বারে মম ।

ভেবেছিনু, ‘একি দায়!

কাজের ব্যাঘাত এ যে!'—দূর হতে করেছি বিদায়।

তার আগমন কখনো বন্ধুর রূপে, কখনো আপাতশত্রুর ছদ্মবেশে। কখনও যেন মৃত্যু দূত। অদ্ভুত অস্পষ্ট মশাল আলো জ্বালিয়ে দস্যুর মতো তার আবির্ভাব আমাদের জীবনের অন্ধকার দূর করবার জন্য। কিন্তু অহমিকাবদ্ধ আমরা, বুদ্ধির অহংকারে মূঢ়তায় বন্দী আমরা।

দস্যু বলে শত্রু বলে ঘরে দ্বার যত

দিনু রোধ করি।

গেলে চলি, অন্ধকার উঠিল শিহরি।

এরি লাগি এসেছিলে হে বন্ধু অজানা ,

তোমারে করিব মানা,

তোমারে ফিরায়ে দিব, তোমারে মারিব,

তোমা-কাছে যত বার সকলি ধারিব,

না করিয়া শোধ

দুয়ার করিব রোধ। -

তাও ঈশ্বর আমাদের ছেড়ে যান না। বার বার আমাদের চারিপাশে তাঁর আবির্ভাব। জীবনে যাদের আমরা বহু মানে বরণ করি, সম্মানের আসনে বসিয়ে পুজো করি তারা চলে যায়, অন্ধকারে মিলিয়ে যায়, দুদিন পরে আমাদের ভুলে যায়। আর আমাদের ঈশ্বর, আমাদের অবহেলিত ঈশ্বর, বিতাড়িত ঈশ্বর, আমাদের দ্বারা আহত ঈশ্বর-তিনি আমাদের পাশে থাকেন, বার বার নিজেকে প্রকাশ করেন পুস্পের গন্ধে, তারার আলোকে, প্রেয়সীর চোখে, সন্তানের ভালোবাসায়। আমাদের চিত্ত বার বার বেজে ওঠে সে অনাহুত সুরে, অব্যক্ত আলোকে, শব্দহীন ভাষায়। তবুও বার বার তাকে আমরা

অস্বীকার কোরেই যাব, যদিও অনুভব করি তাকে বিনা এ জীবন বড় নিঃসঙ্গ, একাকী, অর্থহীন, মাধুর্যহীন, বৈচিত্র-বিবিক্ত, ধূলিধূসর

তার পরে অর্ধরাতে

দীপ নেবা অন্ধকারে বসিয়া ধুলাতে

মনে হবে আমি বড়ো একা

যাহারে ফিরায়ে দিনু বিনা তারি দেখা।

তবু,

যাহারে দেখি নি চেয়ে নয়নের কোণে,

- যারে নাহি চিনি,

যার ভাষা বুঝিতে পারি নি,

অর্ধরাত্রে দেখা দিবে বারে বারে তার মুখ নিদ্রাহীন চোখে

রজনীগন্ধার গন্ধে তারার আলোকে।

বারে বারে-ফিরে-যাওয়া অন্ধকারে বাজিবে হৃদয়ে

বারে-বারে-ফিরে-আসা হয়ে।

এটাই আমাদের জীবনের অসঙ্গতি (contradiction), আমাদের ট্রাজেডি।

২.৬ প্রকৃতিচেতনা

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন ত্রয়ীচেতনার সম্মিলিত ফলশ্রুতি, এ-কথা আগেই বলেছি। এই ত্রয়ী চেতনা, মানবচেতনা, প্রকৃতিচেতনা ও ঈশ্বরচেতনা। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে প্রকৃতি-অনুভবের ব্যাপারটি আছে দুই ভাবে। নিসর্গপ্রকৃতি অনুভব ও বিশ্বপ্রকৃতি অনুভব। যে-প্রকৃতি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ভাব ও প্রভাব সঞ্চারিত করে, তা আমাদের চারপাশের নিসর্গপ্রকৃতি। গাছ পালা অরণ্য পুষ্প পত্র আকাশ বাতাস নদী

সমুদ্র তারকা প্রভৃতি যখন নিত্য কখনও বা নৈমিত্তিক জীবনকে সৌন্দর্যে আনন্দে, কখনও ভয়ে বিস্ময়ে ভোরে দেয় তখনই তাকে বলতে পারি নিসর্গ প্রকৃতির ক্রিয়া। নিসর্গকে কেন্দ্রে রেখে বা তার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ কোরে কবিতা রচনা কবির কম নয়। কখনো বা নিছক ও অবিমিশ্র প্রকৃতিচিত্র, কখনো বা জীবনের নানা উপলব্ধির সঙ্গে বিমিশ্র প্রকৃতি-চিত্র বা প্রাকৃতিক চিত্রকল্প। অবশ্য অবিমিশ্র প্রকৃতিচিত্র তাঁর কবিতায় কম, কারণ অধিকাংশ সময় প্রকৃতিচিত্র তার ভিন্নতর ভাব-ভাবনার অনুরঞ্জক ও পরিপোষক। অবশ্য একে ঠিক বৈষ্ণব কবিতার উদ্দীপন-বিভাব বলা যায় না। এ হলো প্রকৃতির প্রেরণায় জীবনের গভীরতর তাৎপর্যে অবগাহন। অবশ্য তা বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি বা দার্শনিক প্রজ্ঞা-অভিমুখী নয়। তা সাধারণ জীবনেরই অনুভবের স্তরে নিমজ্জন। যাই হাোক অবিমিশ্র প্রকৃতিচিত্রও তার আছে ।

কবির অবিমিশ্র প্রকৃতি-চিত্রের আবার দুটি রূপ। একটি 'আনন্দরূপমমৃতম যদ্বিভাতি' এবং অপরটি 'Nature red with tooth and nail'। অবশ্য দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতার সংখ্যা খুবই কম, যদিও আছে। তবে শেষ পর্যন্ত তার ভয়ংকরী প্রকৃতি ভয়ংকরত্ব-কে উত্তীর্ণ হয়ে একটি গভীরতর জীবন-মর্ম ব্যক্ত করে। কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা যাক।

প্রথমে তার অবিমিশ্র প্রকৃতিচিত্রের আনন্দরূপ : প্রভাত উৎসব (দ্বিতীয় স্তবক)। প্রভাত সংগীত, বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর (প্রথম দুটি স্তবক) কড়ি ও কোমল, বধূ (১ম, ২য়, ৩য় স্তবক)। মানসী, সুরদাসের প্রার্থনা (৭ম স্তবক)। মানসী, বর্ষার দিনে (১ম ও শেষ স্তবক)/ মানসী, সাোনার তরী (প্রথম ৩ স্তবক) সাোনার তরী, সুখ (১ম স্তবক)/ চিত্রা, মধ্যাহ্ন । চৈতালি, বর্ষামঙ্গল / কল্পনা, আষাঢ়। ক্ষণিকা, নববর্ষা/ ক্ষণিকা, মেঘমুক্ত। ক্ষণিকা, ছুটির আয়াোজন (১ম স্তবক)/ পুনশ্চ, এবং গীতবিতানের প্রকৃতি বিভাগের অন্তর্গত সঙ্গীতগুলি।

দ্বিতীয়তঃ ভয়ংকরী প্রকৃতি: সিন্ধুতরঙ্গ/ মানসী, দেবতার গ্রাস/কথা, বর্ষশেষ / কল্পনা, পৃথিবী। পত্রপুট-'তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতিমুহূর্তের সংগ্রাম •••প্রাণের পরে ছিল তার অন্ধ ঈর্ষা। প্রভৃতি।

এছাড়া রয়েছে কবির বিশ্বপ্রকৃতি অনুভব ও কবিতায় তার প্রতিফলন। কবির নিসর্গ-প্রকৃতি চেতনায় সীমাবদ্ধ প্রকৃতির মধ্য দিয়ে অসীমের সৌন্দর্যানুভ; এবং প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতায় বিশ্বনুভব (feeling of universalisation)!

কবির এই বিশ্বানুভব প্রকৃতির যে-রূপকে আশ্রয় কোরে প্রকাশিত হয়, তাকেই আমরা বলি কবির বিশ্বপ্রকৃতি-চেতনার উৎস। কবির দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞা তার এই বিশ্বপ্রকৃতি-চেতনা থেকেই জীবনীশক্তি সংগ্রহ করেছে। রবীন্দ্রনাথের চোখে বিশ্বপ্রকৃতি একদিকে রসভাণ্ডার, আর-একদিকে প্রজ্ঞায় উৎস। এই প্রকৃতি বাল্য থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত কবির চিত্তে কেবলি সোনালি-পাড় বসানো চিঠির মারফৎ আমন্ত্রণ পাঠিয়েছে। আবার তিনি বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে এক, এই অনুভবও তার মধ্যে সঞ্চারিত করেছে। কবির বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞা এই প্রকৃতি-অনুভবের ফল। রসানুভূতিতে, এবং বৈজ্ঞানিক উপলব্ধিতে কবি বুঝতে পেরেছেন, এই প্রকৃতি তার সত্তারই একটা অংশ। কিংবা বলা যায় তার সত্তা ও প্রকৃতি একাকার। যে বিচিত্র প্রাণসমুদ্র থেকে উৎসারিত ধারা দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিচিত্র ও স্বতন্ত্র উদ্ভিদ ও প্রাণীতে পরিণত হচ্ছে, আদিতে সেই প্রাণসমুদ্রে কবিসহ সকল জীব ও উদ্ভিদ পরিব্যাপ্ত ও সমাকৃতি হয়েছিলো। কাবরাং প্রকৃতিজাত বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞার পরিচয়বহ কবিতার শুরু তার যৌবন-কাল থেকেই। তার বিখ্যাত কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কবিতার মধ্যে উল্লেখ্য সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় | প্রভাত সংগীত, অহল্যার প্রতি/মানসী, সমুদ্রের প্রতি/সোনার তরী, বসুন্ধরা/ঐ, সমুদ্র/পূরবী।

কবির অধিকাংশ প্রকৃতিচেতনাত্মক কবিতার বৈশিষ্ট্য তা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রথমে আমাদের একাত্ম করে। পরে তা আমাদের একটি প্রজ্ঞায় পৌছিয়ে দেয়। বহু কবিতায় বেশ কিছু অবিমিশ্র প্রকৃতি-চিত্র থাকলেও তার পাশাপাশি থাকে উক্ত চিত্র থেকে জাত ভিন্নতর জগৎ ও জীবন-উপলব্ধি। তার অধিকাংশ প্রাকৃতিক কবিতায় দ্রুতির দীপ্তিণ (transfor mation of the feeling of delimitation into intuition),

বলাকা সম্পর্কে একথা বিশেষভাবে সত্য। বলাকায় দু-চারটি অবিমিশ্র প্রকৃতি চিত্র-সমন্বিত কবিতা আছে। কিন্তু তা ভিন্নতর কোনো অনুভবের অনুষঙ্গ রূপে। কখনো বা

বিশ্বপ্রকৃতি এসেছে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তার ও তত্ত্বের পটভূমিকা ও পরিপোষক রূপে। আমরা আগেই জেনেছি, বলাকার মূল সুর তত্ত্ব-কেন্দ্রিক। গতিতত্ত্ব, বিপ্লবচেতনা, বিশ্ববিবর্তন ও জৈববিবর্তনতত্ব এই কাব্যের প্রধান আশ্রয়। এই কাব্যের প্রকৃতিও এই তত্ত্বগুলির পটভূমি ও প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। যদিও সেই তত্ব শেষপর্যন্ত কাব্যানুভবে উত্তীর্ণ ও কাব্যরসনিষ্পত্তিতে সার্থক।

পউষের পাতাঝরা তপোবনে

আজি কী কারণে

টলিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাস;

নাই লজ্জা, নাই ত্রাস,

আকাশে ছড়ায়ে উচ্চহাস

চঞ্চলিয়া শীতের প্রহর শিশির মন্থর।

(১৩ সংখ্যক। যৌবনের পত্র)

ওরে তোদের তর সহে না আর?

এখনো শীত হয় নি অবসান।

পথের ধারে আভাস পেয়ে কার।

সবাই মিলে গেয়ে উঠিস গান?

ওরে পাগল চাঁপা, ওরে উন্মত্ত বকুল,

কার তরে সব ছুটে এলি কৌতুকে আকুল। (২১ সংখ্যক/অগ্রণী)

দ্বিতীয় উদ্ধৃতির একটি বাস্তব পটভূমিকা আছে। বিগত বসন্তের স্মৃতিবহ তাহলে দ্বিতীয়টি পরিবেশের অকাল-বসন্তের পরিচায়ক। কবিতাটি ৮ই মাঘ লেখা। কিন্তু কবিতাটিতে একটি পৌষের দিনের স্মৃতি কাজ করেছে। সেবার পৌষের দারুণ শীতের

মাঝে হঠাৎ দুএকদিন দক্ষিণা বাতাস দিচ্ছিল। কবি সেদিন ট্রেনে কলকাতায় যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেবলেন, ট্রেন লাইনের দুইধারে নানা রকমের ফুল সেই অকালবসন্ত সমীরণের ডাকের চোটে একেবারে তাড়াহুড়ো করে ভিড় করে দৌড়ে বেরিয়ে পড়েছে। রঙ-বেরঙের বসনে। সুতরাং এটিকে একটি অবিমিশ্র প্রকৃতি-চিত্র বলা যায়। কিন্তু একটু গঢ়ার্থ-ব্যঞ্জনাও রয়েছে, আভাস পেয়ে কার'-এর মধ্যে। এই 'কার' থাকাতে এটি প্রকৃতি-চিত্রকে ছাড়িয়ে ভিন্নতর তাৎপর্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

প্রকৃতি-চিত্রের আভাস রয়েছে ১০ সংখ্যক উপহার, ও ৩৩ সংখ্যক প্রেমের বিকাশ কবিতায়। ১০ সংখ্যক-এ বসন্তের পুষ্পবন থেকে উত্থিত অজানা গোপন গন্ধের পুলক, সন্ধ্যার কবরী থেকে খসা একটি রঙিন আলো, প্রভাতের গান প্রভৃতি আছে। কিন্তু এসবই ঈশ্বর-চেতনার অনুষঙ্গ রূপে। সুতরাং অরিমি প্রকৃতি এখানেও নেই। ৩৩ সংখ্যক সম্পর্কেও একই কথা সত্য। সেখানে,শরৎ আকাশে অরুণ-আভাস, ফুলের ঝড়, মানস-সরোবর, সূর্য-তারার পরিভ্রমণ, আলোর মঞ্জরীর মতো জগৎ প্রভৃতি আছে। কিন্তু তাও ঈশ্বর-প্রেমের বিকাশরূপে। প্রকৃতির যথার্থ চিত্র-সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি রূপে নয়। সুতরাংবর্ণনায় প্রকৃতি থাকলেও, কবিতাগুলি খাঁটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবহ কবিতা হয়ে উঠতে পারেনি।

আরো দুটি কবিতা প্রাকৃতিক চিত্রকল্প, কিন্তু তবুও তারা নিসর্গ কবিতা নয়। যেমন ১৪ সংখ্যক 'মাধবী' ও ৩২ সংখ্যক 'সন্ধ্যায়' কবিতা। মাধবীতে

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে

ধরণীর তলে।

ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী

এ আনন্দচ্ছবি

যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে।

অনবদ্য এই ছবিটি প্রকৃতি-চিত্র হতে গিয়েও পারলো না, কারণ পরের স্তবকের কবির বক্তব্য ; সেখানে একে একটি বিবর্তন-প্রক্রিয়ার পরীক্ষারূপে (experiment) গণ্য করা হল। এ-যেন জগতের একটি ভাবের (idea-র) রূপ গ্রহণ। এটি হল ১৬ সংখ্যক 'রূপ' কবিতার ভূমিকা। জগতে ভাসমান অসংখ্য অনঙ্গ : ভাব রূপ পরিগ্রহ কোরে সার্থক হতে চাইছে। মাধবী এমনই একটি ভাবের রূপময় প্রকাশ। লক্ষ বৎসরের ধরিত্রীর তপস্যার ফলে এটি সম্ভব হয়েছে। কবিরও মনে আজ যে ভাব জাগছে তাও হয়তো এমনি বহু বৎসর পরে রূপমূর্তি ধারণ কোরে সার্থক হয়ে উঠবে। কবিতাটির এই তাত্ত্বিক ভূমিকা কবিতাটিকে.নিসর্গ-প্রাকৃতিক কবিতার আসরে ঢুকতে দেয়নি। ৩২ সংখ্যক সন্ধ্যায় কবিতাটিতে প্রকৃতির অনুভব অনেক গভীর। এর সঙ্গে ঈশ্বর-চেতনা বিমিশ্র। তবুও অন্যান্য কবিতা-অপেক্ষা এর নিসর্গ-প্রাকৃতিক সৌরভ অনেক বেশি।

আজ এই দিনের শেষে,

সন্ধ্যা যে ঐ মানিকখানি,পরেছিল চিকন কালো কেশে,

গেঁথে নিলেম তারে ...

এই তো আমার বিনিসুতার গোপন গলার হারে। ...

চক্রাকের নিদ্রানীরব বিজন পদ্মাতীরে

এই-যে সন্ধ্যা ছুইয়ে গেল আমার নতশিরে

নির্মাল্য তোমার

আকাশ হয়ে পার ;

ঐ-যে মরি মরি

তরঙ্গহীন স্রোতের 'পরে ভাসিয়ে দিল তারার ছায়াতরী। আলোচ্য কাব্যের সম্পদ বিশ্বপ্রকৃতির পরিচয়বহ দুটি কবিতা। সে-দুটি যথাক্রমে চঞ্চলা (৮ সংখ্যক) ও, বলাকা (৩৬ সংখ্যক)। এ-দুটি কবিতার একটি প্রকৃতির গতিচেতনার প্রতীক,তথা বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক বিশ্বচেতনার। সেটি চঞ্চলা কবিতা। দ্বিতীয়টিও প্রকৃতির রূপকে ধারণ কোরে

আছে। সেখানে অনির্দেশ গতির কথা সুন্দর প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত। সেটি বলাকা (৩৬ সংখ্যক)। আরো একটি আছে ঝড়ের খেয়া(৩৭ সংখ্যক)। এর প্রথম স্তবকে ভয়ংকরী প্রকৃতি চিত্র।সেটি বিপ্লব-চেতনার অনুষঙ্গ রূপে এসেছে। বিশ্ব-গতিচেতনা, ও বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক বিশ্ব-চেতনা হয়ে দেখা দিয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যাবে ৮ সংখ্যক ও ৩৬ সংখ্যকের আলোচনায়, এবং ৩৭ সংখ্যকের আলোচনায় বিপ্লবের অনুষঙ্গরূপে ভয়ংকরী প্রকৃতির ভূমিকা বোঝা যাবে। সে তিনটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

বলাকা কাব্যে দুটি মাত্র কবিতা আছে যেখানে প্রকৃতি অবিমিশ্র। কোনো তত্ত্ব বা ভিন্ন কোনো ভাবের উদাহরণ বা ভূমিকা রূপে ঐ কবিতার প্রকৃতি-চিত্র নয়। অত্যন্ত সাধারণ সহজ প্রকৃতির ছবি। একটি ৪১ সংখ্যক, শীর্ষনাম-বিহীন। যার প্রথম পঙক্তি যে কথা বলিতে চাই। অপরটি ২৬ সংখ্যক / আবার। সব সাধারণই প্রকৃতপক্ষে অসাধারণ। প্রত্যেক সৌন্দর্যমূর্তিই অনির্বচনীয় আনন্দসঞ্চারক, তা আমাদের যত পরিচিত হাকে-না কেন। দূরে গিয়ে নয়, বহু কষ্ট স্বীকারের পরে নয়, কবি তার দ্বারের পাশেই সহস্রবার যে-প্রকৃতিকে দেখেছেন তা বার বার তার হৃদয়কে ভরিয়ে দিয়েছে। এতে সহজেই এই সরল সৌন্দর্য তার হৃদয় ভরিয়েছে যে তা বর্ণনা করা দুরূহ -

যে-কথা বলিতে চাই,

বলা হয় নাই, ...

সে কেবল এই

চিরদিবসের বিশ্ব আঁখিসম্মুখেই

দেখি সহস্রবার

দুয়ারে আমার।

অপরিচিতের এই চিরপরিচয়।

এতই সহজে নিত্য ভরিয়াছে গভীর হৃদয়।

সে-কথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী

আমি নাহি জানি।

এমন কিছু বিস্ময়কর বা গৌরবসমুন্নত প্রকৃতি নয়।উন্নত পাহাড়, বা অসীম সমুদ্র বা গহন অরণ্যানী নয়, একটি প্রান্তরে একাকী দাড়িয়ে থাকা একটি ছায়া বটের দৃশ্য মাত্র। তার সঙ্গে নদীর ঢালু তটে চাষীর কর্ষণকার্য, ওপারের অনশত তৃণশূন্য বালুতীরের দিকে হংসপঙক্তির উড়ে-চলা, ক্লান্তস্রোত-শীর্ণনদী, মাঠের ধারে ধারে বাঁকা পথরেখা, ক্ষুদ্র কুটির-এ-সব নিয়ে একখানি অতি সাধারণ নিসর্গ দৃশ্য। সাধারণ বলেই এরা আভিজাত্যের দূরত্ব সৃষ্টি করে না। পক্ষান্তরে গাছ নদী পথ কুটির এবং তার সঙ্গে কবি, সকলের সঙ্গে সকলের আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়।

শূন্য প্রান্তরের গান বাজে ওই একা ছায়াবটে ;

নদীর এপারে ঢালু তটে

চাষী করিতেছে চাষ ;

উড়ে চলিয়াছে হাঁস।

ওপারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীরতলে।

চলে কি না-চলে

ক্লান্ত স্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষ-নিহত

আধোজাগা নয়নের মতো।

পথখানি বাঁকা

বহুশত বরষের পদচিহ্ন-আঁকা

চলেছে মাঠের ধারে, ফসল-খেতের যেন মিতা,

নদীসাথে কুটিরের বহে কুটুম্বিতা।

বার বার কবি এ সব দেখেছেন। কাব্য নয়, চিত্র নয়, তত্ত্ব নয়, দর্শন নয়, ওই সহজ নিসর্গ-প্রকৃতির নিহিত গভীরতা কবিকে বার বার উদাস করেছে। কবির হৃদয় একেই প্রকাশ করতে চায়। বলাকা কাব্যে খাটি অবিমিশ্র তত্ত্ব-দর্শন-নিরপেক্ষ প্রকৃতি-চিত্র বলতে প্রধানতঃ এইটাই। এর সহজ ও সরল আবেদন দ্রুতি-সঞ্চারক। কবিতাটি কবির পুনশ্চ, কাব্যের সহজ সরল নিস-চিত্রের (কোপাই, খোয়াই প্রভৃত্রি) ভূমিকা। অবশ্য সেখানেও তুচ্ছের মধ্যে মহত্ব আবিষ্কারের প্রচেষ্টা আছে। এখানে তাও নেই।এখন কবির বলাকা কাব্যের প্রকৃতি-চিত্র সম্পর্কে সূত্রাকারে বলা যায় :

১. কবির প্রকৃতি-চেতনা দুই রূপকে কেন্দ্র কোরে প্রকাশিত-নিসর্গ-প্রকৃতি ও বিশ্ব প্রকৃতি।

২. কবি এই কাব্যে প্রকৃতিকে অবিমি নিসর্গ-প্রকৃতি রূপে খুব কমই অনুভব করেছেন। হয় এ তার অন্য কোনো ভাবের (idea) অনুষঙ্গ রূপে ব্যবহৃত, কিংবা গতিচেতনা বা জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানিক বিশ্বচেতনার অভিব্যক্তিরূপে উপলীকৃত।

৩. কবির বিশ্বপ্রকৃতিগত গতিচেতনার পরিচয়বহ প্রকৃতি-চিত্র রয়েছে চঞ্চলা ও বলাকা কবিতায়। কবির ভয়ংকর নিসর্গ-প্রকৃতি তার বিপ্লবচেতনার পরিপোষকরূপে ঝড়ের খেয়া কবিতায়।

৪. কবির দুটি মাত্র অবিমিশ্র খাঁটি নিসর্গ-চিত্রের কবিতা। ৪১ সংখ্যকটি তার মধ্যে প্রধান। অপরটি ২৬ সংখ্যক।

২.৭ যৌবন বন্দনা

অ) যৌবনের জয়গান: নবীন বরণ

বলাকা গতিবাদের কাব্য। গতিই জীবনকে সচল রাখে, উজ্জ্বল রাখে। গতিহীনতা, স্থবিরত্ব, স্থাবরত্ব, মৃত্যুর অগ্রদূত। কি বিশ্বজাগতিক নিয়মের ক্ষেত্রে কি সামাজিক রাষ্ট্রিক নিয়মের ক্ষেত্রে বা মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে, এই গতিই বার বার নবজীবন স্পন্দন সৃষ্টি করে। দীর্ঘ দিনের অনড় সংস্কার মানুষের সকল কল্যাণকে রুদ্ধ কোরে দেয়।

গতিহীন নদী যেমন বন্ধ, পঙ্কিল, আবর্জনাসর্বস্ব, গতিহীন রাঃ, সমাজ ও সভ্যতাও তেমনি বিকৃতির বদ্ধ পঙ্কে মৃত্যুপথযাত্রী। তাই জীবনকে নূতনত্ব পান করবার জন্য, রাষ্ট্রকে লোভমতার পঙ্ক থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য, সমাজকে অপসংস্কার থেকে মুক্ত করবার জন্য, সভ্যতাকে নব নব চেতনায় উদ্বগ করার জন্ত, এদের সবকিছুর মধ্যে গতি সঞ্চার করা দরকার। এবং এ-কাজ সম্ভব সেই সব কিশোর, যুবক, নবীনদের দ্বারা যারা যৌবনস্পর্শে দেহ-মনে চলতার অধিকারী,প্রবীণতার তর্ক-যুক্তিজলে যাদের জীবনের গতিপথ বাধা সড়কের উপর সার মানি নয়, যারা নতুনকে পরীক্ষা ও এহল্প করতে অকুতোভয়। তাই গতিদের এই কাব্যে কবি নবীনদের আহ্বান করেছেন নূতন জীবন রথ অশ্বের বল্গা ধারন করবার জন্য, বরণ করেছেন সবুজকে নব অভিযানে অগ্রীর ভূমিকা গ্রহণ করতে। যৌবনের জয়গানে তাই এ-কাব্য মুখর।

কবির যৌবন-চেতনার একটি পটভূমি আছে। বলাকা-পূর্ব কবিজীবনে একটি সংশয়ের পর্ব এসেছিল। তার থেকে মুক্তির জন্য গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য- গীতালিতে আধ্যাত্মিক জগতের আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু সম্ভবত কালক্রমে কবি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন, আধ্যাত্মিক শান্তি কে ক্রমশ: জড়-নিষ্ক্রিয় জীবনের দিকে পরিচালিত করছে। সেই স্থবিরত্ব থেকে মুক্ত হয়ে কবি আবার নবযৌবনের। সক্রিয়তা ও কর্মচঞ্চলতার অধিকারী হতে চেয়েছেন। আর তার ফলেই বলাকায়। নবীনবরণ ও যৌবনের জয়গান।

তাছাড়া কবি বলাকা-রচনার পূর্বে দীর্ঘকাল য়ুরোপ-আমেরিকা ভ্রমণ করেছিলেন। এই ভ্রমণও কবিমানসে নবতর যৌবনচেতনা ও নবীনবরণের তীব্র আকাক্ষা সঞ্চারিত করেছিল। এবার য়ুরোপে গিয়ে পাশ্চাত্যের বিপুল ও তীব্রস্রোত-জীবনরসধারায় নিজেকে পরিপূর্ণ করে তিনি ফিরেছিলেন, অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মহাশয় আমাদের এ বিষয়ে অবহিত করেছেন। পাশ্চাত্য জীবন ধারার এই গতিময়তা একদিকে কবিকে গতিচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলো এবং অপরদিকে এই গতিকে গ্রহণ ও ধারণ করবার জন্য নবীনবরণে তাকে অনুপ্রাণিত করেছিলো। কবি অনুভব করেছিলেন, জাগ্রত যৌবনই এই নবজীবনের ও নবীন পৃথিবীর ভগীরথ। যৌবনের জয়গানের মধ্য দিয়ে

কবি সেই সবুজ কিশলয়কে আপন শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন।এ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নবীনবরণ ও যৌবনের জয়গানের পরিচয় রয়েছে এই কাব্যের ১, ২, ৩, ৪, ৩৭, ৪৪ ও ৪৫ সংখ্যক (সবুজের অভিযান, সর্বনেশে, আহ্বান, শঙ্খ, ঝড়ের পথয়া, যৌবন, নববর্ষের আশীর্বাদ) কবিতায়। প্রথম কবিতাটিতেই ভারতীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের দীর্ঘদিনবাহিত রুদ্ধস্রোত জলাশয়ের পঙ্কমুক্তির জন্য ও তাতে আবার নবীনস্রোত প্রবাহিত করবার জন্য কবি ডাক দিয়েছেন নবীনদের। এই নবীন অন্ধ বিশ্বাসে সব-কিছু মেনে নেবে না, চলমান জীবনের নিকষপাথরে সব-কিছু পরীক্ষা কোরে তবেই তার মূল্য নির্ধারণ করবে ; রায়ে সমাজে ধর্মে ভূপীকৃত প্রাণশক্তি-বিরাোধী আবর্জনা থেকে মুক্ত করবে জীবনস্রোতকে। নব জীবনাবেগে হয়তো তারা অনেক ভুল করবে। কিন্তু ভয় তত ভুলকে নয়, ভয় জড়কে, বদ্ধ সংস্কারকে। সচল জীবন ভুল করে, আবার ভুলকে অতিক্রমও করে । নবীনের প্রমত্ততা জীর্ণ ঝরা ঝরিয়ে দিয়ে নব কিশলয়ের উদগম সম্ভব কোরে তুলবে। তাদের প্রলয়ংকার পদসঞ্চারে তড়িৎ-ভরা ঝড়ের মেঘের আভাস, কিন্তু পরিণামে তাই আবার মেঘমুক্ত আকাশের দীপ্ত নবীন সূর্যের আবরণ উন্মোচনকারী -

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,

ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,

আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে

আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,

সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে।

পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।

আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা!

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী,

জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে।

প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।

সবুজ নেশায় ভোর করেছি ধরা,

ঝড়ের মেঘে তোরি তড়িৎ ভরা,

বসন্তেরে পরাস আকুলকরা

আপন গলার বকুল-মাল্যগাছা।

আয় রে অমর, আয় রে আমার কাঁচা। (১ সংখ্যক/সবুজের অভিযান)

কাব্যর দ্বিতীয় কবিতাটিও প্রায় প্রথমটির অনুরূপ। সমস্ত প্রাচীন, পচা, বদ্ধ আবর্জনার ধ্বংসসাধন করবার জন্য সর্বনেশে'র আগমুন সূচিত হয়েছে এই কবিতায়। কবিবন্ধু এন্দ্রুজ সাহেবের মনে হয়েছে ১৯১৪র মহাসমরই ওই সর্বনাশের অগ্রদূত এবং কবির কাছে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগেই তার ইঙ্গিত পৌছিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কবি বলছেন, 'আমার এই অনুভূতি ঠিক যুদ্ধের অনুভূতি ছিল না। আমার মনে হয়েছিল যে, আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবদানপ্রায়। মৃত্যু দুঃখ ও বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন।'

এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।

বেদনায় যে বান ডেকেছে,

রোদনে যায় ভেসে গো।

রক্তমেঘে ঝিলিক মারে,

বজ্র বাজে গহন-পারে,

কোন্ পাগল ওই বারে বারে

উঠছে অট্ট হেসে গো।

এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।

(২ সংখ্যক/সর্বনেশে)

এই 'সর্বনেশে' আর কেউ নয়, সে যৌবনেরই অগ্রদূত। আপাত-পাগলামির অট্টপ্রমত্ততার অন্তরালে সে নবজীবনবাণ বহন করে আনছে।

তিন সংখ্যক কবিতাটিতেও পূর্বোক্ত কবিতার ভাবানুবৃত্তি। সম্মুখে অগ্র গমনেই জীবনের পরিচয়, পিছনের টানে যারা বদ্ধ তারাই দুঃখময় স্থবিরত্বের বলি। তাই কন্টকবিদ্ধ রক্তাক্ত চরণে প্রচণ্ড রৌদ্রদাহের মধ্য দিয়েও সামনে চলতে হবে। যারা এই যাত্রায় নির্ভয়, তারাই অমৃতরস সংগ্রহের অগ্রপথিক।

জাগবে ঈশান, বাজবে বিষাণ,

পুড়বে সকল বন্ধ।

উড়বে হাস্তায় বিজয়-নিশান,

ঘুচবে দ্বিধাদ্বন্দ্ব।

মৃত্যুসাগর মথন করে

অমৃতরস আনব হ'রে,

ওরা জীবন আঁকড়ে ধরে ;

মরসাধন সাধবে।

কাঁদবে ওরা কাঁদবে। (৩ সংখ্যক/আহ্বান)

চতুর্থ কবিতাটিতে যৌবনকে আহ্বান বহুদিনগত রাষ্ট্রনীতিক,অন্যায় ও অবিচার থেকে মুক্ত কোরে জগৎকে নব মায়দীপ্ত জীবনচেতনার প্রান্তে পৌছিয়ে দেওয়ার অন্য। দীর্ঘদিন ধরে বলবান জাতি দুর্বলের উপর অত্যাচার চালিয়েছে। সমস্ত শান্তির কালা

শক্তিমদমত্তের রক্তলোলুপতায় বিপর্যস্ত। তাই আজ সুখের জন্য শুধু প্রার্থনা নয়, শান্তির জন্য শুধু পূজার অর্ঘ্য নিবেদন নয়, আজ তাকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য যৌবনদীপ্ত শক্তির আরাধনা। ব্যায়ের যে জয়শষঅত্যাচারীর আঘাতে ধুলিলুণ্ঠিত, তাকে দুই হাতে তুলে নিয়ে নবজীবননাদে পূর্ণ করবার জন্য যৌবনের পরশমণিস্পর্শের দীপ্ত প্রার্থনা

যৌবনেরই পরশমণি

করাও তবে স্পর্শ।

দীপক-তানে উঠুক ধ্বনি

দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।

নিশার বক্ষ বিদার করে

উদবোধনে গগন ভরে

অন্ধ দিকে দিগন্তরে

জাগাও-না আতঙ্ক।

দুই হাতে আজ তুলব ধরে

তোমার জয়শঙ্খ। | (৪ সংখ্যক/ শঙ্খ)

বহু মৃত্যু এবং বিপ্লবের পথ অতিক্রম কোরে দীর্ঘ রাত্রির দুস্তর তপস্যার মধ্য দিয়ে নূতন উষার স্বর্ণদ্বারপ্রান্তে পৌঁছনোর দীপ্ত আহ্বানবাণী ৩৭ সংখ্যক (ঝড়ের খেয়া) কবিতায়। নবীন-বরণের এমন প্রমত্ত মহোৎসব বাংলা কাব্যে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। ‘ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘ’, ‘গর্জমান সমুদ্র’, ‘বহিষ্ঠাতরঙ্গের বেগ’ এবং ‘লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোলে’র মধ্য দিয়ে সম্মুখে প্রসারিত নূতন জীবন অভিসারের নির্দেশক এই যাত্রাপথ। বহু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নূতন জীবন প্রত্যয়বৃত এই জগতে দ্বিধাহীন পদসঞ্চারের জন্য কবির প্রেরণাসঞ্চার

মৃত্যু ভেদ করি

দুলিয়া চলেছে তরী।

কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার

সময় তো নাই শুধাবার।

এই শুধু জানিয়াছে সার,

তরঙ্গের সাথে পড়ি।

বাহিয়া চলিতে হবে তরী;

টানিয়া রাখিতে হবে পাল,

আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল;

বাঁচি আর মরি,

বাহিয়া চলিতে হবে তরী।

এসেছে আদেশ

বন্দরের কাল হল শেষ ।

অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে দেশ

সেথাকার লাগি

উঠিয়াছে জাগি

ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।

মরণের গান।

উঠেছে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে

ঘোর অন্ধকারে। (৩৭ সংখ্যক/ঝড়ের খেয়া)

৪৪ সংখ্যক (যৌবন) কবিতাটিতেও সুখের নিভৃত নিঃশঙ্ক নিবাস থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের অশান্ত মৃত্যু-আকীর্ণ জগৎ থেকে অমৃত আহরণের অগ্র যৌবনকে ডাক দিয়েছেন কবি, বরণ করেছেন নবীনকে তার ‘খড়গসম দীপ্ত শিখায়’ ‘জরার কুজ্ঝটিকা’ ছিন্ন করবার জন্য ।

যৌবন রে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে ?

তুই যে পারিস কাটাগাছের উচ্চ ডালের পরে

পুচ্ছ নাচাতে।

তুই পথহীন সাগর পারের পান্থ,

তোর ডানা যে অশান্ত অক্লান্ত,

অজানা তোর বাসার সন্ধানে রে ,

অবাধ যে তোর ধাওয়া;

ঝড়ের থেকে বকে নেয় কেড়ে

তোর যে দাবি-দাওয়া। (৪৪ সংখ্যক/যৌবন)

এবং এই কাব্যের শেষ কবিতাটিতে (নববর্ষের আশীর্বাদ) পুরাতন যুগকে বিসর্জন দিয়ে মূতন যুগের আহ্বান বাণী ধ্বনিত। এই নূতনের জন্ম কোনো সুবর্ণ ঝিনুক মুখে নিয়ে নয়, ‘রুদ্রের ভৈরব গান’, ‘ধূসর পথের ধুলা’, ‘কাল বৈশাখীর আশীর্বাদ', 'শাবণ রাত্রির বনাদ’, ‘কণ্টকের অভ্যর্থনা' এবং পথে পথে ‘ গুপ্তসর্প গুঢ়ফণার’ মধ্য দিয়ে এই নূতনের আগমন সূচিত। বহু বাধা মৃত্যু ও যন্ত্রণাদী, : তবুও দীপ্ত জীবনপ্রত্যয়-স্বাক্ষরিত নববর্ষের উদ্বোধনে এই কাব্যগ্রন্থের সমাপ্তি -

পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি

ওই কেটে গেল ওরে যাত্রী!

এসেছে নিষ্ঠুর,

হোক রে দ্বারের বন্ধ দুর,

হোক রে মদের পাত্র চুর।

নাই বুঝি, নাই চিনি, নাই তারে জানি,

ধরো তার পাণি

ধ্বনিয়া উঠুক তব হৃৎকম্পনে তার দীপ্ত বাণী ।

ওরে যাত্রী,

গেছে কেটে, যাক কেটে পুরাতন রাত্রি। (নববর্ষের আশীর্বাদ)

আ) ভিন্নতর যৌবন-অনুভব : ফেলে-আসা দিন

এই কাব্যগ্রন্থে আর-একশ্রেণীর যৌবনের কবিতা আছে। এগুলি কবির ব্যক্তিগত যৌবনস্মৃতির। বলা হয় বলাকায় কবির দ্বিতীয় যৌবন। বলাকা রচনার ঠিক আগে কবি দীর্ঘদিন পাশ্চাত্য পৃথিবীতে অতিবাহিত করেছিলেন, একথা আগেই বলেছি। সেখানকার যৌবনমত্ত জীবনচেতনা, সম্ভবত কবিমানসেও নবতর যৌবনানুভূতির প্রেরণাও সঞ্চার করেছিল। তারই ফলে প্রৌঢ়ত্বপ্রান্তে কবির দ্বিতীয়বার যৌবন উপলব্ধি। এই যৌবন শরীরগত সীমায়তি ছাড়িয়ে, প্রতীকে পরিণত। তার ফলে সময়ের সীমা পার হয়ে কবিমানসে চিরন্তনত্ব লাভ করেছে এই যৌবন। কবির পার্থিব বয়োভারাক্রান্ত বহির্জীর্ণ শরীরের অন্তরালে প্রতীকায়িত এই যৌবন অহরহ তার নবীনস্পর্শ সঞ্চারিত কোরে চলেছে, বিচিত্র জীবন-পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে, এমন কি জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়েও। কবি, নতুন শেরে উপলব্ধি করছেন তার বহু দিনকার ভুলে-যাওয়া যৌবন' সহসা তার কাছে পত্রদূত প্রেরণ করেছে এবং লিখেছে সে

এসো এসো, চলে এসো বয়সের জীর্ণ পথশেষে,

মরণের সিংহদ্বার।

হয়ে এসে পার;

ফেলে এসো ক্লান্ত পুষ্পহার ।

ঝরে পড়ে ফোটা ফুল, পদে পড়ে ঐ প্যভার,

স্বপ্ন যায় টুটে,

ছিন্ন আশা ধূলিতলে পড়ে পুটে ।

শুধু আমি যৌবন তোমার

চিরদিনকার ;

ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার

জীবনের এপার ওপার। (১৩ সংখ্যক/ যৌবনের পত্র)

কবির ব্যক্তিগত যৌবন-চেতনার আরো পরিচয় রয়েছে আলোচ্য কাব্যের ১৮ (যাত্রা), ২১ (অগ্রণী), ২৫ (এবার), ২৬ (আবার) এবং ৪০ (চেয়ে দেখ) সংখ্যক কবিতায়। ১৮ সংখ্যক কবিতাটি যদিও ফেলে আসা যৌবন স্বতির, তবুও কবি তাকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন, পরাতে চেয়েছেন মালা চিরযৌবনকে। ব্যক্তিগত বার্ধক্য অতিক্রম কোরে বিশ্বাত্মক যৌবন-চেতনার মধ্যে কবিমানসের পদসঞ্চার এই কবিতায়। যে বার্ধক্য তার স্তুপাকার আয়োজনের দ্বারা কবিকে স্থবিরত্বের দিকে আকর্ষণ করছে, তার আহ্বানকে অস্বীকার করে চিরন্তন যৌবন চেতনাকে অর্ঘ্য নিবেদন -

কেন মিছে।

আমারে ডাকিস পিছে ? '

আমি তো মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে

রব না ঘরের কোণে থেমে।

আমি চিরযৌবনেরে পরাই মালা,

হাতে মোর তারি তো বরণডালা।

ফেলে দিব আর সব ভার,

বার্ধক্যের স্তূপাকার

আয়োজন। (১৮ সংখ্যক / যাত্রা)

কবির এই ব্যক্তিগত যৌবন-চেতনা কারুণ্য-মিশ্রিত। কবিকে এ-যৌবন নবীন শক্তিতে উচু করে না, কেবল কবিকে পুরাতন যৌবনস্মৃতিচারণে প্রবুদ্ধ করে মাত্র। এই ব্যতিচারণ বেদনামণ্ডিত, কারণ, বাস্তবে আর কোনদিন তা রূপমূর্তি 'পরিগ্রহ করবে না। এই ভাবনার অভিব্যক্তি ২৫ সংখ্যক (এবার) কবিতায় –

সে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল

লয়ে দলবল

আমার প্রাঙ্গণতলে কলহাস্য তুলে

দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে,

নবীন পল্লবে বনে বনে

বিহ্বল করিয়াছিল নীলাম্বর রক্তিম চুম্বনে,

সে আজি নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে;

অনিমেষে

নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে

চাহি সেই দিগন্তের পানে

শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে। (২৫ সংখ্যক/এবার)

এবারের এই যৌবন শুধু ক্ষীণ মর্মরকল্লোলে, গানের মৃদু গুঞ্জনে রক্তবরন হৃদয়ের ব্যথার মতো কবিমানসে সঞ্চারিত হয়ে শেষ হয়ে গেল। দূর ভবিষ্যতে রূপবৃত প্রেমের মতো আবার তা জাগ্রত হয়ে উঠবে, সেই কামনায় এ-জনমের শেষ প্রহর-যাপন

এবারে ফাল্গুনের দিনে সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়

এই-যে আমার জীবনলতিকায়

ফুটল কেবল শিউরে-ওঠা নতুন পাতা যত

রক্তবরন হৃদয়ব্যথার মতো;

দখিন-হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে দিল কেবল দোল,

উঠল কেবল মর্মরকল্লোল।

এবার শুধু গানের মৃদু গুঞ্জনে

বেলা আমার ফুরিয়ে গেল কুঞ্জবনের প্রাঙ্গণে।

আবার যেদিন আসবে আমার রূপের আগুন ফাগুন-দিনের কাল

দখিন-হাওয়ায় উড়িয়ে রঙিন পাল,

সেবারে এই সিন্ধুতীরের বীথিকায়

যেন আমায় জীবনশতিকায়

ফোটে প্রেমের সোনার বরন ফুল;

হয় যেন আকূল

নবীন রবির আলোকটি তাই বনের প্রাঙ্গণে;

আনন্দ মোর জনম নিয়ে।

তালি দিয়ে তালি দিয়ে

নাচে যেন গানের গুঞ্জনে। (২৬ সংখ্যক/আবার)

কবিতাটিতে আরো একটি বিশিষ্টতা আছে। ৪১ সংখ্যক কবিতা যেন কবির পরবর্তীকালের পুনশ্চর ভূমিকা। পুনশ্চতে সহজ সরল সাধারণ বুক, লতা মানুষের

দিকে কবির যে সহজ সরল দৃষ্টি-প্রসারণ (কোপাই, খোয়াই প্রভৃতি কবিতা উল্লেখ্য) তারই পূর্বরূপ যেন এখানে। ৪১ সংখ্যক কবিতাটিতে এই বৈশিষ্ট্য আরো বেশি। ভবিষ্যতের এই আশা আর অতীতের স্মৃতিচারণে কবির এবারের যৌবন-উপলব্ধির পরিসমাপ্তি। বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত কবি এই কাব্যশেষে ভবিষ্যতের উক্ত আশার সঙ্গে যৌবনস্মৃতির দিকে শেষবারের মতো তার মানস-দৃষ্টি পাঠিয়ে দিলেন, বার্ধক্যের বাঁশিতে শেষবারের মতো করলেন যৌবনের সুরসঞ্চার, আজকের দেখা পৃথিবী-মানুষ-প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করলেন কত দূর অতীতের যৌবনস্পৃষ্ট জীবনালেখ্য-

তাই যা দেখি তারে ঘিরেছে নিবিড়

যাহা দেখিছ-না তারি ভিড় ;

তাই আজি দক্ষিণপবনে

ফাল্গুনের ফুলগন্ধে ভরিয়া উঠিছে বনে বনে।

ব্যাপ্ত ব্যাকুলতা,

বহু শত জনমের চোখে-চোখে কানে-কানে কথা।

(৪০ সংখ্যক চেয়ে দেখা)

২.৮ অনুশীলনী

১। বলাকার সৌন্দর্য তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। বলাকা কাব্যের গতিবাদ সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩। বলাকা কাব্য গ্রন্থে পাশ্চাত্য জীবন চেতনার প্রভাব আলোচনা করো।

৪। বলাকা কাব্যগ্রন্থের রাষ্ট্রচেতনা ও যুদ্ধ সংঘাতের অভিঘাত বর্ণনা করো।

৫। বলাকা কাব্যগ্রন্থের মানব চেতনা ও ঈশ্বর চেতনা সম্পর্কে আলোচনা করো।

৬। বলাকা কাব্যের প্রকৃতি চেতনা আলোচনা করো।

৭। বলাকা কাব্যের যৌবন বন্দনা সম্পর্কে আলোচনা করো।

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১. বলাকা -১৩৯৫-এর নূতন সংস্করণ, এবং তার গ্রন্থপরিচয়।

২. "পথের সঞ্চয়-রবীন্দ্রনাথ।

৩. কালান্তর'-রবীন্দ্রনাথ।

৪. রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ-২য় খণ্ড, ১৩৫৬ সংস্করণ, প্রমথনাথ বিশী

৫. বলাকা কাব্য পরিক্রমা'–৫ম সংস্করণ, ক্ষিতিমোহন সেন

৬. রবীন্দ্রনাথের বলাকা'-অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

৭. রবীন্দ্রজীবনকথা'-১৩৬৬, প্রভাত কুমার মুখপাধ্যায়

৮. রবীন্দ্রবন্দনা'-বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী

৯. 'কবিতা আধুনিকতা ও আধুনিক কবিতা'-বারীন্দ্র বসু

১০. স্বদেশ কথা ও পৃথিবীর ইতিহাস'-ড. কিরণ চৌধুরী

১১. 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান। (১৯৮৮)

১২. বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'-জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (সাহিত্য সংসদ)

১৩. বঙ্গীয় শব্দকোষ'-হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪. বারীন্দ্র বসুর "কবি ও কালান্তর"

একক ৩ বলাকা

বিন্যাসক্রম

৩.১ নামকরণ

৩.২ রবীন্দ্রকাব্যধারায় বলাকা

৩.৩ অনুশীলনী

৩.৪ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ নামকরণ

'বলাকা' শব্দের অর্থ উড্ডীয়মান বকের বা হংসের শ্রেণী। বকের দল যখন শ্রেণীবদ্ধ হয়ে উড়ে যায়, তখন আকাশের প্রেক্ষাপটে তাদের চলমানতা অপূর্ব সৌন্দর্যে বিস্তৃত হয়ে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। এই সৌন্দর্যময় গতিশীলতার বাণীই আলোচ্য কাব্যের বাণী। তাই কবি কাব্যের নামকরণ করেছেন বলাকা।

শব্দটি অপূর্ব ব্যঞ্জনাবহ। বলাকা শব্দটিতে বক পাখির চিত্র আভাসিও বটে, কিন্তু সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত হয়ে আকাশে উড্ডীয়মান বক-পঙক্তির প্রত্যেকটি পাখি। বিচ্ছিন্ন এক বটে, আবার তাদের প্রত্যেকটি সমগ্র শ্রেণীর এককও (unit) বটে। আর সেই শ্রেণীবদ্ধতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সামনের দিকে সেই পক্ষীসমূহের দীর্থগতির ইঙ্গিত। কোন্ 'বেগের আবেগে' তারা উড়ে চলেছে অনির্দেশ সামনের দিকে।

উড্ডীয়মান বলাকার মধ্য দিয়ে আরও একটি ইঙ্গিত আভাসিত। আমাদের বাস্তব দৃষ্টিতে বা কাল্পনিক চিত্রকল্পে আমরা বলাকাকে তার প্রেক্ষাপট,-আকাশ প্রাঙ্গণ থেকে বিচ্ছিন্ন কোরে দেখতে পারি না। বলাকার গতি আমাদের সীমিত দৃষ্টিতে অন্তহীন, অনির্দেশ বোলে মনে হয়, কিন্তু তা আকাশের চন্দ্রাতপতলেই বিস্তারিত। আকাশ-ছাড়িয়ে সে গতির পক্ষে অন্য কোথাও পক্ষসঞ্চারী হওয়া সম্ভব নয়, কারণ আকাশ

(continuum) সর্বব্যাপ্ত, সর্বত্র। উড্ডীয়মান বকশ্রেণীর চিত্রকে এই আকাশপট থেকে বিবিক্ত কোরে উপভোগ করা অসম্ভব। তাই বলাকার ব্যঞ্জনায় এই আকাশও সম্পৃক্ত।আর সব মিলিয়ে এই অর্থগত ব্যঞ্জনা ছাড়াও রয়েছে একটি আশ্চর্য সব না অতুলনীয় সৌন্দর্য প্রকাশক্ষম চিত্রকল্প। সন্ধ্যার ম্লান আলো, তো উড্ডীন বিহঅদল, শূন্তের প্রান্তরে তাদের ডানার শব্দের বিদ্যুৎ-লেখা-সব মিলিয়ে অনির্বচনীয় রস-অভিব্যক্তি।

বলাকা নামের মধ্য দিয়ে এই ত্রয়ী ইঙ্গিত-গতি, আকাশ-প্রেক্ষাপটে তার বিস্তার এবং সৌন্দর্যময়তা-আভাসিত। এই কাব্যগ্রন্থের সমস্ত কবিতাগুলির সামগ্রিক ব্যঞ্জনাও তাই। তাই নামকরণটি তাৎপর্যময়, যথাযথ এবং সার্থক।

আলোচ্য কাব্যের প্রত্যেকটি কবিতা বিচ্ছিন্নভাবে এক-একটি বিশিষ্ট বক্তব্যকে ধারণ কোরে আছে, পৃথক এক-একটি বিহগের মতোই তারা বৈশিষ্ট্যে এবং সৌন্দর্যে ভিন্ন। কোনো কবিতার মূল বক্তব্য নবীন-বরণ (১ সংখ্যক) কোনোটিতে বা মহা যুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর পূর্বাভাস (২সংখ্যক), কোনোটি বা ধারণ কোরে আছে ব্যক্তির বাইরে অব্যিক্ত জীবন-ক্রিয়ার কেন্দ্রীয় প্রেম-প্ররণা রূপ তত্বটিকে (৬ সংখ্যক), কোথাও বা তা সবমুক্ত ব্যক্তিসত্তার জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে মহাপ্রয়াণের ইঙ্গিতবহ (৭সংখ্যক), কোথাও বা বিশ্বজাগতিক গতির বন্দনা (৮ সংখ্যক) কোথাও না রায় প-মুক্তির এ বিপ্লবের আহ্বান বাণী (৩৭ সংখ্যক), কোনো কবিতায় মানুষের প্রতিনিধিরূপে কবির ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের অর্ঘ্য প্রদান, কোথাও বা ফেলে আশা যৌবনের স্মৃতিচারণ প্রভৃতি। কিন্তু বিচিত্র ও বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা আবার এমন একটি সামগ্রিক বক্তব্যকে ধারণ কোরে আছে, যার সঙ্গে তুলনা চলে বলাকা পঙক্তির উড়ে-চলার ব্যঞ্জনার। বলাকা পঙক্তির উড়ে চলার মধ্য দিয়ে গতির বাণী অভিব্যক্ত; এই কাব্যের কবিতাগুলিরও কেন্দ্রীয় বাণী তাই - গতি। তাই কবিতাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে যেন এক-একটি বিহঙ্গম এবং সামগ্রিকভাবে গতিচেতনার বাণী-ব্যক্তকারী চলমান বলাকা। এই তাৎপর্যবহ কাব্যনামটি তাই সার্থকতায় তুলনাহীন।

এই কাব্যের ৩৬ সংখ্যক কবিতাটির মধ্য দিয়ে এই সমষ্টিগত নামকরণের তথা সমগ্র কাব্যের মর্মভাবটি ব্যক্ত। কবিতাটির নামও বলাকা। একদা ঝিলমের ধারে, সন্ধ্যায়, অন্ধকার গিরিতটতলে স্তব্ধ দেওদারসারির উপর উড্ডীয়মান বলাকা চকিতে শূন্যের প্রান্তরে শব্দের বিদ্যুৎ ছটায় কবির মনে 'বেগের আবেগ' সৃষ্টি কোরে চোলে গিয়েছিলো। ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত তাদের পাখা স্তব্ধতার তপোভঙ্গ কোরে সৃষ্টির অভ্যন্তরস্থ 'অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ'কে ব্যক্ত করে তুলেছিলো। কবি অনুভব করেছিলেন সব আপাত-স্তব্ধতার অন্তরালে এক অস্থির বেগ-প্রেরণা। আভ্যন্তরীণ (Potential) গতির প্রেরণাতে আমাদের বিশ্বজগৎ, জৈবজগৎ, মনুষ্যজগৎ, মনুষসভ্যতা, ব্যক্তি মানুষ সব-কিছুই কেবলই বিবর্তিত, পরিবর্তিত হতে হতে চলেছে। এই গতি কেবল অন্তহীন নয়, পরিণামহীনও বটে। বলাকার পাখার শব্দের বিদ্যুৎছটার মধ্য দিয়ে কবি অনুভব করেছিলেন,

ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে

হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে!

আলোচ্য কবিতাটি কেমনভাবে সমগ্র কাব্যটির মর্মভাবটি ধারণ কোরে আছে, কবিতাটির আলোচনা-প্রসঙ্গে সে সম্বন্ধে কবি বলেছিলেন, 'সেদিন-যে একদল বুনন ইলের শাখা সঞ্চালিত হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারের স্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়েছিল, কেবল এই ব্যাপারই আমার কাছে একমাত্র উপলব্ধির বিষয় ছিল না। কিন্তু বলাকার পাখা যে নিখিলের বাণীকে জাগিয়ে দিয়েছিল, সেইটাই এর আসল বলবার কথা এবং 'বলাকা' বইটার কবিতাগুলির মধ্যে এই বাণীটিই নানা আকারে ব্যক্ত হয়েছে। আমার মধ্যে এই ভাবটা আছে যে, বুনোহাঁসের দল যখন নীড় বেঁধেছে, এ তার ছানা হয়েছে, সংসার পাতা হয়েছে-এমন সময়ে তারা কিসের আবেগে অভিভূত হয়ে পরিচিত বাসা ছেড়ে পথহীন সমুদ্রের উপর দিয়ে কোন সিন্ধু তীরে আর এক বাসার দিকে উড়ে চলেছে।সেদিন সন্ধ্যায় আকাশ পথের যাত্রী হংসবলাকা আমার মনে এই ভাব জাগিয়ে দিল-এই নদী, বন, পৃথিবী, বসুন্ধরার মানুষ, সকলে এক জায়গায় চলেছে। তাদের কোথা থেকে শুরু, কোথায় শেষ, তা আমি না। আকাশ তারার প্রবাহের মতে,

সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহের ছুটে চপার মতো, এই বিশ্ব কোন নক্ষত্রকে কেন্দ্র কোরে প্রতি মুহূর্তে কত মাইল বেগে ছুটে চলেছে। কেন তাদের এই দুটা ছুটি তা জানি না, কিন্তু ধাবমান নক্ষত্রের মতো তাদের একমাত্র এই বাণী -এখানে নয়, এখানে নয়।

উক্ত সঞ্চালিত-পাখা বুনো হাঁসের গতির বাণীই এই কাব্যের কবিতাগুপিরও সমষ্টিগত বাণী। তাই কাব্যের আলোচ্য নামকরণ। এই কাব্যের যে কবিতাগুলির মুখ্য উপজীব্য গতিচেতনা তারা হচ্ছে, ৮ সংখ্যক (চঞ্চলা), ৭ সংখ্যক (শাজাহান), ৩৬ সংখ্যক (বলাকা) এবং ৩৭ সংখ্যক (ঝড়ের খেয়া)। চঞ্চলায় বিশ্বজাগতিক গতির কথা, শাজাহানে ব্যক্তিতায় গতিময়তা। বলাকায় সর্বাত্মক গতি এবং ঝড়ের খেয়ায় সামাজিক ও রাষ্ট্রক বিপ্লবচেতনা। এদের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা গতিতত্ত্ব প্রসঙ্গে করেছি। এগুলি ছাড়াও রয়েছে নবীনবরণ ও যৌবন-চেতনার কবিতা ১, ২, ৩, ৪, ৪৪ ও ৪৫ সংখ্যক। এ-কবিতাগুলিও প্রকারান্তরে গতিতত্ত্বের পরিচয় বাহী। যৌবনের জয়গান প্রসণে সে আলোচনাও করা হয়েছে। পরোক্ষ গতি চেতনার পরিচয় রয়েছে মানবশ্রেষ্ঠত্ববিষয়ক কবিতাগুলিতে-১ সংখ্যক প্রেমের পরশ, ২৮ সংখ্যক (দেনা-পাওনা) এবং ২৯ সংখ্যক (তুমি-আমি) কবিতা। কবির কাছে মানবশ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম প্রধান কারণ, সে বিবর্তনের ফলতি, -বিবিবর্তন ও জৈববিবর্তনের আধুনিকতম পরিণতি, latest edition। এ বিষয়ের আলোচনা করেছি বলাকায় মানব চেতনায়। অতএব এখানেও সেই গতিরই কথা। দু-একটি কবিতা বাদ দিলে এই কাব্যের সকল কবিতার মর্মবাণী গণ্ডি। বলাকার মধ্য দিয়ে সেই ব্যঞ্জনায়ই অভিব্যক্তি। এই কাব্যে কবি প্রথমে অকারণ এবার গন্তব্যহীন গতি-চেতনার খুব কাছা কাছি এসেছিলেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক এবং দৃর্শনিক (ডারউইন ও বের্গসঁ) গতি-চেতনার সমধর্মী এই গতি চেতনা। চঞ্চলায় কবি বলেছিলে, ‘চলেছ যে নিরুদ্দেশে সেই চলা তোমার রাগিণী’ এবং বলাকা-য় ‘ হেথা নয় হোথা নয়, অন্য কথা,অন্য কোন্‌খানে' ।ঝিলমের ধারে যে বুনোহাঁসের দল কবিকে ‘গতির আবেগে উদ্বুদ্ধ করেছিলো, তাদের গমন প্লথের কোথায় বা সমাপ্তি, কোথায় বা তাদের গন্তব্য, তা কবির কাছে ধরা পড়েনি। এই হাঁসের দল কবির মনে এই ভাব জাগিয়েছিল, সব-কিছুর কোথা থেকে শুরু এবং কোথায় শেষ তার ঠিক নেই। অর্থাৎ গতি অনির্দেশ্য,

গন্তব্যহীন। এই তত্ত্বেরই পরিচয় বহন কোরে আছে উড্ডীয়মান বুনো হাঁসের দল এবং তাদেরই নামধৃত আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবি এই উদ্দেশ্যহীন গন্তব্যহীন গতির বাণীকে অতিক্রম করেছেন। কবি উপনিষদের ঋষির মতো উপলব্ধি করেছেন সকল গতিই একটি। স্থির শান্ত কল্যাণময় সত্যের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে ব্যাপ্ত। সত্যের এই প্রসারিত প্রাঙ্গণেই সকল গতির চলতা, সকল অভিব্যক্তির চঞ্চলত। ঝড়ের খেয়া কবিতায় কবির পরিণততর উপলব্ধি-শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।

আমরা 'বলাকা'র ব্যঞ্জনা-প্রসঙ্গে বলেছি, উড্ডীয়মান বলাকাকে আকাশের প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা যায় না। বলাকার সকল চলমানতা আকাশের বিস্তারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঠিক তেমনি এই বিশ্বস্ত সকল গতি, সকল অভিব্যক্তি একটি কল্যাণময় সত্যের প্রেক্ষাপটে বিধৃত। সত্যের, ‘একএবঅদ্বিতীয়মে’র, শিব চেতনার বিস্তৃত আকাশপটে বিশ্বজাগতিক সকল গতি নিজেকে বিচিত্রভাবে ও বিচিত্ররূপে অভিব্যক্ত করছে। ঈশোপনিষদের কবির যে উপলব্ধি-গতিশীল এই জগতের গতিময় সকল কিছু ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত, ‘ঈশাবামিদং সর্ব যৎ কি অগত্যাং জগৎ', রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি শেষ পর্যন্ত তারই সমধর্মী। বলাকার আকাশ প্রেক্ষাপটের ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে সেই ব্যঞ্জনাও ব্যক্ত। বলাকার আকাশ সেই সত্য, সেই ‘শিব’ সেই চিরন্তন একের’ প্রতীক। তাই সব মিলিয়ে বলাকার ব্যঞ্জনা গতি ও গতির স্থির প্রেক্ষাপটকে প্রকাশ করেছে। একই বৈশিষ্ট্যধৃত কবিতাগুলি তাই যে কাব্যগ্রন্থে গ্রথিত, তারও ঐ একই নামকরণ অপূর্ব তাৎপর্যবহ, যথাযথ ও সার্থক। কিন্তু উড়ে-চলা বুনোহাঁসের দল গতির তত্ত্বকেই ব্যক্ত করে না, অপূর্ব সৌন্দর্যকেও প্রকাশ করে। ঠিক তেমনি এই কাব্যের গতির বক্তব্যধত রচনাগুলি গতি-দর্শনকে অতিক্রম কোরে সৌন্দর্যধত কবিতা হয়ে উঠেছে। তত্ত্ব এখানে কাব্যিক সৌন্দর্যরূপে, আনন্দময় উপলব্ধিরূপে অভিব্যক্ত। এই কাব্যের কবিতাগুলি কাব্য-সৌন্দর্যবিবৃত, তা কাব্যসৌন্দর্য প্রসঙ্গে আলোচনা করে দেখিয়েছি। এই কাব্যে বিশিষ্ট ভাবটি যে কবিতাটিতে সব থেকে সংহত হয়ে প্রকাশিত, সেই ‘বলাকা' নামের কবিতাটির প্রেরণা পক্ষীদলের যে-

পক্ষসঞ্চালনের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছিল, সেই পক্ষসঞ্চালন পক্ষীদলের উড়ে চলার অপূর্ব সৌন্দর্যও কবির মনে মুদ্রিত করে দিয়েছিলো। তাদের পাখা-আন্দোলনে গতি-চেতনা শুধু তরূপেই উদ্ভাসিত হয়নি, পক্ষান্তরে 'ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত' সেই পক্ষসঞ্চালন রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে বিস্ময়ের জাগরণ' আকাশে তরঙ্গিত কোরে চলেছিল। তাতিরিক্ত এই আনন্দময়তা, সৌন্দর্যবিকাশ এবং বিস্ময়ের জাগরণ এই কাব্যধৃত কবিতাগুলিরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেবলমাত্র গতিতত্ত্বের আলোচনা ও ব্যাখ্যাই যদি কবির উদ্দেশ্য হতো, তাহলে তিনি দর্শনের গ্রন্থ রচনা করতেন, কাব্যগ্রন্থ কদাপি নয়। কিন্তু তিনি গতির সৌন্দর্যময়তাকে এবং সৌন্দর্যের গতিময়তাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। জীবনে জগতে সমাজে রাষ্ট্রে গতির রস-উপলব্ধিকে ধারণ কোরে আছে এই কাব্যের কবিতাগুলি। 'বলাকা' নামকরণটিতে তত্ত্বগত ব্যঞ্জনার সঙ্গে সেই সৌন্দর্যও অভি ব্যঞ্জিত। সেদিকে দিয়েও নামটি তুলনাহীন ইঙ্গিতগর্ত।

অতএব বকপঙক্তির বা বুনোহাঁসের আকাশ-প্রাঙ্গণে ওড়ার মধ্য দিয়ে যে গতি, গতির স্থির ধারণ-প্রেক্ষাপট এবং সৌন্দর্য অভিব্যক্ত, এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্য দিয়েও সেই ত্রয়ী বক্তব্য ব্যক্ত। আবার সেই ত্রয়ীবক্তব্যের ইঙ্গিত আভাসিত কাব্যের 'বলাকা' নামে। তাই নামটি তাৎপর্যময় সৌন্দর্যব্যঞ্জনাক্ষম, যথার্থ এবং সার্থক।

৩.২ রবীন্দ্র-কাব্য ধারায় বলাকা

বলাকা কাব্যের বক্তব্য এবং আঙ্গিকে অভিনবত্ব আছে। কারো মতে এই বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের কাব্য-চেতনায় নবাগত। কিন্তু সকলেই এই মত সমর্থন করেন না। অন্য কারো কারো মতে রবীন্দ্রনাথের বিবর্তনশীল কাব্যজীবনে যেমন প্রত্যেক স্তরেই পূর্ববর্তী স্তরের পরিণতি, তেমনি এটিও। হঠাৎ উড়ত-কোন ব্যাপার নয়, পূর্বতন পর্যায়েরই এটি ক্রমবিকশিত রূপ। আবার অন্য কেউ কেউ মনে করেছেন, এ. যদি তার পূর্বতন ধারার পরিণতি না হয়, তথাপি এই কাব্যের ভাৰবীজ পরে কাব্যধারার মধ্যেই বর্তমান ছিল।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-বিবর্তনের সাথে সাথে তার কাব্যধারার বিবর্তন চলে। রূপ থেকে রূপান্তরে গুঢ় ভাববীজের ক্রমঅভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে। অবশ্য তাই নব নব ভাব, চিন্তা, চেতনা, জীবন-উপলব্ধিকেও কবি আত্মসাৎ এবং কষ-প্রকা। করতে করতে এগিয়ে চলেছেন তার কাব্যজীবনপথে। তাই রূপ থেকে যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ভাব থেকে ভাবান্তরেও কবি গিয়েছেন, কিংবা বিপরীতনে। অবশ্য কয়েকটি স্থায়ীভাব ও ধ্রুব-চেতনা সকল অস্থায়ী ভাব ও চলমান কাজী প্রবাহের মধ্যে অচঞ্চল হয়ে মিশে ছিলো। কবির সেই ধ্রুব জীবন প্রত্যয়ের - বিকাশ হয়েছে, কিন্তু পরিবর্তন হয়নি।

ভাব এবং আঙ্গিকের ক্রমবিকাশ এবং অভিনবত্ব অনুসারে রবীন্দ্রকাব্য নেয় বিভিন্ন পর্যায়কে আমরা বিভিন্ন নামকরণ দ্বারা চিহ্নিত করেছি। সাধারণ ভাবে যেতে পারে প্রত্যেক স্তরের বৈশিষ্ট্য পূর্বতন স্তরের মধ্যেই আত্মগোপন করেছিল। এবং পূর্বতন ভাব-বৈশিষ্ট্যের অধিকতর পরিণতরূপ পরবর্তী স্তর। কিন্তু তা প্রত্যেক স্তরই তার আঙ্গিক এবং ভাববক্তব্য নিয়ে আবার স্বয়ং পূর্ণও ফুলের মধ্যেই যেমন ফলের আগমনী আভাসিত, অথচ বাইরের দৃষ্টিতে ফুল নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ, তেমনি রবীন্দ্রকাব্যজীবনের প্রত্যেক স্তর সম্পূর্ণ হয়েও পরবর্তী বৈশিষ্ট্যগত। কোনো বিশেষ পর্যায়ের অন্তরে পরবর্তী পর্যায়ের লক্ষণগুলি সংগুপ্ত থেকেছে।

বলাকা কাব্যের মূল ভাব গতিচেতনা। অন্য সকল ভাবগুলি ঐ মূল ভাবেরই রূপান্তর। এই কাব্যে কবি অনুভব করেছেন চলতাই এই বিশ্বের এবং বিশ্ব-স্থ সকল কিছুর ধর্ম। এই চলতার ফলে বিশ্বজগৎ, জৈবজগৎ, মনুষ্যসভ্যতা সকল কিছুই বিবর্তনশীল। চলতার অভাবই মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে, সমস্ত কিছুকে আবর্জনায় ভরে তোলে। সামগ্রিক মুক্তির জন্য এই গতিময়তার প্রয়োজন। কবির প্রস্তুতি পর্যায়ের ‘প্রভাত সঙ্গীত' কাব্যান্তর্গত ‘নির্ঝেরের স্বপ্নভঙ্গের’ মধ্যেই এর প্রথম পরিচয় পাচ্ছি বলাকা কাব্যের প্রায় ৩২ বৎসর আগে। কবির বয়স যখন মাত্র ২/২১ বৎসর। ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতায় কবির আকূতি

কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,

চারি দিকে তার বাঁধন কেন।

ভাঙ রে হৃদয়, ভাঙ, রে বাঁধন,

সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন,

লহরীর 'পরে লহরী তুলিয়া

আঘাতের 'পরে আঘাত কর।

প্রাপ্তি পর্যায়ের ‘সোনার তরী'তে জগৎ-প্রবাহের চিরগতিময়তার আরও ব্যক্ত রূপ। ‘শাজাহান’ কবিতায় সকল পার্থিব সম্পদের ও ব্যক্তিসত্তার যে বিষাদচিহ্নিত অচিরস্থায়িত্ব তাঁরই প্রাক পরিচয় বারণ কোরে আছে উক্ত কাব্য কবিতা

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে

সবচেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে

গভীর কন, “যেতে নাহি দিব। হায়,

যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।

চলিতেছে এমনি অনাদিকাল হতে।

প্রলয় সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে (যেতে নাহি দিব)

কিংবা,

কে আছে কোথায়, কে আসে কে যায়,

নিমেষে প্রকাশে, নিমেষে মিলায়,

বালুকার 'পরে কালের বেলায়

ছায়া-আলোকের খেলা!

জগতের যত রাজা-মহারাজ

কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ,

সকালে ফুটিছে সুখদুখলাজ,

টুটিছে সন্ধ্যাবেলা।

(পুরস্কার।)

কবির এই গতিচেতনা রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে বিপ্লবের রূপ ধারণ করেছিলো। তার বিশেষ পরিচয় রয়েছে বলাকার ‘ঝড়ের খেয়া’য়। সকল সুখ-আরাম বিসর্জন দিয়ে সবকিছু নিয়ে সেই বিপ্লবের গর্ভে আত্ম-বিসর্জনের জন্য কবি ডাক দিয়েছেন, -ঐ কবিতা প্রসঙ্গে আমরা তা উপলব্ধি করেছি। সেই উদাত্ত আহ্বানের পূর্ব পরিচয় উৎকীর্ণ খেয়া' কাব্যরচনার পূর্ববর্তী একটি কবিতা ‘সুপ্রভাতে'

রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি

এসেছে দুয়ার ভেদিয়া;

বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎবাণ।

স্বপ্নের জাল ছেদিয়া।

ভাবিতেছিলাম উঠি কিনা উঠি,

অন্ধ তামস গেছে কিনা ছুটি,

রুদ্ধ নয়ন মেলি কি না মেলি -

তন্দ্রাজড়িমা মাজিয়া।

এমন সময়ে, ঈশান, তোমার

বিষাণ উঠেছে বাজিয়া।

তোমার শ্মশানকিঙ্কর-দল

দীর্ঘ নিশায় ভুখারি,

শুষ্ক অধর লেহিয়া লেহিয়া

উঠিছে ফুকারি ফুকারি।

অতিথি তারা যে আমাদের ঘরে,

করিছে নৃত্য প্রাঙ্গণ-'পরে,

খোলো খোলো দ্বার ওগো গৃহস্থ,

থেকে না থেকো না লুকায়ে

যার যাহা আছে আনো বহি আনো।

সব দিতে হবে চুকায়ে!

ঘুমায়ো না আর কেহ রে।

হৃদপিণ্ড ছিন্ন করিয়া

ভাণ্ড ভরিয়া দেহে রে।

ওরে দীন প্রাণ, কী মোহের লাগি

রেখেছিস মিছে স্নেহ রে।

বলাকা কাব্যের গতিচেতনার ভিন্নতর ফলশ্রুতি তার নবীনবরণ ও যৌবন চেতনার কবিতাগুলিতে । সকল আপাত শান্তি এবং বিরত্ব থেকে মুক্তির জন্য করি আহবান করেছিলেন নবীনকে, বে-নবীনের আগমন সাবিত হবে মৃত্যু-দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে, যে নবীনকে বরণ করবার জন্য কষ্টকবিদ্ধ পদে রক্তাক্ত চরণে রে তাপদ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চলতে হবে। সেই নবীনের আবাহনী শুরু হয়েছে বলাকা রচনার অনেক আগেই। তারই পূর্ণব্যক্ত পদধ্বনি ‘কল্পনা’ কাব্যের ‘বর্ষশেষ’ কবিতায়।

কবির প্রাক-বলাকা কাব্য থেকে আরও অসংখ্য উদাহরণ উদ্ধৃত কোরে দেখানো যায় যে কবির গতিচেতনা এবং নবীনবরণ-যৌবনচেতনা প্রাপ্তি পর্যায় পর্যন্ত সুস্পষ্ট পরিচয় নিয়ে প্রসারিত। কবির মানবচেতনা সম্পর্কেও ঐ একই কথা সত্য। নানা ভাবে নানা ভঙ্গিতে নানা রূপে এবং উপলব্ধির বৈচিত্র্যে কখনও ব্যক্তি-মানুষ কখনও সমষ্টিবদ্ধ মানুষ গভীর সহানুভূতি, প্রীতি ও শ্রদ্ধায় তার কাব্যে প্রতিষ্ঠিত। গভীর ভাবে বিচার করতে গেলে তার প্রত্যেক কবিতার মর্মবাণীই হচ্ছে মানব প্রত্যয়।

সংশয় পর্বের পরই ‘গতি’ পর্বের আগমন তাই তাদের কাছে কেমন যেন বিস্ময়কর মনে হয়েছে । সেইজন্যই হঠাৎ বলাকা কাব্যথানি অনেকের কাছে অভিনব লাগে। মনে হয় এ যেন নবাগত, আগে বুঝি এই কাব্যের ভাবচেতনার কোনো প্রস্তুতি ছিল না। শুয়ে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর মতে, এ-সময় কবি প্রতিভার বনবাস। তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ উপাদান মানবের সঙ্গে একাত্মবোধ! তা এ সময় বাধাগ্রস্ত ও অবলুপ্ত। এ-সময় কবি বিশ্রাম-প্রত্যাশী, অবকাশের অন্ত আকাঙ্ক্ষিত। বলাকার চেতনার সঙ্গে এই পর্যায়ের চেতনা সম্পূর্ণ বিপরীত। এটিই অধ্যাপক বিশ ও অন্যান্য অনেক সমালোচকের রায়।

আর গীতি-সংকলনত্রয়ীতে মানব জীবন-পাণ আগ কোরে ঐশ্বরিক প্রয়ের আশ্রমে প্রত্যাবর্তন। সুতরাং অন্তত এই অব্যবহিত পূর্ববর্তী পর্যায়টির ক্ষেত্রে বল। যায়, এটি কবির পরবর্তী মহীরুহের বীজ বা বীজের দ্যোতনা ধারণ কোরে নেই। আমরা পূর্বে যে বলেছি কবির কাব্যজীবনের যে-কোনো পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায়েরই বিবর্তিত রূপ, উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে যে এক্ষেত্রে তা খাটে না এই পর্যায়টি যেন রবীন্দ্র-কাব্যজীবনের সাধারণ নিয়মের একটি ব্যতিক্রম।

পরীক্ষা করতে গেলেই দেখা যাবে এই পর্যায়ে সংশয়, প্রদোষের আলো-আঁধারি, মনুষ্যবিবিক্ত ঈশ্বর-চেতনা, গতিবিরোধী অবকাশ-আকাক্ষা আছে বটে, কিন্তু তাকে অতিক্রম করবার ইচ্ছা, গতির ব্যঞ্জনা, মানবচেতনামিলিত ঐশ্বরিক চেতনা এবং নতুন কোরে কর্মের জগতে প্রয়াণ-আকাঙ্ক্ষাও কম তীব্রতার সঙ্গে প্রকাশিত নয়। নিজেদের একটি পূর্বনির্ধারিত মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অনেক সমালোচক এই পর্যায়ের কাব্যের এই দিকটি উপেক্ষা করেছেন। বলাকা-কাব্যর মর্মবাণীর কিছু কবিতার উদাহরণ দেওয়া যাক।

গতি ও নবীনের আগমনী-বিবৃত কবিতার উদাহরণ

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে,

ঝড় এল রে আজ

মন্তব্য

মেঘের ডাকে ডাক মিলিয়ে।

বাজ রে মৃদঙ্গ বাজ ।

আজকে তোরা কী গাবি গান

কোন রাগিণীর সুরে

কালো আকাশ নীল ছায়াতে

দিল যে বুক পূরে!

(ঝড় / খেয়া)

অথবা,

নিশ্বাস রুধে দু চক্ষু মুদে

তাপসের মতো যেন

স্তব্ধ ছিলি যে ওর বনভূমি,

চঞ্চল হলি কেন।

হঠাৎ কেন রে দুলে ওঠে শাখা,

যাবে না ধরায় আর ধরে রাখা,

ঝটপট করে হানে যেন পাখা

খাঁচায় বনের পাখি।

ওরে আমলকী ওরে কদম্ব,

কে তোদের গেল ডাকি।

ঐ যে ঈশানে উড়েছে নিশান

বেজেছে বিষাণ বেগে

আমার বরষা কালো বরষা যে

ছুটে আসে কালো মেঘে। (চাঞ্চল্য/ খেয়া)

তাই বলাকা রবীন্দ্র কাব্য ধারায় হঠাৎ নবাগত নয়, পূর্বতন ধারারই ব্যক্ততর ফলশ্রুতি।

বলাকা শুধু পূর্বতন ধারার পরিণতি মাত্র নয়, পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ ভাব চেতনার বীজরূপ এবং সংযোগ-সূত্রও বটে। গতি-পর্যায়ে আর যে কাব্য-গ্রন্থগুলির নাম আর করতে পারি, তারা যথাক্রমে ‘পলাতকা', 'শিশু ভোলানাথ', 'পূরবী', ‘মহুয়া, ‘বনবাণী’ ও ‘পরিশেষ। এদের সবগুলির মধ্যেই ঐ একই গতি ও মানবচেতনায় বাণী অনুস্থত, কোথাও তরূপে, কোথাও ব্যাখ্যারূপে, কোথাও উপলকিরুপে, কোথাও বা উদাহরণরূপে। পলাতকা’য় গতিচেতনা উদাহরণরূপে প্রকাশিত।

একদা এক বিকাল বেলায়

আমলকী বন অধীর যখন ঝিকিমিকি আলোর খেলায়,

তপ্ত হাওয়া ব্যথিয়ে ওঠে আমের বোলের বাসে,

মাঠের পর মাঠ হয়ে পার ছুটল হরিণ নিরুদ্দেশের আশে।

সম্মুখে তার জীবন মরণ সকল একাকার।

অজানিতের ভয় কিছু নেই আর।

রক্তে তাহার কেমন এলোমেলো

কিসের খবর এল।

বুকে যে তার বাজল বাঁশি বহুযুগের ফাগুন দিনের সুরে

কোথায় অনেক দূরে

রয়েছে তার আপন চেয়ে আরও আপনজন।

তারই অন্বেষণ।

জন্ম হতে আছে যেন মর্মে তারি লেগে,

আছে যেন ছুটে চলার বেগে,

আছে যেন চল-চপল চোখের কোণে জেগে। (পলাতকা/পলাতকা)

প্রতি পলাতক মুহূর্তের এক দীর্ঘ প্রবাহ পলাতকাকাব্য। তাছাড়া পলাতকার কবিতা-আকারের ছোট গল্পগুলি (মুক্তি, ফাঁকি, নিষ্কৃতি প্রভৃতি) কবির মানবপ্রীতির হীরকদীপ্ত উদাহরণ ধারণ করে আছে।

পরবর্তী কাব্য ‘শিশু ভোলানাথে’ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকে রক্ষা করবার ও মুক্তি দেওয়ার ব্যঞ্জনা এলাকার চঞ্চলা' কবিতাকে স্মরণ করায়। প্রথম কবিতাতেই (তার ও নাম ‘শিশু ভোলানাথ’) তার পরিচয়

ওরে মোর শিশু ভোলানাথ

তুলি দুই হাত

যেখানে করিস পদপাত

বিষম তাণ্ডবে তোর লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় সব।

আপন বিভব।

আপনি করিস নষ্ট হেলাভরে ;

প্রলয়ের ঘূর্ণচক্র-'পরে

চূর্ণ খেলেনার ধূলি ওড়ে দিকে দিকে

আপন সৃষ্টিকে

ধ্বংস হতে ধ্বংস মাঝে মুক্তি দিস অনর্গল,

খেলারে করিস রক্ষা ছিন্ন করি খেলেনা শৃঙ্খল।

বলাকা কাব্যের ৩৬ সংখ্যক কবিতায় (বলাকা) বুনো হাঁসের দল যে 'বেগের আবেগ' সৃষ্টি করেছিলো, তারই সম্প্রসারিত রূপ পরবর্তী কাব্য 'পুরবী'র 'ঝড়' কবিতায় -

তোরা বলেছিলি তাকে

বাধিয়াছি ঘর।

মিলেছে পাখির ডাকে

তরুর মর্মর।

পেয়েছি তৃষ্ণার জল,

ফলেছে যার ফল,

ভাণ্ডারে হয়েছে ভরা লক্ষ্মীর সঞ্চয়।

বড়, বিদ্যুতের ছন্দে

ডেকে ওঠে মেঘমন্দ্রে।

নয়, নয়, নয়।

বলে ঝড় অবিশ্রান্ত,

'তুমি পান্থ, আমি পান্থ

জয়, জয়, জয়।

'পরিশেষে' কবিতাটি 'ঈশোপনিষদের' প্রথম শ্লোক এবং 'সোনার তরী'র 'যেতে নাহি দিব'কে স্মরণ করায়। বলাকার 'ঝড়ের খেয়া' কবিতার শেষে বা 'ছবি' কবিতায় গতির কেন্দ্রে যে স্থিরপ্রত্যয়ের কথা আছে, যে একে'র প্রেক্ষাপটে সকল গতি সম্প্রসারের কথা আছে, এই এক', সেই কেন্দ্রীয় অপরিবর্তনীয় সত্য-ভূমির ইঙ্গিতও এই সকল কাব্যগ্রন্থেও আছে। 'পূরবী'র 'সাবিত্রী' কবিতা, 'পরিশেষে'র 'প্রণাম' বা 'বনবাণী'র পূর্বোল্লিখিত 'বৃক্ষবন্দনা' সেই পরিচয়বাহী। অতএব এখন এ-সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে

বলাকা কাব্য কবির পূর্বের কাব্যধারার পরিণতি এবং পরবর্তী কাব্যধারার প্রেরণা। কিংবা বলা যায় পূর্বাপর কাব্যধারার গতিচেতনার ও বিবর্তনধারার এটি একটি সংযোগসুত্র (connecting link) বা ক্রমবিকাশ সরণিরই একটি পর্যায়। এটি কোনো হঠাৎ-প্রক্ষিপ্ত নবাগত-ভাববাহী বিচ্ছিন্ন কাব্য খণ্ড নয়।

গতি ও মানবচেতনা প্রভৃতি ছাড়াও বলাকা কাব্যের অন্যান্য আরও কিছু কিছু য্যের পূর্বতন উপস্থাপনা যে কবির পূর্ববর্তী কাব্যে আছে তার একটি উদাহরণ করছি। কবির বলাকা কাব্যের ২৩ সংখ্যক কবিতায় (দুই নারী) কবির দুই নারী তত্ত্বের ব্যাখ্যা।

অতএব বলা যেতে পারে বলাকা অপরিচিত পথিক নয়। হয়তো তার বাইরের পোশাকের পরিবর্তন হয়েছে। নূতন রূপে সে এবার আসর অমিয়েছে। কিন্তু ভিতরের মর্ম এক কিন্তু তবুও একটু চিন্তার অবকাশ আছে। এলাকার ভাব-ভাবনা পুরাতনেরই পরিণতি এবং পরবর্তীর উৎস বটে, কিন্তু তার কি কোনোই অভিনবত্ব নেই? আছে। ফল যেমন ফুলেরই পরিণতি কিন্তু ফুণ নয়, আবার ফল যেমন বীজের জন্মদাতা বটে, কিন্তু বীজ নয়, ফুল এবং বীজের থেকে ফল পৃথক, অনন্য এবং আপন বিশিষ্টতায় পরিচ্ছিন্ন, তেমনি বলাকা কাব্যও। সে পূর্বের পরিণতি এবং পরবর্তীর উৎস বটে, রবীন্দ্রকাব্যধারায় সে পূর্বপরিচয়ের চিহ্নধারী পথিক বটে, তবুও সে আপন বৈশিষ্ট্যে অনন্য এবং অভিনব। সেই বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করলে বলতে হয় রবীন্দ্রকাব্য বংশলতিকায় সে নবজাতক, যদিও পিতৃপুরুষের পরিচয়-বঞ্চিত নয়। এতক্ষণ পূর্ব-পরের সঙ্গে কোথায় পে এক তা আলোচনা করেছি, এখন কোথায় সে অনন্য ও অভিনব তা দেখানোর চেষ্টা করছি।

এতদিন পর্যন্ত কবির যে, কাব্যসংস্কার তা মুখ্যত আবেগচালিত, ভাবাত্মক। জন্মসূত্রে লব্ধ অনুভূতি এবং পরিবেশ থেকে স্বতঃ-সঞ্চারিত আকৃতিগুলি এতদিন পর্যন্ত তার কবিমানসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং তার ফলে তার কবিতাগুলি প্রধানত আবেগের মধ্য দিয়ে উৎসারিত, বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত নয়। কিন্তু বলাকা রচনার কালে এই বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন। বলাকায় কবির বক্তব্যগুলি বুদ্ধিদীপ্ত, মুখ্যত তার জ্ঞানের সামগ্রী,

যদিও কবির অপরিসীম ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত তাকে ভাবাত্মক অং স্কৃতিতে প্রতিষ্ঠা দিতে সমর্থ হয়েছে।

এই কাব্য কবির মুখ্য বক্তব্য, দুটি,-গতিচেতনা এবং মানবচেতনা। এর আগেও কবির কাব্য এই দুই চেতনার প্রকাশ হয়েছে, আমরা দেখেছি। কিন্তু সেই কবিতাগুলি কবির স্বাভাবিক ভাবাত্মক অনুভূতিকে ধরে রেখেছে। চলমান জীবনের ছবি এবং মানুষের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক ও জন্মগত ভালোবাসা ও সহানুভূতিই সেই কবিতাগুলিকে জন্ম দিয়েছিলো। কিন্তু বলাকার গতিচেতনা ও মান চেতনাটি তেমন অবচেতন-গ্রহণের ব্যাপার মাত্র নয়। এর বক্তব্যগুলি সমকালীন বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক ও রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও বাস্তব অবস্থা দ্বারা পরীক্ষিত এবং তারই বুদ্ধিদীপ্ত বিজ্ঞাননিষ্ঠ প্রকাশ। তাই কবিতাগুলির আবেদন যত emotional তার থেকে অনেক বেশি intellectual।

এই কাব্যের গতিচেতনার পশ্চাতে কবির অনুভূতিনির্ভর গতিচেতনা অপেক্ষা সালে বিজ্ঞান জগতে উপলীকৃত গতিচেতনাই প্রধান। আগেই বৈনিক ডারউইনের জৈব-বিবর্তনবাদের কথা বলেছি। তার সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানে ও জোতিবিজ্ঞানে উপলব্ধীকৃত গতিচিন্তাও এই সময়ে বিশেষ ভাবে চিন্তাশীল সমাজকে নাড়া দিচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ কবি বটে, কিন্তু সমকালীন বিজ্ঞান-দর্শনের সঙ্গে তার সচেতন পরিচয় যথেষ্ট গভীর। আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ (Religion of Man দ্রষ্টব্য) আমরা ভুলতে পারি না। 'বিশ্বপরিচয়' বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আশ্চর্য গ্রন্থখানি তাঁরই রচনা। এই বৈজ্ঞানিক চেতনাই এই কাব্যের গতিচেতনার মূলে, আবেগ-উদ্বেলিত কোনো কবিভাব তার উৎস নয়। কবির প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তব্য ও উদাহরণগুলি বিজ্ঞানের এক-একটি সিদ্ধান্তেরই কাব্যিক রূপায়ণ। যেমন চঞ্চলা (৮ সংখ্যক) কবিতার প্রথম স্তবকের একটি পঙক্তি বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে / পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা ওঠে জেগে। এটি জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞানের নক্ষত্র-গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টি সম্পর্কে যে 'Nebular Hypo thesis' আছে তারই ইঙ্গিতবহ। বিশ্বে আপন আপন বৃত্তপথে নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ যে অনাদি কাল থেকে পরিভ্রমণশীল এই বৈজ্ঞানিক বক্তব্যের পরিচয় চলার নিম্নের পঙক্তি কয়টিতে-

ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে।

স্তরে স্তরে।

সূর্যচন্দ্রতারা যত।

বুদবুদের মতো।'

সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর যে বার্ষিক গতি, তার ফলেই হয় ঋতু পরিবর্তন এবং ঋতু পরিবর্তনের ফলেই পৃথিবীর উদ্ভিদ জগতে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিজ্জ, পুষ্প প্রভৃতি প্রকাশিত হতে থাকে। এই ভৌগোলিক, জ্যোতির্বিজ্ঞানিক এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানিক বক্তব্য প্রকাশিত নিম্নের কাব্যাংশে, যখন কবি চঞ্চলাকে বলেন, তোমার নিরুদ্দেশ চলার গতিতে

বারংবার ঝরে ঝরে পড়ে ফুল

দুই পা বকুল পারুল

পথে পথে

তোমার ঋতুর খালি হতে।

আলোচ্য কাব্যের মূলভিত্তি যেমন উক্ত বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি তেমনি সমকালীন সামাজিক-রাষ্ট্রক বিশ্বপরিস্থিতিও বটে। এই কাব্যে মানব-চেতন। কেবলমাত্র কবির অবচেতন মানবপ্রীতি নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক রাষ্টিক কারণের সংমিশ্রণ ও এই চেতনার মূলে। মানব-চেতনা প্রসঙ্গে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আমরা করেছি। জৈববিবর্তনের পথে প্রাণের উদ্ভব বিশ্বকে মহাজড়ত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এবং বিবর্তনের পথ ধোরে সেই প্রাণের মানব সত্তায় পরিণতি বিশ্বস্থ কেন্দ্রীয় চেতনশক্তির ক্রিয়ায় এই দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি এই কাব্যের মানব চেতনায় । ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে Hibbert Lectures – The Religion of Man-*এ* অপূর্ব কাব্যিক ইংরেজি গদ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যনির্ভর তার মৌলিক দার্শনিক বক্তব্যের যে পরিচয় ও ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন, তারই পূর্ব সূচনা বলাকা কাব্যের কবিতায়। Religion of Man-এ কবি বলেছিলেন

Light, as the radiant energy of creation, started the ring dance of atoms in a diminutive sky, and also the dance of the stars in the vast, lonely theatre of time and space. The planets came out of their bath of fire and basked in the sun for ages. They were the thrones of the gigantic Inert, dumb and desolate, which know not the meaning of its own blind destiny and majestically frowned upon a future when its monarchy would _ be menaced.

অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষে কবিতাগুলি রচনার উৎস মুখ্যত এই বিজ্ঞান-ইতিহাস সমাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি পরিশীলিত একটি বিদ সচেতন ব্যক্তিমন, আবেগ-আকুলিত ভাবুকমন নয়। এই কাব্যের বক্তব্যগুলি জ্ঞান জগতের যত, ভাবজগতের তত নয়। এখানেই এর অভিনবত্ব এবং পূর্ববর্তী ধারায় সঙ্গে পার্থক্য। কেন্দ্রীয় বক্তব্য একই, কিন্তু উপলব্ধির পার্থক্যে এবং প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্যে কবিতাগুলি নব পরিচয় নিয়ে এসেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য-ধারায় ঠিক এমন বুদ্ধির কাছে আবেদনসমন্বিত সচেতন intellectual বৈশিষ্ট্যপ্রধান কাব্য আগে পাওয়া যায়নি।

এই বৈশিষ্ট্যের জন্য কবির পূর্বের দ্রুতিকাব্যের স্থলে এখানে আমরা পেলাৰ দীপ্তিকাব্য। এ আমাদের রসের দ্রাবণে গলিয়ে দেয় বটে, কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি আমাদের নব বোধে উদ্দীপ্ত করে, আমাদের কাছে বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাসের বাস্তব বুদ্ধি-পরীক্ষিত সত্যকে (কেবলমাত্র পরা সত্যকে নয়) উন্মোচিত করে। . এর subjective আবেদনকে অস্বীকার করা যায় না বটে, কিন্তু এর প্রধান আবেদন objective, নৈর্ব্যক্তিক তা-দর্শন। যেখানে কবি 'আমি' বলে নিরে কথা বলেছেন, সেকথাও ব্যক্তি-কবির কথা নয়, মানুষের প্রতিনিধি বা মনু সমাজের unit-রূপে রবীন্দ্রনাথ নামক একজনের কথা। এই দীপ্তি-বৈশিষ্ট্য পূর্বতন কাব্য-বিবর্তন ধারার ক্ষেত্রে একটি Mutation (হঠাৎ নববৈশিষ্ট্য-সমন্বিত গুণগত পরিবর্তনধারী অভিব্যক্তি)-এর মতো বলাকাকে অভিনবত্ব দিয়েছে।

৩.৩ অনুশীলনী

১। বলাকা কাব্যগ্রন্থের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।

২। রবীন্দ্র কাব্যধারায় বলাকার স্থান নির্ণয় করো।

৩.৪ গ্রন্থপঞ্জী

১. বলাকা -১৩৯৫-এর নূতন সংস্করণ, এবং তার গ্রন্থপরিচয়।

২. "পথের সঞ্চয়-রবীন্দ্রনাথ।

৩. কালান্তর'-রবীন্দ্রনাথ।

৪. রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ-২য় খণ্ড, ১৩৫৬ সংস্করণ, প্রমথনাথ বিশী

৫. বলাকা কাব্য পরিক্রমা'–৫ম সংস্করণ, ক্ষিতিমোহন সেন

৬. রবীন্দ্রনাথের বলাকা'-অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

৭. রবীন্দ্রজীবনকথা'-১৩৬৬, প্রভাত কুমার মুখপাধ্যায়

৮. রবীন্দ্রবন্দনা'-বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী

৯. 'কবিতা আধুনিকতা ও আধুনিক কবিতা'-বারীন্দ্র বসু

১০. স্বদেশ কথা ও পৃথিবীর ইতিহাস'-ড. কিরণ চৌধুরী

১১. 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান। (১৯৮৮)

১২. বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'-জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (সাহিত্য সংসদ)

১৩. বঙ্গীয় শব্দকোষ'-হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪. বারীন্দ্র বসুর "কবি ও কালান্তর"

একক ৪ কবিতাপাঠ

বিন্যাসক্রম

৪.১ আলোর ভোরের কবিতা

ক। সবুজের অভিযান

খ। সর্বনেশে

গ। আহ্বান

ঘ। শঙ্খ

৪.২ মৃত্যুর গর্জনের কবিতা

ক। পাড়ি

খ। ঝড়ের খেয়া

গ। যৌবন

ঘ। নববর্ষের আশীর্বাদ

৪.৩ অন্য কোনখানের কবিতা

ক। চঞ্চলা

খ। বলাকা

৪.৪ গতির কবিতা

ক। আমার গান

খ। যাত্রা

গ। যাত্রা গান

ঘ। অজানা

ঙ। পথের প্রেম

৪.৫ অনুশীলনী

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ আলোর ভোরের কবিতা

ক। সবুজের অভিযান

কবির বলাকা কাব্যস্থ যে-সমস্ত কবিতা সরাসরি পাশ্চাত্য জীবনের বিপুল সংঘাতের দ্যোতনা অন্তরগর্ভে ধারণ কোরে আছে তাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য সবুজের অডিয়ান (১ সংখ্যক), সর্বনেশে (২ সংখ্যক), আহ্বান (৩ সংখ্যক), শঙ্খ (৪ সংখ্যক), ঝড়ের খেয়া (৩৭), যৌবন (৪৪), এবং নববর্ষের আশীর্বাদ (৪৫)। ঝড়ের খেয়া কবিতায় শুধু পাশ্চাত্য জীবনের যুগগত সংঘাতটুকুই নয়, প্রথম মহাযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অভিঘাতও সোজাসুজি এসে পড়েছে। আবার এই ঝড়ের ঘোর প্রাথমিক ভূমিকা রয়েছে পাড়ি (৫ সংখ্যক) কবিতায় এবং ঝড়ের খেয়ার উপসংহার,বলাকা কাব্যের শেষ কবিতা নববর্ষের আশীর্বাদ-এ (৪৫ সংখ্যক)। শেষের তিনটি কবিতা আমরা আলাদা ভাবে আলোচনা করব। প্রথমে প্রথম চারটি কবিতা আলোচনা করছি। এইসব কবিতা লিখবার আগে থেকেই পাশ্চাত্য জীবনের অপরিসীম কর্মোদ্যোগ ও উন্মাদনা কবির চিত্তকে প্রবল ভাবে আলোড়িত করেছিলো। পাশ্চত্যের সঙ্গে। তুলনায় আমাদের দেশের নিস্তেজ উদ্যোগহীন গণ্ডিবদ্ধ জীবন তার বিশেষ ক্ষোভ ও দুঃখের কারণ হয়েছিলো। সবুজের অভিযান লিখবার সমসময় কালে কবি/সবুজ পত্রে বিবেচনা ও অবিবেচনা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি যেন, সবুজের অভিযান-এর গদ্য-তরজমা এবং ভাস্য।

ঐ-প্রবন্ধের বক্তব্য থেকে আমরা সমকালে আমাদের দেশমানসের চেহারটি স্পষ্ট কোরে ধরতে পারি। পাশ্চাত্য জীবনের তরঙ্গ-সঙ্কুল তীব্র-প্রবাহিত নদীর সঙ্গে তুলনায় আমাদের দেশের মুমূর্ষু তরঙ্গহীন স্তিমিত-প্রবাহ জীবনধারার পার্থক্যটি অনুভূত হয়। কবি ঐ প্রবন্ধে বলেছেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে আমাদের মধ্যে যে

জোয়ারের বেগ এনেছিলো, কালক্রমে তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। আমরা আমাদের প্রাচীন লোকাচার ও প্রথাবদ্ধতায় আমাদের চলমান জীবনকে শৈবাল ও পঙ্কিলতার বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত করেছি। এর কারণ আমাদের অলস কর্মহীন জীবন। কর্মব্যস্ত জীবন পরিবেশের সকল সঙ্কীর্ণ বাবাকে, তা যত সনাতনই হোক-না কেন, তাচ্ছিল্য কোরে এগিয়ে যায়। অলস জীবন সেই সকল লোকাচারকে নিয়ে তত্ত্ব আর কাব্য রচনা করে। পাশ্চাত্য দেশ কর্মপ্রবাহের প্রবল স্রোতে সকল সনাতন বিধিনিষেধের গণ্ডি ভাসিয়ে দিয়েছে। আর আমরা আমাদের সনাতনত্বের গান কোরে প্রতিদিন নিজের চারিপাশে কঠিন শলাকা নির্মিত খাঁচা তৈরি করছি ।

কৌতূহল এবং পরীক্ষা জীবনের ধর্ম। নিষেধ এবং অগিদের দুই প্রেরণাই তার মধ্যে বর্তমান। কিন্তু তাগিদের প্রেরণা যেখানে কম এবং নিষেধের প্রেরণা যেখানে বেশি, সেখানেই মৃত্যুবীজের সংক্রামণ, এবং দ্রুত বৃদ্ধি। গতিই জীবন, এবং স্থাবরত্বই মৃত্যু। আমাদের দেশ সেই স্থাবরত্বকেই সনাতন প্রাচীন বলে গ্রহণ করেছে। পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাক্ষার দুঃসাহস। সেই দুঃসাহস বহন কোরে চলে যারা (আলোচ্য কবিতার নবীন, সবুজ, দুরন্ত, কঁচা, চির যুবা) তারাই আপাত প্রতীয়মানতার বাধা অতিক্রম কোরে জীবনকে ক্রমবিকাশের পথে অনুপ্রাণিত করে। দুঃসাহসের মধ্যে একটা প্রবল অবিবেচনা আছে। বই মৃত্যুবরণ কোরেই জীবন করায়ত্ত হয়। যারা লক্ষ্মীকে দুর্গমের অন্তঃপুর থেকে হরণ কৌরে আনে তাদের দুঃসাহসের অন্ত নেই। প্রাণের চাঞ্চল্যে সমস্ত পরিবেশকে এরা কেবলই আঘাত করে, দুঃখ দেয়, দুঃখ পায়, মানুষকে অস্থির কোরে তোলে, মরবার বেলায় এরাই মোরে বাঁচার পথ আবিষ্কার করে।

সবুজের আহ্বান কবিতায়, উপরি-উক্ত অবিবেচক লক্ষ্মীছাড়া দুঃসাহসীদের শাবান করেছেন কবি, সনাতনত্বের পুরাতন জগদ্দল প্রথাবদ্ধতার পাথর সরিয়ে দিয়ে, নবযুগের আলোকদীপ্ত চেতনায় জীবনকে সার্থক কোরে তুলতে। যারা এখনও পুরাতন লোকাচারের খুলে ৰন্দী এবং নিজেদের এই বন্দিত্ব সমর্থনের জন্য নানা কূট তর্কের

জাল বোনে তাদের তর্ককে তুচ্ছ কোরে নিজের অন্তর তাগিদে প্রাণকে স্পন্দিত কোরে তুলবার জন্য ঐ সব নবীন ও জীবন্ত-চেতনাশ্রিতদের কাছে কবির তাগিদ –

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,

ওরে সবুজ ওরে অবুঝ

আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে

আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,

সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে

পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।

আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা। (১ম স্তবক)

পাখি দীর্ঘদিন খাঁচায় বন্দী থাকলে, বাইরের মুক্ত আকাশের জন্য তার আকৃতি আর থাকে না। সে তখন খাচার আশ্রয়কে নিরাপদ জেনে সেই আশ্রয়েই চিরকাল অটল হয়ে থাকতে চায়। আমাদের দেশের বিভিন্ন সঙ্কীর্ণ লোকাচার ও প্রথাবদ্ধতায় বন্দী থেকে আমাদের তথাকথিত প্রবীণেরা তাকেই শান্তির নীড় বোলে মেনে নিয়েছেন। বাইরের জগতে কী বিপুল জীবন-সমারহ, জীবনের কী বিচিত্র বিকাশ, সে দিকে তাদের লক্ষ্যই নেই। তারা রুদ্ধ-চক্ষু, রুদ্ধ-কর্ণ, আফিং-এ নেশাগ্রস্তের মতো আধ-তন্দ্রাচ্ছন্ন। তাদের দেখলে জীবন্ত প্রাণ-স্পন্দিত জীব বলে মনে হয় না; মনে হয় যেন ছবিতে আঁকা প্রাণ, অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ কালে সনাতনশলাকানির্মিত পিঞ্জরে বদ্ধ। অনড়, জড়, এদের ধ্যান-ধারণা, বাইরে জীবনের প্রকাশকে তুলে ধরবার জন্য দুঃসাহসী, বিবেচনাহীন, টগবগে (boiling) নবজীবনের কাছে কবির আহ্বান প্রেরণ। দ্বিতীয় স্তবকের এটাই তাৎপর্য।

য়ুরোপের ও আমেরিকার একদিকে সর্বাঙ্গীণ মানসমুক্তির সাধনা, তার পর কত আয়োজন, কত প্রচেষ্টা, কতো গবেষণা, আর একদিকে সঙ্কীর্ণ দেশ সীমাবদ্ধ জাতীয়তাবোধ সঞ্জাত সম্প্রসারণ- জন্য কত মারণাস্ত্র সৃষ্টি, যুদ্ধ প্রস্তুতি এই দুই

একত্রিত হয়ে পাশ্চাত্যের দেশে দেশে বিপুল বিস্ফোরণ সব সৃষ্টি করেছিল। তখন ভারতবর্ষে আমরা নানা শাস্ত্রগত বাঁশি বোলের আমাদের অচলতা ও নিঃস্পৃহের মহত্ত্ব অনুধাবনের চেষ্টায় রত ছিল।

বাহির-পানে তাকায় না যে কেউ –

দেখে না যে বান ডেকেছে,

জোয়ার-লে উঠছে প্রবল ঢেউ।

কিন্তু আমরা নিস্পৃহ থাকলেই যে পাশ্চাত্যের ঐ অভিঘাত থেকে আত্মরক্ষা প্রতে পারব এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। রাষ্ট্রনীতিক-সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল দিক দিয়েই পাশ্চাত্যের তরঙ্গাঘাত আমাদের দেশ-তটভূমি ও মানস-তটভূমিতে আঘাত কোরে যাচ্ছিলো। আমাদের দেশের প্রবীণেরা চাইছিলেন তারা সমকালীন জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন না। জগতের সঙ্গে যোগাযোগের সকল দ্বার রুদ্ধ কোরে প্রথাগত ভাবে চলে-আসা নিজেদের আপ্তবাক্য-শাস্ত্রবাক্যের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করবেন। এ-যেন মৃত্তিকাস্পর্শহীন বাঁশের মাচায় অচল আসনে বসে থাকা। কচি নবীনদের আহ্বান করছেন এদের উপেক্ষা কোরে জাগ্রত এক নবভাবসঞ্জীবিত নবজীবন-প্রাঙ্গণে পদসঞ্চারের জন্ধ। কবিতাটির তৃতীয় স্তবকে এই বক্তব্যই ব্যক্ত,

চলতে ওরা চায় না মাটির ছেলে

মাটির 'পরে চরণ ফেলে ফেলে,

আছে অচল আসনখানা মেলে,

যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায়।

এই নূতন জীবনবেগ অনেকেই সহ্য করতে পারবে না, বাঁধিবোলের নির্বিঘ্নতায় যারা স্থায়ীভাবে বাধা-পড়েছে, তারা এই নূতন জীবন-আবেগবাহীদের বাধা দেবে, নবীনের সংঘাত প্রবীণদের কুদ্ধ করবে, হয়তো নিদ্রা ছেড়ে তারা প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করবে এই নব জীবনবোধউদ্দীপ্ত তরুণদের প্রচেষ্টাকে। মিথ্যা (অবাস্তব, কল্পলোকাশ্রিত,) এবং

সত্য (বাস্তব, জাগ্রত জীবনচেতনা-চিহ্নিত) বোধের মধ্যে লড়াই-এ ব্যক্ত হবে প্রকৃত সত্যের বিভা। চতুর্থ স্তবকে এই তাৎপর্যই প্রকাশিত। - আপ্তবাক্য, শাস্ত্রবাক, বাঁধাবুলি, মুঢ় লোকাচার, নির্বোধ প্রথাবদ্ধতা আমাদের চেতনাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ কোরে রেখেছে। অড় মন নিজে চিন্তা করতে চায় না। আপন প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা লব্ধ, জীবন আমাদের কাছে সত্য, কিন্তু তাকে পাওয়ার জন্য সৱকয় জাগ্রত চেতনা। জড়ত্বের মধ্যে এক প্রকার শান্তি আছে, নৈষ্কর্মের মধ্যে খাচায় রুদ্ধ পাখি, বা মানুষ সেই সুখে অভ্যস্ত হয়ে গেলে বাইয়ের জীবন এবারে আবর্ত ও তরঙ্গ সঙ্কুলতাকে শঙ্কিত করে। সে তখন বেদীত কোরে সেখানে পুল-দেবীকে স্থাপন কোরে তার পুজো করতে থাকে। এল তখন যযে-প্রতীকে পরিণত হয়, বন্দিত্ব তখন তার কাছে নিরাপত্তা ; নৈষ্কর্ম তখন তার কবিতাপাঠ তার জীবনদর্শন, খাঁচা তখন তার সুখ-স্বর্গ। মূঢ়তার এই সুখ স্বর্গ ভেঙে দিয়ে স্তনিত অসৎ প্রবাহের মধ্যে আমাদের জীবন-তরণীর যাত্রা শুরু করিয়ে দেওয়ার প্রেরণা সঞ্চারের জন্য কবির আলান প্রমত্ত এচও নবীনদের কাছে। এই নবীনের আবির্ভাব হোক উডীন-নিশান -ধাবমান উন্মত্ত ঝটিকার মতে, বিপুল উদ্দীপনা হাস্যে সমস্ত স্থিরত্বেব প্রেক্ষাপটকে চূর্ণ কোরে দিয়ে সে ভুল করতেই পারে। পরখ এবং সংশোধন (trial and error), সংগ্রাম এবং সাধনার মধ্যদিয়েই আমাদের অগ্রগতি। আগেই আমরা বলেছি, ‘যৌবনের জয়গান' প্রসঙ্গে, ভয় ভুলকে নয়, ভয় জড়তাকে, ভয় বদ্ধ সংস্কারকে। অচল জীবন ভুল করে না, ভুল করে, এবং ভুলকে আবার অতিক্রম করে সচল জীবনই। এই সচলতাকেই অ-প্রদান আলোচ্য কবিতার পঞ্চম স্তবকে।

শিকলদেবীর ঐ-যে পূজাবেদী

চিরকাল কি রইবে খাড়া!

পাগলামি, তুই আয় রে দুয়ার ভেদি!

ঝড়ের মাতন, বিজয়-কেতন নেড়ে

অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে।

ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে

ভুলগুলো সব আনুরে বাছা বাছা।

আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

আপদ বিপদ আঘাত আছেই। তাকে পাশ কাটানো যায় না। অকুতোভয় উদ্দীপনায় তার সম্মুখীন হতে হয়, অর্থহীন মৃত বিধি-বিধান মানুষকে পুতুলে - পরিণত করে। এসব থেকে মুক্ত করার জন্য মুক্ত-মানস যৌবনকে কবির আহ্বান, যারা জীবনবৃক্ষের জীর্ণপাতাগুলিকে ঝরিয়ে দেবে প্রবল আলোড়নে এই বৃক্ষকে আন্দোলিত কোরে। যারা বন্ধ্যা ভূমিকে সগর্ভ ও উদগত-অঙ্কুর কোরে তুলবে শ্যামলিমার স্পর্শে, ঝড়ের মেঘে যারা সঞ্চারিত করবে বৈদ্যুতিক উন্মাদনা। বার্ধক্যের প্রতীক শীতকে অগ্রাহ কোরে যৌবনের প্রতীক বসন্তকে সে বরণ করে নেবে আমের-পুষ্প বকুলের মাল্যগাছিতে। বসন্তের পর গ্রীষ্ম-বসন্তের ভোগকে অতিক্রম কোরে ঐমের কঠোর জীবনকে গ্রহণ করবার চোদা শেষ স্তবকের শেষ তিন পংক্তিতে। ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তবকেও এই-একই বক্তব্য। - আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ইতিহাস-চেতনা। এ-কথা বলছেন টি, এস, এলিয়ট তার Points of view গ্রন্থের Tradition and individual talent-এ।

বোদলেয়ারের কবি-শিষ্যরা, যারানজেদের আধুনিকতার পুরোধা বলে মনে করেন, তারা বলেন আধুনিক কবিতা হবে বিশুদ্ধ কবিতা। বিশুদ্ধ কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সেখানে কোনো বাতি বা উচক নেই। তা কিছু প্রচার

করে, শুধু নিম্নকণ্ঠে নিজের মনের কাছে কথা বলে। একজন বা একটি বিশেষ গোষ্ঠী এমন মত পোষণ করতে পারেন। কিন্তু কবিতায় বাগ্মিতাধর্মের কোনো দিন অভাব ছিলো না। আজও নেই। আলোচ্য কবিতাটির বাগ্মিতা অনস্বীকার্য। এর উচ্চকণ্ঠ আহ্বান নবীনদের কাছে কবি পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেক স্তবকের প্রথমে বা/এবং শেষে উচ্চকণ্ঠ আহ্বান ধ্বনি। কখনো বা সারা স্তবকে। কখনো কখনো কোনো বাক্য স্লোগানের মতো মনে হয়,-

'শিকলদেবীর ঐ যে পূজাবেদী চিরকাল কি রইবে খাড়া' আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা' প্রভৃতি। কিন্তু তবুও বাগ্মিতা-সত্ত্বেও যে রচনা প্রকৃত কবিতা হয়ে উঠতে পারে,

আলোচ্য কবিতাটি তারই পরিচায়ক। অবশ্য কবিতাটি শাজাহান, বলাকা বা ঝড়ের খেয়ার মতো উজ্জল সার্থকতায় উত্তীর্ণ নয়। কারণ গীতিকবিতার সার্থকতা কবির অনুভবের প্রকাশে। হয় কবিতার মধ্যে ব্যক্ত চিত্র বা চিত্রসমুদয়ের সঙ্গে পাঠকের আত্মীকরণ সম্ভাবিত করা, বা কবির অনুভূত ভাবের সঙ্গে পাঠকের চেতনাকে মিলিয়ে পাঠকের মনে জগৎ বা জীবন সম্পর্কিত নূতন উপলব্ধি সঞ্চারিত কোরে দেওয়া। পাঠককে জাগিয়ে দেওয়া। (Projecting feeling and experience of the poct onto an imaginative planc, in rhythmical words, to stir the imagination and the emotions of the appreciative reader)। ঠিক সেগভীরতা কবিতাটি পায়নি। অবশ্য কিছু কিছু সুন্দর চিত্রকল্প আছে। যথা, রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে ; চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা, ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা / অন্ধকারে বন্ধ করা খাচায়; আছে অচল আনখানা মেলে/যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায় ; ঝড়ের মাতন, বিজয়কেতন নেড়ে অট্টহাতে আকাশখানা ফেড়ে; ঝড়ের মেঘে তোরি তড়িৎ ভরা, প্রভৃতি।

খ। সর্বনেশে

ঈশেপোনিষদে বলা হয়েছে কবির্মনীষী পরিতৃঃ'। রের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে কথাগুলি বলা হলেও এর মধ্যে আরও একটি তাৎপর্য আছে। সেই ভিন্ন তর তাৎপর্য হলো কবি 'সর্বোত্তম ক্রান্তদর্শী।' কবি ভবিষ্যৎকে দেখতে পান । হয়তো কবি নিজেই তা বোঝেন না। বলাকার দ্বিতীয় কবিতা 'সর্বনেশেতে রবীন্দ্রনাথ যেন সেই ক্রান্তদর্শী। তিনি অব্যবহিত ভবিষ্যতের পৃথিবীর রূপ দেখেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি অথচ কবির চেতনায় অলক্ষিতে। শুরু হয়ে গেছে তার আগমনের পদধ্বনি। পৃথিবীর পক্ষে এর থেকে বড় সর্বনাশ আর কী হতে পারে-কবির অন্তরের গভীর থেকে উৎসারিত হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে আবির্ভাব্য বই সত্যানুভবের ব্যঞ্জনা-এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো। বেদনায় যে বান ডেকেছে, / রোদনে যায় ভেসে গো। এবং,- জীবন এবার মাতল মরণ বিহারে, প্রভৃতি পঙক্তিগুলিতে। যুদ্ধ শুরুর পরে 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় তার অনুভব আরও দীপ্ত প্রত্যয়ে ব্যক্ত ; সর্বনেশে কবিতার বহু বক্তব্য

সেখানে স্পন্দিত আবেগে প্রকাশিত। ঝড়ের খেয়া আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তার উল্লেখ করবো। - যুদ্ধ শুরু হয় সর্বনেশে রচিত হওয়ার প্রায় দেড় মাস পরে । কবির বন্ধু এন্দ্রুস সাহেবের মতে, কবির কাছে, যেন যুদ্ধের খবর (যুদ্ধ শুরু হবে)। বেতার বার্তায় এসে গিয়েছিলো। কবি অবশ্য বলেছিলেন, অনুভুতি ঠিক যুদ্ধের অনুভূতি ছিলো না। যেন মানুষের এক বৃহৎ ক্রান্তিকালে এসে পৌছানো গিয়েছে। যেন অতীতের অন্ধকার রাত্রি প্রচণ্ড দুর্যোগের মধ্যদিয়ে অবসান হবে এবার। মৃত্যু দুঃখ ও বেদনার মধ্য দিয়ে এক নূতন যুগের আবির্ভাব হচ্ছে, পূর্ব দিগন্তের রক্তিম বনে তার উদয়ের আসন্ন আভাস। কবির মনে এক অকারণ উদ্বেগ। হৃৎপিণ্ড ছয় কোরে এই সর্বনাশের পদতলে অর্ঘ্য দিতে হবে। এরই প্রতিধ্বনি :

রক্ত মেখে ঝিলিক মারে,

বজ্র বাজে গহন-পারে,

কোন পাগল ঐ বারে বারে

উঠছে অট্টু হেসে গো।

কবির ঐ-সর্বনেশে কোনো রূপক বা Symbol নয়। কবি ভেবেছিলেন, যে সর্বনাশের আগমনের আভাস তিনি পাচ্ছেন, তার আগমন হলে কেমন ভাবে তার সম্মুখীন হবেন? পলায়ন করবেন, না, তাকে অভ্যর্থনা করবেন? পলায়ন নয়, তাকে অভ্যর্থনাই করতে হবে সকল আবেগ দিয়ে। শেষ পর্যন্ত এটাই কবির উপলব্ধি । দু:খের মধ্য দিয়েই দেখা দেয় অন্তরের প্রচ্ছন্ন সম্পদ। তার সম্ভাবনা তিনি সেদিম অনুভব করেছিলেন। দুঃখের বেশে এই পরিবর্তনের আবির্ভাব। কবি একে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। ঝড়ের খেয়া (৩৭ সংখ্যক) কবিতায় এই চেতনাই আরো গভীরভাবে প্রকাশিত।

গ। আহ্বান

পূর্বের দুটি কবিতার মিলিত ভাব-তাৎপর্য তিন সংখ্যক আহ্বান কবিতায়ও। প্রথম কবিতাটিতে ছিল যৌবনের জয়ধ্বনির বার্তা। এই আহ্বান কবিতাটির "আমরা"। সেই

জয়ধ্বনির বার্তাবহ হয়ে দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় কবিতাটিতে ছিলো আসন্ন ক্রান্তিকালের আভাস। সর্বনেশে সেই ক্রান্তিকে মানুষের দরজায় নিয়ে আসছে, কবি তা অনুভব করেছিলেন। আলোচ্য কবিতায় সেই 'সর্বনেশেই 'রুদ্র' রূপে 'আবিভূত বাজিয়ে আপন তূর্য'। আগের কবিতায় ছিল রক্তাভ অরুণোদয়ের মধ্য দিয়ে সর্বনেশের আবির্ভাবের ইঙ্গিত। এখানে তারই নূতন রুদ্র-রূপ সেই রুদ্রের আহ্বানে কবি ও তাঁর সহযাত্রীদের প্রত্যয় ও অনুভব –

১। ছিড়ব বাধা রক্তপায়ে,

চলব ছুটে রৌদ্রে ছায়ে,

২। মন ছড়ালে আকাশ ব্যেপে,

আলোর নেশায় গেছি খেপে,

৩। সাগর গিরি করব রে জয়,

যাব তাদের লঙ্ঘি

একলা পথে করিনে ভয়

সঙ্গে ফেরেন সঙ্গী ।

আগের দুটি কবিতায় কবির যে অনুভব, তাই অনুবৃত্তি আহ্বান কবিতায়। সে অনুভব যৌবনের, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পুরাতনকে উত্তীর্ণ হওয়ায়, জীবনকে নূতন কোরে গড়ে তোলার।

প্রতি যুগের তরুণদের উপর দায়িত্ব অর্পিত, তারা প্রলয়ের ভিতর গিয়ে চিরন্তন সত্যের নবীন পরিচয়কে উদ্ধার করবে। এবারকার দূতন যুগে সকল মানুবের আমন্ত্রণ। রাত্রির অন্ধকার শেষ হয়ে আসছে, যে-অন্ধকার বিচ্ছিন্ন কোরে রাবে মানুষকে। কবি নূতন যুগাগনের আসন্ন প্রভাত অন্তরে অনুভব করেছেন। সেই অনুভবেরই পরিণতি কবিতাগুলিতে প্রকাশিত আবেগের মধ্য দিয়ে। যে গণ্ডি আয়তনকে'আরা দেশ বেলে মনে করেছি এত দিন, তাকে অতিক্রম কোরে বেরিয়ে এলো যারা, তারাই অনাগত

মহাযুগের পথযাত্রী! সমুখ পরে বন্ধুরতা ও প্রতিব অতিক্রম কোরে তাদের অগ্রসর হতে হবে। এই ভাবই কবি প্রকাশ করতে চেয়েছেন কবিতাটিতে।

ঘ। শঙ্খ

প্রাক গতি-পর্যায়ে সংশয়ের যুগে কবি কর্মজগৎ থেকে সরে গিয়ে অবকাশ ও ঈশ্বরে টি আমাণের মধ্যে শান্তি পেতে চেয়েছিলেন। খেয়া কাব্য কবি লিখেছিলেন

হাটের সাথে ঘাটের সাথে আজি,

ব্যবসা তোর বন্ধ হয়ে গেল।

এখন ঘরে আয় রে ফিরে মাঝি,

আঙিনাতে আসনখানি মেলে।

ভুলে যা রে দিনের আনাগোনা,

বলতে হবে সারারাতের আলো।

শ্রান্ত ওরে, রেখেদে জাল-বোনা,

গুটিয়ে ফেলেল সকল মন্দ ভালো ।

আর গীতসংকলনত্রয়ীতে মানব-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে ঐশ্বরিক প্রত্যয়ের আশ্রমে প্রত্যাবর্তন। কবি নিজেই শঙ্খ কবিতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, একটা সময় এসেছিলো, যখন বেদনার আঘাতে। মনে হয়েছিলো, জীবনের কাজ তো শেষ হলো, এখন পূজা-অর্চনার দ্বারা শান্তি পাওয়ার সময়, এখন অন্য কোনো কাজের দাবি নেই। কিন্তু অন্তরে একট। ডাক এলো, হঠাৎ মনে হলো মহাপুরুষকে আহ্বান করবার শঙ্খ তো বাজাতে হবে। ছোটো গণ্ডি থেকে মানুষকে বড় গণ্ডিতে নিয়ে আসবার জন্য ।

আগে যে-শঙ্খ কবি বরণ করেছিলেন শান্তির জীবনে পুজোর প্রয়োজনে, কবি অনুভব করলেন, তাকে বৃহত্তর ভূমিকায় উত্তীর্ণ করিয়ে দিতে হবে। বিশাল বিশ্ব দেবতার আহ্বান যে শঙ্খের বক্ষের মধ্যে স্পন্দমান, সেই শকে পুজোর আসনের পাশে মাটিতে

রেখে কবির মনে কী-এক অজ্ঞেয় ব্যাকুলতা। এই শঙ্খই পাঞ্চজন্য। পঞ্চজনকে সে আহ্বান করছে মানবের কল্যাণ-ধারা-ভাগীরথীতে নিস্তেকে মিলিয়ে দিয়ে সেই ধারাকে পুষ্ট করবার জন্য; এই শঙ্খের ধ্বনি ভগীরথের শখের ধ্বনির মতো। It is like a bugle heralding a new age. কবি শঙ্খ কবিতার প্রারম্ভিক পঙক্তিগুলিতে সে-কথাই বলেছেন

তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে

কেমন করে সইব?

বাতাস আলো গেল মরে,

এ কী রে দুর্দৈব!

য়ুরোপের গতিময়তা এবং দুঃসাহস তাকে নবজীবন-প্রবলতায় উদ্বুদ্ধ করেছে, একথা মিথ্যা নয়,কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যুরোপের দম্ভ ও লোভ সর্বজাতির কল্যাণবাহী ভাগীরথী-প্রবাহকে রুদ্ধ করেছে পর্বত-প্রাচীরের মতো। সেই বিপুল বাবাকে ভাঙবার জন্য কবির ডাক -

লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,

গান আছে যার ওঠ-না গেয়ে, ..

চলবি যার চরে খেয়ে

আয়-না রে নি:শঙ্ক!

কবি প্রসঙ্গ স্মরণ করেছেন তাঁর সংশয় পর্যায়ের দিন গুলির কথা। ব্যবসায়ে নেমে ভরা হয়েছে, ঠাকুর-এস্টেটের ভাগ-বাটোয়ারায় সাংসারিক সমস্যা জটিল থেকে জটিলত হয়েছে, প্রিয়তম স্ত্রীর হ হয়েছে মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে, দুই বিবাহিত কন্যা ছাড়। প্রয়াত স্ত্রী রেখে গিয়েছেন চৌদ্দ বৎসরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ, দশ বৎসরের কন্যা মীরা ও আট বৎসরের কনিষ্ঠ পুত্র শমীকে। বিপুল বাইরের কাজ, নিজের বিভিন্ন লেখা, জমিদারি সামলানো, এবং তৎসহ অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকন্যাদের মাতা-পিতার দায়িত্ব একত্রে পালন। এর কিছু পরেই মাত্র তেরো বৎসরে দ্বিতীয় কথা রানীর মৃত্যু, মায়ের

মৃত্যুর দশমাসের মধ্যে। মৃত্যুর আগে তার দীর্ঘ রোগের চিকিৎসা ও শুশ্রষার দায়িত্ব কবি একা শান্তচিত্তে বহন করেছেন। এর পরে এসেছে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের (বিশ্বভারতীর বীজ-রূপ) সমগ্র দায়িত্বপালন। ১৯০৫ সালে বঙ্গব্যবচ্ছেদ-রোধ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ, পিতার মৃত্যু, প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের মৃত্যু। এর সঙ্গে চলেছে ঈর্ষাপরায়ণ ক্ষুদ্রমনাদের নানা আক্রমণ, চরিত্রহনন প্রভৃতি। বিভিন্ন আন্দোলনের নায়কদের সঙ্গেও কবি মতের মিল হচ্ছে না, তাদের কাজে-কথায় অমিলের জন্য, তাদের ভণ্ডামির জন্য, এবং প্রবল অহংকারের জন্য : - উপরি-উক্ত নানা কারণে কবি ক্লান্ত, পীড়িত, সংশয়ান্বিত। তাই শান্তির জন্য তাঁর ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, হৃদয়ক্ষত নিরাময়ের জন্য বিশ্রামের অন্বেষণ

চলেছিলেম পূজার ঘরে

সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।

খুঁজি সারাদিনের পরে

কোথায় শান্তিস্বর্গ!

এবার আমার হৃদয় ক্ষত।

ভেবেছিলেম হবে গত,

ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত

হব নিষ্কলঙ্ক।

তখন কবি অন্তরের মধ্যে অনুভব করলেন, মাটিতে পাশে রাখা দেব-আরাধনার শঙ্খ দেবতারই ইচ্ছা বহন করছে, মহামানবের কাছে ডাক-পাঠন সত্য। যে-প্রলয়ের ইদিত সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে, তার থেকে মানবতকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। ভবিষ্যতের থিকৃৎদের কাছে শস্ফোর-অন্তরে সংগু এই আকুল আহ্বান । এই শস্থ ধুলোয় নত হয়ে পড়ে থাকার জন্য নয়। কবিকেই হতে হবে ভগীরথ । নবজাবণপ্রবাহকে পশ্চাতে নিয়ে তিনি চলবেন ভবিষ্যতের পথে, শঙ্খ-নিনাদিত করতে করতে, ভাবীকালের স্রষ্ট-নায়কদের আগাতে-জাগাতে।

কবি ভেবেছিলেন, চান্তি শেষে তার আশ্রয় হবে ঠাকুরঘর। সুগন্ধ শুভ্র রজনীগন্ধা ফুলে তিনি তার দেবতার পূজার অর্ঘ্য সাজাবেন। সন্ধ্যাকালে দেবতার : আরতি করবেন সন্ধ্যাদীপ জ্বেলে। ভেবেছিলেন, জগতের সব ঋণ শোধ কোরে। দেবেন; সব সংগ্রাম

শেষে, জীবন-তরদের সব সংঘাতের পরে বিরাম ও অবকাশ হবে তার লভ্য। তখন তার আশ্রয় হবে তাঁর প্রিয়তম দেবতব ক্রোড়। কিন্তু কী বিপর্যয়। মৃদু আরতিদীপ নয়, জ্বলে উঠতে চাইছে শত লেলিহান শিখায় সর্বক বৈশ্বানর। এ-দেবতার পূজা শ্বেতশুভ্র রজনীগন্ধায় নয়, রক্তবর্ণের জবা পুষ্পে। এই বিশ্বদেবতার পূজার আহ্বানই উত্থিত হচ্ছে এতদিন নীরব হয়ে-থাকা শঙ্খ থেকে।

এই শঙ্খের অন্তরস্থ শব্দকে বাইরে বিশ্বমানবের কাছে পৌছিয়ে দেওয়া সহজ নয়। প্রবল প্রাণশক্তিই একমাত্র সেই আহ্বানকে বাইরে দূরে ছড়িয়ে দিতে। পারে। তাই কবি যৌবনশক্তিতে নিজেকে পূর্ণ করে নিতে চান ; স্পর্শমণি যেমন লোহাকে সোনায় পরিণত করে, তেমন কোরে যৌবন-স্পর্শমনির স্পর্শে অবকাশ পিয়াসী তার মন নব প্রেরণায় উদ্ভুদ্ধ হয়ে উঠুক। যৌবনের উদ্দীপক সঙ্গীতে তার ম্রিয়মাণ চিত্ত আনন্দে অনুপ্রাণিত হোক। শক্তি মদমত্তদের অন্ধকার চিত্তে ভীতি সঞ্চারিত হোক শখের নিনাদে। অন্ধকার অপসারিত হোক, আলোকের প্রকাশ হোক, যৌবন জাগ্রত হোক, বিপুল প্রেরণায় ও অন্তর আকুলতায় তোমার শখকে উধ্বে তুলে ধরে বাজানোর শক্তি আমাকে দাও', কবির এই প্রার্থনা বিশ্বের অধি দেবতার কাছে। (৪র্থ স্তবক)। বহু আঘাত আসবে চারিপাশ থেকে, অজস্র অস্ত্রের ক্ষতচিহ্ন বহন করতে হবে। সারা দেহে, কেউ পাশে আসবে সাহায্য করতে, কেউ-বা সাহায্য পেতে, কারো পড়বে দীর্ঘশ্বস, কেউ বা হবে ভয়কম্পিত। তার মাঝেই মহাউল্লাসে ঐ শব্দ মানবের সাথে সংগ্রামের তরে যারা প্রস্তত হতেছে ঘরে ঘরে তাদের কাছে আহ্বান পাঠিয়ে দেবে।

জানি জানি, তন্দ্রা মম।

রইবে না আর চক্ষে।

জানি শ্রাবণ-ধারা-সম

বাঁশি বাজিবে বক্ষে।

কেউ বা ছুটে আসবে পাশে,

কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,

দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে

সুপ্তির পর্যঙ্ক।

বাজবে যে আজ মহোল্লাসে

তোমার মহাজয় শঙ্খ।

একদা কর্মক্লান্ত পরিবেশ-আহত কবি অবকাশ ও আরাম চেয়েছিলেন। আজ তার জন্য তাঁর গভীর লম্বা। কারণ আজ চারপাশ থেকে ভয়ংকরের পদসঞ্চার সভ্যতাকে ধ্বংস করবার জন্য। একে প্রত্যাঘাত করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে, পরতে হবে রণসজ্জা। আজ শান্তির জন্য শুধু নির্বীর্য প্রার্থনা নয়, সকল শক্তি দিয়ে, এখন প্রাণের আরাধনা। (৬ষ্ঠ স্তবক)

কবিমানসের তিনটি বিশিষ্ট কবিতা চারটিতে ব্যক্ত:

১. আমাদের দেশের কর্মোদ্যোগহীন বাধিবোলের জীবনকে আঘাত করা যৌবনপ্রণা সঞ্চারের দ্বারা।

২. আসন্ন মহাসমরের দুর্যোগের অনুভব। এবং তার সঙ্গে ঠিকমতো মুখমুখি হওয়ার জন্য সকলকে সজাগ করা।

৩. কবির সংশয় পর্বের জাগতিক অনাগ্রহ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।

৪.২ মৃত্যুর গর্জনের কবিতা

এতোদিন যে-যুদ্ধ ছিল সম্ভাবনা, তা বাস্তবে পরিণত হলো। সারা জগৎকে চকিত বিহ্বল বিভ্রান্ত কোরে যুদ্ধ এসে গেলো। তার অভিঘাতে জেগে উঠল কবির কল্পনা তীব্র বেগে ও আবেগে। কবির মনে প্রশ্ন জাগলো, কেন এই যুদ্ধ। বিশ্বব্যাপী এই যুদ্ধ সকলকে পীড়িত করবে, কিন্তু সকলেই কি এই যুদ্ধ ঘটানোর জন্য দায়ী। এই যুদ্ধের রূপ কেমন হবে? এই যুদ্ধে সাধারণ মানুষের ভূমিকা কী হবে? ইয়ুরোপের পরিণতিতে

জগতের প্রাপ্তি কী? কবির সমকালীন প্রসাধক কবিতা গুলিতে এইসব জিজ্ঞাসার উজ্জ্বল উপস্থিতি।

ক। পাড়ি (৫ সংখ্যক)

পাড়ি কবিতায় দুটি চরিত্র আছে। একটি 'নেয়ে' বা মাঝি, এবং আর একজন গৌরবহীন। নারী; রুক্ষ-অলক, সিক্তপলখ-আঁখি নি:স্বতেম, পরিচয়হীন। সে তার অঙ্গনে সারারাত পুজোর বাতি জ্বালিয়ে অপেক্ষমাণ, মাঝি নিশীথ-রাত্রে প্রবল। ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে নৌকোয় পাল তুলে দিয়ে, প্রমুত্ত সাগরের প্রচণ্ড তুফান পাড়ি দিয়ে অভিসারে আসছে কি ঐ পরিচয়হীনা দীন নারীর কাছে! ঘনকৃষ্ণ রাতি, তররে উন্মত্ত মাতামাতি, এমন দুর্দিনে মাঝির এই আগমন কেন? (১ম স্তবক)

এমন দুর্যোগের রাতে, নিবিড় অন্ধকারকে পালের সাদারঙের দ্যুতিতে চমকে দিয়ে মাঝির এই আগমন। কোন্‌ঘাটে সে নামবে, সঙ্গে কি তার বিপুল ঐশ্বর্য? না, কোনো অর্থ, রতন, মণি-মাণিক, সম্পদ তার সঙ্গে নেই। তার সঙ্গে আছে । শুধু এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা। (২-৩ স্তবক)

হ্যা, মাঝি ঐ নিঃস্ব পরিচয়হীনা গৌরবহীন নারীর কাছেই আসছে তাকে ঐ রজনীগন্ধার গুচ্ছ উপহার দিতে। যে-নারীর নাম কেউ জানে না, তারই নাম ধরে ডাকতে ডাকতে মাঝির আগমন। কেননা,তুরী-ভেরী বাজবে না, কেউ খেয়াল। করতে পারবে না, সকলের অলক্ষিতে ঐ নারীর দীনকুটিরে হবে মাঝির অভিসার। মাঝির পুলক-স্পর্শে ধন্য হবে গৌরবহীনা নারী। (৪-৫ স্তবক)

পূর্বে-উক্ত দুটি চরিত্র (মাঝি ও নারী) দুটি প্রতীক। মাঝি ইতিহাস-বিধাতার ও নারী অখ্যাতনামা তপস্যীদের যারা ভেবেছিলো মহাযুদ্ধ-অবসানে এই পৃথিবীতে প্রেমের রাজ্য অবতরণ করবে। এই অখ্যাতনামা তপস্বীরা পার্থিব ঐশ্বর্যহীন, তাদের শুধু ছিলো দৃঢ় প্রত্যয়, যদিও জগতে প্রমত্ত অমঙ্গলের ঝড়-ঝা-তুফান অন্ধকার, তবুও ইতিহাস-বিধাতা তার শ্বেতশুভ্র শ্রেয়ের পতা উড্ডীন কোরে । আত্মিক-শক্তিতে উদ্বুদ্ধ প্রেমে-জাগ্রত

মানুষদেরই তার চরম দানে ধন্য করবেন। শক্তিমত্ত ঐশ্যশিল্প, কপটাচারীদের বিকৃত ঈপ্স পূর্ণ হবে না। অবশ্য যদি তপস্বীরা তপস্যা করেন তবেই।

খ। ঝড়ের খেয়া (৩৭ সংখ্যক)

ঝড়ের খেয়া রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতা। বীজ-কাব্য থেকে তে কুড়িটি কবিতা দি বেছে নেওয়া হয়, তাহলে এটির স্থান হবে প্রথম দিকেই। বিশ্বব্যাপ্ত ক্রন্দনের কলরোল, বক্ষ থেকে উৎসারিত রক্তের কল্লোল, বহ্নি বন্যা তরঙ্গের বিপুল প্রবাহ, ভূত-গগন ছিত-বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন প্রভৃতি চিত্রকল্প পে-ণ্ডের যুদ্ধকে আমাদের সামনে জীবন্ত ও তাৎক্ষণিক দূরদর্শন সম্প্রচার (live telecast)-এর মতো শুধু প্রদর্শিতই করেনি, আমাদের এ-যুদ্ধের কুশীলব রূপে অং কোরে নিয়েছে। এবং শুধু মহাসমরের আশ্চর্য ভয়ংকর সমা রোহই নয় কবিতাটির মধ্য দিয়ে কবির যে-সুগভীর অনুভব ব্যক্ত হয়েছে, যুদ্ধের কারণ নির্ণয়ে, যুদ্ধের পরিণতি অনুমানে এবং এই যুদ্ধে মানবসাধারণের সম্ভাব্য ভূমিকা অনুধাবনেতা কবিতাটিকে একাধিক তৎপর্যে বিধৃত করেছে। 'পাড়ি'তে আমরা এক সমুদ্র পাড়ি দেওয়া নেয়েকে দেখেছি। সেই নেয়ে এখানে হয়েছে নূতন সমুদ্রতীরের উদ্দেশ্যে পাড়ি-দেওয়ার জন্য প্রস্তুত এক কাণ্ডারী'। 'পড়ি' কবিতার নেয়ে পাড়ি দিচ্ছে মত্ত সাগর। তখন নিশীথরাত্রি, কৃষ্ণবর্ণ রাতের গণি-চালা আকাশ সমুদ্রের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার, সঙ্গে ঝড়ের ঝাপটা, উত্তাল উন্মত্ত ঢেউ

মন্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে

ঐ-যে আমার নেয়ে।

ঝড় বয়েছে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে

আসছে তরী বেয়ে।

কালো রাতের কালি-ঢালা ভয়ের বিষম বিষে

আকাশ যেন মুর্ছি পড়ে সাগর-সাথে মিশে;

উতল ঢেউয়ের দল খেপেছে, না পায় তারা দিশে

উধাও চলে ধেয়ে।

হেনকালে এ দুর্দিনে ভাল মনে কী সে।

কূল-ছাড়া মোর নেয়ে? (পাড়ি, ১ম স্তবক)

ঝড়ের খেয়াতেও একই বর্ণনা। তবে সেখানে ভয়ংকরের তীব্রতা অনেক বেশি। কারণ সময়ের পার্থক্য। পাড়ি কবিতাটি রচনা যুদ্ধ শুরুর ঠিক পরেই। যুদ্ধ শুরু ২৮শে জুলাই, ১৯১৪; পাড়ি কবিতার রচনাকাল ১৯১৪-র আগস্টের তৃতীয়। সপ্তাহ-শেষ, আর ঝড়ের খেয়র। ১৯৯৫ অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ। অর্থাৎ পাড়ি-রচনার প্রায় এক বৎসর দুই মাস পরে, তখন যুদ্ধের তীব্রতা অনেক গাঢ়। তাই সেই সময়ের বর্ণনায় পরিবেশ-প্রেক্ষাপটের পরিচয় অনেক উদাত্ত, ভয়ংকরত্বের প্রকাশ অনেক প্রকট। পাড়ির নেয়ের মতো এখানেও কাণ্ডারী মত্ত সাগর পাড়ি দিচ্ছে, তবে তার প্রমত্ততা প্রচণ্ডতর, এবং সে-সাগর বহিবাতরঙ্গের, বিষশ্বাস কটিকার মেঘাবৃত ; আর তার চারপাশের প্রেক্ষাপট ছিত-বিহ্বল-করা মৃত্যু আলিঙ্গনে পূর্ণ। একই সমুদ্রের বর্ণনা দুটি কবিতায়, পার্থক্য শুধু তীব্রতার পরিমাণে, ভীষণতার সমুন্নতিতে।

কিন্তু এর পরের পার্থক্য অনেক গভীর। আমরা পাড়ি কবিতার আলোচনায় জেনেছি পাড়ি কবিতার মাঝি আসছে অভিসারে অখ্যাতনামা নিঃস্ব তপস্বীদের। কাছে এই মাঝি ইতিহাস-বিধাতা। ঝড়ের খেয়ার কাণ্ডারীও ইতিহাস-বিধাতারই প্রতীক। কিন্তু পাড়িতে সে প্রমত্ত যুদ্ধ-সাগর অতিক্রম কোরে এসেছে তার নিঃস্ব প্রিয়তমার কাছে। আর ঝড়ের বেয়ার ইতিহাস-বিধাতা সকলকে নিজের তরণীতে তুলে নিয়ে প্রমত্ত সাগর পাড়ি দিচ্ছেন নূতন উষার স্বর্ণদ্বারে পেছনোর। জন্য। সে উষা আশাই আর এক নাম। যারা এখনও উদাসীন, নিদ্রামগ্ন বা তন্দাচ্ছদের কাছেও ডাক পাঠিয়ে দিচ্ছেন কাণ্ডারী এই যুগ-অতিক্রমকারী। তরণীতে যাত্রী হওয়ার জন্য। দূর হতে শুধু কাণ্ডারীর আহ্বান এনে ঘরের সুখশয্যায় শুয়ে থাকলেই হবে না, সকলের সঙ্গে সহযাত্রী হওয়ার জন্যই কাণ্ডারীর আহ্বান

দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,

ওরে উদাসীন –

ওই ক্রন্দনের কলরোল,

লক্ষবক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।

বহ্নিবন্যা তরঙ্গের বেগ,

বিষশ্বাসঝটিকার মেঘ,

ভূতল-গগন –

মুর্ছিত-বিহবল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন --

ওরই মাঝে পথ চিরে চিরে

নূতন সমুদ্র তীরে

তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি, (১-১১ পঙক্তি)

ঝড়ের খেয়ার উপরি-উক্ত পঙক্তিগুলিতে সাগর (যুদ্ধ-সাগর) ও তার চারপাশের যে-বর্ণনা, তা প্রথম মহাসমরের যথাযথ ও বাস্তবপরিচয় চিহ্নিত।

যদিও যুদ্ধের বিবরণ ও সমকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতির বাস্তব ও জীবন্ত পরিচয় দিয়ে কবিতাটির শুরু, কিন্তু শুধুমাত্র ঐ বর্ণনা ও তাকে অতিক্রমণের প্রেরণ সঞ্চারেই কবিতাটি শেষ হয়ে যায়নি। এর অভ্যন্তরে আরও একটি তাৎপর্য আছে। 'সবুজের অভিযান' কবিতার আলচনা-প্রসঙ্গে যে-কথা বলেছি, আমাদের দেশের লোকাচার ও প্রথাবদ্ধতায় চলমান জীবনকে স্থবির ও গতিহীন কোরে অনড় , হয়ে বসে আমরা আমাদের সনাতনত্বের জয়গান করছিলাম,-যুরোপের যুদ্ধের অভিঘ্রাত আমাদের সে-প্রত্যয়ের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে। পুরাতন অনড় জীবন দশ ও জীবনদর্শন নিয়ে শাস্ত্রের বানী বোলে শান্তি খুঁজে নিজের অচলায়তনে আর থাকা যাবে না। কারণ বাইরের জগৎ চারিপাশ থেকে আঘাত করছে। আমরা ভারতীয়েরা বিপুল বিশ্বজগৎ থেকে ও বাস্তবের

তরঙ্গস্তনিত সমুদ্র-বক্ষ থেকে আমাদের জীবন-তরণীকে সরিয়ে এনে তথাকথিত শান্তির স্থিরতায় ও সনাতনবে। অচলায়তন বন্দরে নোঙর কোরে রেখেছিলাম বহু বৎসর ধরে। যখন বহির্জগতে নতুন বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রনীতি নিয়ে নব নব চিন্তা, নব নব গবেষণা, অভিনব সব আবিষ্কার, তখন আমরা আমাদের বহুদিনের পুরাতন ধ্যান-ধারণা সংস্কার-অন্ধতা জগতের হাটে ফেরি করতে বেরিয়েছি।

দাকিছে কাণ্ডারি

এসেছে আদেশ

বন্দরের বন্ধন কাল এবারের মত হল শেষ।

পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা-কেন?

আর চলিবে না।

বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি,

কাণ্ডারি ডাকিছে তাই বুঝি –

তুফানের মাঝখানে

নূতন সমুদ্রতীর-পানে।

দিতে হবে পাড়ি।

যুদ্ধের প্রবল আলোড়ন তাদের সনাতনত্বের ভীত নাড়িয়ে দিয়েছে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ও যুদ্ধ-ভীতদের প্রতি যেমন আহ্বান, তন আহ্বান তাদের প্রতিও যারা সনাতনত্বের ও অচলায়তন-দর্শনের দোহাই দিয়ে একে এড়িয়ে থাকতে চাইছে। কাণ্ডারী শুধু যুদ্ধ-পীডদেরই নন, অচল মঞ্চ বিহারী চক্ষু-কর্ণ-রুদ্ধ স্থবিরদেরও বটে। তাদেরও তিনি স্পন্দমান জীবন-কলের যেতে চান। অচল-আয়তনিক জীর্ণ-পুরাতন ধ্যান-ধারণার পোষক ও সনাতনের জয়গানকারী, সমুদ্রপরিহারী বন্দরে জমে-যাওয়া হাজার বৎসরের অনড় ভারত মানব-গোষ্ঠীর প্রতি।

এই আহ্বানের সাড়া দেওয়ার জন্য দেশ-বিদেশের সকলেই সেদিন ব্যাকুল।

ইয়ুরোপখণ্ডের বিভিন্ন দেশের মানুষ বেরিয়ে পড়েছে তিতাসবিধাতার সহযাত্রী হতে ও জীবনের নান উধঘাটনে সহায়তা করতে। সকলেই ভাবছে এক নূতন যুগ ও নতুন পৃথিবীর সম্ভবনার কথা। এর সঙ্গে কি আমরাও (ভারতবাদীরা) যোগ দেব না? আমরা কি এখন প্রগাঢ় সুপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে? বিপদ তো আছে, দুঃখও অপেক্ষমাণ। তাই জেনেই কি বক্ষে পান নুতন উন্মাদনায় নৃত্য করে উঠবে না? জানি

ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে

কালোয় ঢেকেছে আলো, জানে না তো কেউ

রাত্রি আছে কি না আছে; দিগন্তে ফেনয়ে উঠে ঢেউ

তারি মাঝে ফুকারে কাণ্ডারী

নূতন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি।' (৩০-৩৪ পঙক্তি)

এই যাত্রায় সঙ্গী হওয়ার জন্য কত মানুষ বেরিয়ে পড়েছে। অনেক জীবন দিতে হবে, অনেক প্রাণ যাবে। প্রিয়জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। মায়ের বেদনা সিক্ত পশ্চাৎ ডাককে পিছনে ফেলে প্রেয়সীর নিমীলিত নয়নের সম্মুখ দিয়েই সকলে বেরিয়ে পড়েছে এই মহাযাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্যে।

বাহিরিয়া এল কারা? মা কঁদিছে পিছে,

প্রেয়সী দাড়ারে দ্বারে নয়ন মুদিছে।

ঝড়ের গর্জন-মাঝে

বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে;

ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল;

'যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল'

উঠছে আদেশ

'বন্দরের কাল হল শেষ।' (৩৫-৪২ পঙক্তি)

এই যে যুদ্ধ, বিশ্বব্যাপ্ত মহাসমর, যাকে বিপ্লবের সম্ভাবনাগর্ভ বলে মনে হচ্ছে, বস্তুতঃ তা কোন পরিণতির নির্দেশক। এতে সকল মানুষকে অংশগ্রহণের জন্য ইতিহাস-বিধাতার যে-আহ্বান, তা কোন্ উষার স্বর্ণবার উদঘাটিত কোরে দেবে। তার আর দেরিই বা কত? এর কিন্তু উত্তর নেই। সকলেই ভীত, আরবে প্রশ্নমুখর, এই যুদ্ধের পরিণামে আমাদের জীবনে নুতন প্রভাতের সূচনা; হবে তো। যা বর্তমানের অবক্ষয়িত সভ্যতাকে নূতন মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করবে

'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার

খুলিতে বিলম্ব কত আর

এ কথা শুধায় সবে,

ভীত আর্তরবে।

ঘুম হতে অকস্মাৎ জেগে।

এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। যাত্রীরা শুধু জেনেছে

মৃত্যু ভেদ করি।

দুলিয়া চলেছে তরী।

কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার,

সময় তো নাই শুধাবার।

এই শুধু জানিয়াছে সার,

তরঙ্গের সাথে লড়ি

বাহিয়া চলিতে হবে তরী;

টানিয়া রাখিতে হবে পাল,

আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল;

বাচি আর মরি।

বাহিয়া চলিতে হবে তরী। (৪৬-৫৩ পঙক্তি)

মরণের গান গাইতে গাইতে সকলে ভাবছে, তারা চলেছে নবজীবনের অভিসারে। কিন্তু চারিপাশে ঘোর অন্ধকার। এবং সবই অজানা। গমন-পথ এবং গন্তব্য। ইতিহাসবিধাতার আহ্বান কি শুধু শুহতাময় পরিণতির নির্দেশক, না বৃহৎ জীবনের উন্মোচক? কিছুই জানা নেই। শুধু অভিজ্ঞতার বাস্তবতায় ধরা পড়ছে যাত্রা পথের চারিপাশ্ব চোখের জলে, দুঃখে অমঙ্গণে অশ্রুতে হিংসায় উদ্বেল। দিকপ্লাবী। উকাশ তারই ব্যঙ্গ-লাঞ্ছিত- : -

অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে দেশ

সেথাকার লাগি

উঠিয়াছে জাগি

ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শৃষ্ঠে প্রচণ্ড আহবান।

মরণের গান

উঠছে ধ্বনিয়া পথে নববনের অভিসারে

ঘোর অন্ধকারে।

যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,

যত অশ্রুজল

যত হিংসা হলাহল

সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া

কূল উলঙ্ঘিয়া

উর্ধ আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।' (৫৬-৬৮ পঙক্তি)

তবুও অগ্রসর হতে হবে। উন্মত্ত দুদিনের মধ্য দিয়েই, নিখিলের হাহাকার শুনতে শুনতে। কিছুতেই আশা-হারানো চলবে না। যদিও আশা পূর্ণ হওয়ার নিশ্চয়তা নেই, স্বর্ণ-উষার আবির্ভাবের অবশ্যম্ভাব্যতা নেই, জীবনের স্থিরতা নেই, মৃত্যুর বাধা নেই। তবুও ঘোর অন্ধকারের মধ্যেই জীবনের অভিসার এবং আশা অত্যাজ্য -

তবু বেয়ে তরী।

সব ঠেলে হতে হবে পার,

কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার,

শিরে লয়ে উন্মত্ত দুর্দিন,

চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন। (৬৯-৭৩ পঙক্তি)

কিন্তু কেন এই যুদ্ধ? কার দোষে এই প্রলয়? কাদের ধনলিপ্সা, সাম্রাজ্য লিগা, আধিপত্যপিপা, ক্ষমতালিপা যুদ্ধের উন্মত্ততায় পৃথিবী ভরিয়ে তুলেছে? কোন্ সে আসামী? অপরাধী কে? কোন অত্যাচারিতের দীর্ঘশ্বাস এই যুদ্ধের, গভীর থেকে উত্থিত হচ্ছে। কোন্ বঞ্চিতের চিত্তক্ষোভ? কাদের চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দীর্ঘদিন ধরে অপমানিত হতে হতে বিধাতার বক্ষ বিদীর্ণকারী ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জগতে এই-প্রদায়ের সূচনা করেছে? এই যুদ্ধের জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী পারস্পরিক দোষারোপ শুরু হয়েছে। কিন্তু এই যুদ্ধের জন্য সকলেই দোষী। কেউই এর দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। প্রত্যেকেরই ভূমিকা রয়েছে এই যুদ্ধ-সংঘটনের পশ্চাতে।কেউ অন্যায় করেছে, কেউ অন্যায় সহ্য করেছে। উভয়েই সমান দোষী।একদিনের ছোটো ছোটো অত্যাচার সঞ্চিত হতে হতে আর একদিন বিপুল জগদ্দল পাহাড়ের সৃষ্টি করে। তারই চাপে বিদীর্ণ হয় জগৎ।সুতরাং অপরকে দোষী কোরে আজ নিজের সাধু সাজার দিন নয়।আজ মাথা নত কোরে নিজের নিজের অপরাধের শায়িত্ব স্বীকার কোরে এই

প্রলয়ের মধ্য দিয়েই আবার জগতকে নুতন যুগ-ভূমিতে উত্তীর্ণ করিয়ে দেওয়ার

ভূমিকা গ্রহণ করা দরকার সকলের।

হে নির্ভীক, দুঃখ-অভিহত,

ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি? মাথা করো নও ।

এ আমার এ তোমার পাপ ।

বিধাতার বক্ষে এই তাপ

বহু যুগ হতে জমি বায়ুকোণে অজিকে ঘনায় –

ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,

লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,

বঞ্চিতের নিত্য চিভক্ষোভ,

জাতি-অভিমান,

মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান –

বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া

ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।

ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান,

নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ।

রাখো নিন্দাবাণী রাখো আপন সাধুত্ব-অভিমান

শুধু একমনে হও পার।

এ প্রলয়-পারাবার

নুতন সৃষ্টির উপকূলে।

নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে। (৭৪-৯২ পঙক্তি)

যারা পাশবিকতায়, অমানবিক নিষ্ঠুরতায়, ফ্যাসিজমের নির্বিচার নিদারুণতায় সেদিন নিজেদের মাঃসলোলুপ দংষ্ট্রারেখা বিকীর্ণ করেছিলক, তারা তো দোষী ছিলই, কিন্তু এতো দিন ধোরে যারা তা সহ্য করেছে, আমরা উদাসীন হয়ে থেকেছি, শান্তির আকাঙ্ক্ষায় তাকে সহ্য করেছি, বাকি জয়লাভে আশায় । শহীণশক্তি সূচনার দিনে অল্প-প্রতিরোধেই যা দমনীয় ছিলো, তবু তাকে দমন করতে কেউ সচেষ্ট হয়নি শুধু নয়, নিজেদের জীবনেও ঐ অপকৃষ্টি অনুকরণ ও অনুসরণ করেছে, তারাও কম দোয়ী নয়। এ আর্মাদের সকলের পাপ। অপরকে দোষ দিয়ে নিজেকে সাধুর বিশেষণে বিশেষিত-করা শোভা পায় না। নিজের সাধুত্বের অভিমান নিয়ে কারো অহংকার করা সাজে না। এখন সকলেরই কৃত্য, একমনে এই প্রলয়-পারাবার অতিক্রম-করার চেষ্টা করা। নূতন জীবনদৃষ্টি, নূতন সৃষ্টি-প্রেরণা ও নূতন প্রজ্ঞা নিয়ে নব জীবনের কূলকে খুঁজে নেওয়া।

আগে যে-কথা উক্ত হয়েছে, সে-কথা এখন বিশেষভাবে স্মরণীয়। একদিন যে ক্ষুদ্র পাপ, ক্ষুদ্র, অন্যায়, ক্ষুদ্র অশান্তিকে আমরা উপেক্ষা করেছি, তাই কালক্রমে ফণা-কণা হা হতে হতে জগদ্দল পাহাড়ে পরিণত হয়েছে। জীবনকে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্রুপ করেছে, ছোটো ছোটো দৈনন্দিন আত্মিক মৃত্যুতে আমাদের অভিভূত করেছে। ব্যক্তি-মানুষ, সকলেই এই পাপ পোষণ করেছে, আবার একে পালন করেছি! আজ তাদেরই সম্মিলিত সঞ্চিত রূপ অভ্রভেদী বিরাট সত্তা পরিগ্রহ কোরে প্রথম মহাযুদ্ধ রূপে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।

তবুও আমরা অভিভূত হবে না। অকম্পিত হৃদয়ে এর সামনে দাড়াবো, প্রয়োজনে প্রাণ দেবো, কিন্তু তার দ্বারা ভীত হবে না। প্রতিদিনের সাধনার মধ্য দিয়ে আমরা একে জয় করেছি। অনুভব করেছি, এই বৃহৎ দুর্যোগও ক্ষণিক বিদ্রুপ নির্ভয়ে এর সম্মুখীন হলেই সর্ববিশ্বব্যাপ্ত চরম সত্যকে পাওয়া যায়, এতি মুহুর্তের ক্ষণিক শান্তির ছলনাকে অতিক্রম কোরে সাক্ষাৎ মেলে চিরন্তন শান্তির । প্রতিমুহূর্তে জগৎ থেকে উত্থিত অশান্তি, বা বহু মুহূর্তের সম্মিলিত অশান্তি, ধ্রুব সত্য নয়। ধ্রুব সত্য আপাতঃ ও ক্ষণিক চঞ্চল শান্তি-অশান্তি পরবর্তী চিরন্তন শান্তি। তাকে সাধনার মধ্য দিয়ে পেতে হয়। এই শান্তি

সর্বপ্রকার জাগতিক চঞ্চলতায় অবিচলিত। এই শান্তি সর্বপ্রকার মালেরই (শিব-চেতনার) একটি প্রকাশ।

যে এ-বিশ্বাসে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে, এবং এর সঙ্গে একাত্ম হয়েছে, সে যে-কোনো মহৎ ভয় বা বিপর্যয়ে প্রাণ দিতে দ্বিধা বোধ করে না। কারণ সে অনুভব করে জগৎব্যাপ্ত সত্য ও মঙ্গলের সেও এক অনির্বাণ প্রকাশ, মৃত্যুহীন। আপাত: মৃত্যু, মৃত্যুর ছলনা মাত্র।

দুঃশেরে দেখেছি নিত্য,পাপেরে দেখেছি নানা ছলে ;

অশান্তির ঘুর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে;

মৃত্যু করে লুকাচুরি।

সমস্ত পৃথিবী জুড়ি ।

ভেসে যায় তারা সরে যায়, জীবনেরে করে যায়

ক্ষণিক বিদ্রুপ।

আজ দেখো তাহাদের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ।

তার পরে সাড়াও সম্মুখে,

বলো অকম্পিত বুকে –

তোরে নাহি করি ভয়;

এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।

তোর চেয়ে আমি সত্য, এ বিশ্বসে প্রাণ দিব, দেখ,

শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।' (৯৩-১০৬ পঙক্তি)

কবিতাটির শেষ স্তবকে কবির তীব্র প্রশ্ন। এতক্ষণ বিশাস ও আত্ম-অনুভবের মধ্য দিয়ে কবি উপসংহারে এসে বললেন, ভয়ংকর প্রলয়ের চেয়েও মানুষ বৃহৎ। মানুষ সত্যেরই

মুরতি,ব্রহ্মের প্রকাশ। সাধনা ও নির্ভয়তার মধ্য দিয়ে সে জগৎকে যে-কোনো বিপদ থেকে মুক্ত করে। অন্ধকার জগৎকে আচ্ছন্ন করে এ-কথা মিথ্যা নয়, আবার মানুষই সেই অন্ধকার বিদূরিত কোরে আলোকোজ্জ্বল দিনের মহিমায় দাড় করিয়ে দেয়।

মৃত্যুর মূল্যে অমৃত খুঁজে পাওয়া যাবে তো-

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,

সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ-সাথে যুঝে,

পাপ যদি নাহি মরে যায়।

আপনার প্রকাশলজ্জায়,

অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ সজ্জায়,

তবে ঘরছাড়া সবে

অন্তরের কী আশ্বাসরবে

মরিতে ছুটিছে শত শত

প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো?

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা,

এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা?

স্বর্গ কি হবে না কেনা?

বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না

এত ঋণ?

রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?

নিদারুণ দুঃখরাতে।

মৃত্যুতে মানুষ চুর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা

তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা? (শেষ স্তবক)

কবিতার শেষে কবির মনে যেন সংশয়। এর আগে 'আহ্বান' কবিতার উপসংহার পঙক্তিগুলিতে, যে-প্রত্যয় দেখেছি এখানে তার অভাব। প্রথমে কবি যুদ্ধকে শুধু যুদ্ধরূপে দেখেননি, পুরাতন সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন-সংঘটনকারী বিপ্লবরূপেও দেখেছেন। এই যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ও মৃত্যুর মধ্যে সম্ভাবনা দেখেছিলেন এর জীবনের, সত্যের সর্বাঙ্গীণ উদ্ভাসের, ব্যক্তিগত ও জাতিগত পাপের ও অত্যাচারের ধ্বংসের, সকল মূঢ় অহংকারের অবসানের।

কবিতা শুরুর প্রাথমিক প্রত্যয় এখানে সংশয়কটকিত। কবির মনে শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন জেগেছে, অন্তি পরিণতিতে যদি সদর্থক প্রাপ্তি কিছু না-থাকে, তবে এই যুদ্ধ, এতো মৃত্যু, প্রেমও হাহাকার, সবই অর্থহীন হয়ে যায়। জগতের অন্তস্থিত যে-শক্তি পরিণতিতে সকল গুডের নির্দেশক বলে মানুষ বিশ্বাস কোরে আসছে, সে-বিশ্বাস মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, বীরের ব্রত, মাতা অবর্ষণ সবই হস্ত্র ব্যর্থ, এবং অপব্যয় মাত্র।

কবিতাটির শেষ স্তবকে শুধু কবির প্রশ্ন, প্রশ্ন, এবং প্রশ্ন। কবি যদি দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিতই হবেন, তা হলে এত প্রশ্ন কেন? আসলে এ সংশয়। এ সংশয় আধুনিক মানসিকতার। প্রকৃত আধুনিক মানুষ কোনো ভাবাদর্শে (idea)র। ক্রীতদাস বা কৃতদাস হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত নিরীক্ষণ এবং পরীক্ষা (observation এবং experiment)-র মধ্য দিয়ে সে সার্বজনীন সিদ্ধান্তে (inference-এ) পৌছুতে না-পারছে, ততক্ষণ সে বলতে পারে না আমার ধারণাই সত্য। যারা নিজের বা কোনো মিলিত গোষ্ঠীর ভাবাদর্শকে (idea ব-ism কে) সত্য বোলে প্রচার করে তারা ভাবান্ধ (bigot) মাত্র । রবীন্দ্রনাথ বাঙলাদেশের সবথেকে বড়ো। আধুনিক কবি। তার প্রথম জীবনের প্রত্যয় শেষ জীবনে বহুলাংশে বিগত । 'বলাকা' কাব্য থেকেই এই আধুনিক চেতনার শুরু। নিরীক্ষণ, পরীক্ষা এবং সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় একে বৈজ্ঞানিক চেতনাও বলা যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ধারণার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছোনো না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাই সংশয়। এখানে

কবির সেই আধুনিক সংশয় বা বৈজ্ঞানিক সংশয়। অনেকে মনে করেন, শেষ স্তবকের জিজ্ঞাসা-চিহ্নগুলি প্রত্যয়-বোধক।

এই কবিতাটিতে কবির পূর্বতন জীবন-ভাবনা, এবং কবির মানবচেতনা, গতিবাদ ও যৌবনের জয়গানের সুন্দর প্রকাশ রয়েছে।

গ। যৌবন (৪৪ সংখ্যক)

আগের কবিতার উপসংহার-পঙক্তিগুলিতে আমরা অনুভব করেছি, কবি আশা করেন, কিন্তু পরমগন্তব্য সম্পর্কে তিনি কোনো নিশ্চয়ত্মক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন না। জাতের সত্য অপরিবর্তনীয় গতি, কিন্তু কোনো পরম উদ্দেশ্য তার সামনে থাকে কি না তা আমাদের জানা নেই। বলাকা কাব্যগ্রন্থের শেষ দুটি কবিতা, যৌবন (৪৪ সংখ্যক) ও নববর্ষের আশীর্বাদ (৪৫ সংখ্যক) যুদ্ধের স্মৃতিবহ, কিন্তু কোনো পরিণতি-নির্দেশক যুগান্তরের বার্তাবহ নয়। পক্ষান্তরে এখানে গতিরই জয়গান করা হয়েছে। যুদ্ধ-পরিণতি যদি শুভ নির্দেশক না-ও হয়, যদি মৃত্যুর মধ্য দিয়েই হয় পথের গতি, যদি প্রলয়ের মেঘ ও ঝড়ের ঝংকার হয় পথযাত্রার চিরন্তন সঙ্গী, রুদ্রের ভৈরব-গান যদি পথের বাঁকে বাঁকে অভ্যর্থনা জানায়, ঝটিকার ঘূর্ণাবর্ত ধরার বন্ধন থেকে উড়িয়ে নিয়ে দিক-দিগন্তরে দিশাহীন কোত্রে দেয়, কালবৈশাখীর প্রবণতা এবং শ্রবণরাত্রির বনাদ আঘাতে আঘাতে বিদীর্ণ করে, গুঢ়ফণা-গুপ্তসর্প যদি দংশনও করে, তবু পথে পথে গমনই একমাত্র নিয়তির নির্দেশ। ভালো-মন্দ যাই আসুক-না-কেন গতিই একমাত্র সত্য The eternal flux of Time অনতিক্রম্য । ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় তাতে সাড়া দিতেই হবে। সেই গতির বার্তাবহ নবীনকে, যৌবনকে, সবুজকে, চিরযুবাকে কবি আহ্বান করেছিলেন বলাকা কাব্যের শুরুতে, জীর্ণ জয়া ঝরিয়ে দিয়ে অফুরন্ত প্রাণ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। ঝড়ের খেয়া কবিতায় কবি সংশয়ে আকী, যুদ্ধ-বিপ্লবের পরেও সেই অফুরন্ত প্রাণের আবির্ভাব হবে কিনা! তবুও চিত্তে রাখতে হবে অফুরন্ত আশা। এবং সেই অফুরন্ত আশা চিত্তে নিয়ে যৌবনকে পদসঞ্চার করতে হবে মৃত্যুর মধ্যেও অমৃতের অধিকার অর্জনের আশায়। শেষ কবিতাম্বয়ে, এই প্রত্যাশায়, কবির আবার যৌবনকে আহ্বান।

যৌবন-কবিতাটি রচিত হয় ৪ চৈত্র, ১৩২২। বৎসর শেষ হয়ে আসছে।

কবিতা বলাক কাব্য শুরু হয়েছে দুই বৎসর আগে। এবার তাকে শেষ করা দরকার, কবি মনে এই তাগিদ। কিন্তু যে- চলে, কবি যাকে নবযুগান্তরের আগমনী বেলে মনে করেছিলেন, তার পরিণতি সম্পর্কে সংশয়ে বি আক্রান্ত। তবুও গতি অনীকার্য। যে-পরিণতিই সম্ভাব্য হাোক-না-কেন, পথ যতই জটিল-কুটিল হোক কেন, যৌবন কখনও সুখের খাচায় বনী থাকতে পারে না। তাকে গতির প্রবাহে আত্মসমর্পণ করতেই হবে। ‘সবুজের অভিযান’ কবিতার বাণী এখানে তাই আবার ফিরে এসেছে ।

যৌবন রে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে?

তুই যে পারিস কাটাগাছের উচ্চ ডালের 'পরে

পুচ্ছ নাচাতে।

তুই পথহীন সাগর-পারের পান্থ,

তোর ডানা যে অশান্ত অক্লান্ত,

অজানা তোর বাসার সন্ধানে রে।

অবাধ যে তোর ধাওয়া;

ঝড়ের থেকে বকে নেয় কেড়ে

তোর যে দাবি-দাওয়া।

(১ম স্তবক)

মৃত্যু অবধারিত, গমন পথ কণ্টকাকী, যে প্রিয়তম গন্তব্যের জয় আমাদের আকাকা, তাকে পাওয়া হয়তো সম্ভব, তবে তার মুখে মরণ-অবঠন। এই ভণ্ঠন অপসারণ করলে তার সঙ্গে মিলন হয়তো হতে পারে। যৌবনই পারে সেই মৃত্যু অবগুণ্ঠন তুলে মানস-প্রিয়তমার মুখদর্শন করতে। কারণ সে তো আয়ুর ভিখারি নয়। রাতের পর দিন তো অবশ্যম্ভাবী। হয়তো প্রভাতের প্রাথমিক কুয়াশা দিনের আলোকের পূর্ণ অভিব্যক্তির পথে

বাধা। কিন্তু সুর্য-কিরণ তো সেই বাবাকেও অপসারিত করে। যৌবন তো তেমনি সূর্যসম। তাই যৌবনের কাছে কবির দাবি

খড়্গসম তোমার দীপ্ত শিখা

ছিন্ন করুক জরার কুজঝটিকা,

জীর্ণতারই বক্ষ দু-ফাক করে

এক অমর পুষ্প তব

আলোক-পানে লোকে লোকান্তরে

ফুটুক নিত্য নব।

(৪র্থ স্তবক)

যৌবনই নূতন পথের পথিক। সেপথ যত ক্রুর হোক না কেন। তাই তো যৌবনের অভ্যর্থনা সর্বত্র। তাই নবযুগের কবির অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যৌবনেরই জয়ধ্বনি

প্রভাত যে তার সোনার মুকুটখানি

তোমার তরে প্রত্যুষে দেয় আসি,

আগুন আছে উন্নশিখা জেলে

তোমার সে যে কবি।

সূর্য তোমার মুখে নয়ণ মেলে।

দেখে আপন ছবি।

ঘ। নববর্ষের আশীর্বাদ (৪৫ সংখ্যক)

ঝড়ের খেয়া কবিতায় নূতন উষার স্বর্ণবারের সম্ভাবনায় যাত্রা শুরু, কিন্তু সে-যাত্রা প্রলয়ের মধ্য দিয়ে, বহ্নিবাতরঙ্গের মধ্য দিয়ে, বিষশ্বাস-ঝটিকার মেঘের তলব দিয়ে,

ভূতলগগন মৃতিবিহ্বল-করা মরণের আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে। সে-কবিতা লেখা হয়েছিলো ২৩শে কার্তিক ১৩২২। ১৩২৩-এর নূতন বৎসরেও কবি যাত্রীদের কাছে যে-আশীর্বাদ নিয়ে এসেছেন তাও সমান প্রলয়চিহ্নিত, রুদ্রের ভৈরবগান ধ্বনিত, কালবৈশাখীর ঝন্বন্তনিত, শ্রবণ রাত্রির বজ্রনাদ লাঞ্ছিত। কোন্ গন্তব্য সম্মুখে, শুভ না অশুভ, জানা নেই। কিন্তু গমন-পথের নিদারুণ সম্পর্কে কোনো সংশয় নেই। এবং গমনপথের স্থান ও কাল-দৈর্ঘ্যও অন্তহীন। অতএব নূতন পধের বৈরাগ্যচিহ্নিত যাত্রায় একমাত্র সত্য গতিটুকু, পথচলাটুকু।

তেন ত্যজেন ভুঞ্জিতা,-ত্যগের দ্বারা ভোগ করো, পুরাতন বৎসরের জীর্ণ স্মৃতিমুক্ত হয়ে সব জীবন পথে যাত্রা শুরু হক। নূতন বৎসরের নবোদিত সূর্য কিরণের নবযাত্রার প্রেরণা পেয়ে তোমার চিত্তে সঞ্চারিত হোক। এই যাত্রায় কোথাও বন্ধ হয়ে বেও না। ছাড়তে ছাড়তে চলল। তবেই সারা পথের সনে তোমার একাত্মতা হবে। কিন্তু প্রতি ক্ষণে বা পথযাত্রার শেষে কোনো কল্যাণ (মানবিক দৃষ্টির সীমাবদ্ধতায়) আশা কোরো না। অকল্যাণ, ভৈরবের ভয়ঙ্কর সংগীত, বৈরাগীর সত্যাগের একতারা-স্যানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ দিগন্তে-হারিয়ে যাওয়া-পথের অনির্ণেতা তোমাকে টেনে নিয়ে বাক, এই আশীর্বাদ কবির যৌবনের কাছে

পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি।

ওই কেটে গেল ওরে যাত্রী।

তোমার পথের 'পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান

সুদ্রের ভৈরব গান।

দূর হতে দূরে

বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে,

যেন পথহারা

কোন বৈরাগীর একতারা।

মন্তব্য

(১ম স্তবক)

গতির মধ্যেই নবযুপযাত্রীর জন্মলাভ। যাযাবরের শিশুর মতো পথের ধুলোর উপরই তার বাল্যের লীলা। পথের ধুলাই যেন তার ধাত্রী-মাতা। চরৈবেতি চেতনা তার সত্তার পালক-মাতা। সে মাতা তার গভির ঘূর্ণাবর্ত-জল আঁচলের পাকে তাকে জড়িয়ে নিয়ে ধরিত্রীর বন্ধন থেকে মুক্ত কোরে এক দিগন্ত থেকে ভিন্নতর দিগন্তে নিয়ে যান। ঘরের মঙ্গলশ,-তার জন্যে , প্রেয়সীর চোখের জল বা তার সন্ধ্যায় জালিয়ে দেওয়া প্রদীপের আলোকের আকর্ষণ যেন তার যাত্রাপথের বাধা হয়ে না-দাড়ায়। (মনে পড়ে যায় পূর্বে উল্লেখিত ঝড়ের খেয়া কবিতার ৩৫-৪২ পঙক্তি) যত আপাত অশুভ ও ভয়ংকর, তাদের বাবাই যাত্রীর প্রেরণা, তার আস্তর শক্তির উদ্বোধক । কালবৈশাখীর ঝন্নাত ও শ্রবণরাত্রির যগর্জন ঐসব পান্থজনের সবা। কণ্টকবিদ্ধ-পদতল, গূঢ়ফনা-গুপ্তসর্প, অর্থাৎ বিষবর্ষী শত্রুর ঈর্ষাতিক্ত মিথ্যানিলা হবে যাত্রীর পথে এগিয়ে যাওয়ার বেগ সঞ্চারক

ওরে যাত্রী,

ধূসর পথের ধুলা সেই তোর ধাত্রী;

চলার অঞ্চলে তোরে ঘুর্ণাপাক বক্ষেতে আবরি

ধরার বন্ধন হতে নিয়ে যাক হরি

দিগন্তের পারে দিগন্তরে।

ঘরের মদলশ নহে তোর তরে,

মহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,

নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।

পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখির আশীর্বাদ

শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।

পথে পথে কণ্টকে অভ্যর্থনা,

পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা,

নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ -

এই তোর রুদ্রের প্রসাদ। (২য় স্তবক)

টেনিসনের Ulysses কবিতার কথা মনে পড়ে 'To strive, to seek, to find, and not to yield'। যারা অমৃতের অধিকার চায়, মৃত্যুকে অতিক্রম করতে চায়, তাদের সাধনা জীবনভোর – সংগ্রাম, অন্বেষণ, পাওয়ার প্রচেষ্টা এবং কখনও পরাজয় স্বীকার না-করা। তার জন্য সুখশয্যা নয়, প্রেয়সীর কণ্ঠবেষ্টনের আরাম নয়, বরের শান্তি নয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, বাধার মধ্য দিয়ে তার পসরণ। লক্ষ্মী নয়, অলক্ষ্মীর সে বরপ্রাপ্ত –

চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার –

সে তো নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,

নহে শান্তি, নহে সে আরাম।

মৃত্যু তোরে দিবে হানা,

দ্বারে দ্বারে পাবি মানা –

এই তোর নব বৎসরের আশীর্বাদ,

এই তোর রুদ্রের প্রসাদ। (৩য় স্তবক)

অমৃতের যে-আকাঙ্ক্ষা মানুষের চেতনায়, মৃত্যুকে জয় করবার যে আবেগ তার মানসে, তা সহজসাধ্য নয়। মৃত্যুর মূল্যেই অমৃতকে পেতে হয়, সে অমৃত দৈহিক বা আত্মিক যাই-হোকনা-কেন। অন্ততঃ মানুষ তেমনি কল্পনা করেছে, এবং তার জন্যে সাধনাও করেছে। বিষয়ে বিরাগী হয়ে ত্যাগ করেছে সব সম্পদ, হয়েছে পথের ভিক্ষুক। বার বার আঘাত ও পরাজয়, পরীক্ষা ও সংশোধন, সংগ্রাম ও সাধনা, আর তার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া, চিত্তে নিয়ে অন্তহীন আশা। মৃত্যু এবং বাধার মধ্য দিয়েই নববর্ষের এই আশীর্বাদ সাধকের সুপ্ত ক্ষমতাকে আগানোর জন্য, যাত্রীর যাত্রায় ক্লান্তিকে অতিক্রম

করবার জন্য। লক্ষ্মীকে পেলে যায় থেমে যায়, অসীই অসফলের চিত্তবেগ সারিত করে। এই অলক্ষ্মীর আপদ নবযুগ-যাত্রীর প্রতি নববর্ষের শুরুতে।

পুরাতন বৎসরের জন্য রাত্রি

ওই কেটে গেল ওরে যাত্রী।

এসেছে নিষ্ঠুর,

হোক রে দ্বারের বন্ধ দূর,

হোক রে মদের পাত্র চুর।

নাই বুঝি, নাই চিনি, নাই তারে জানি,

ধরে তার পাণি –

ধ্বনিয়া উঠুক তব হৃৎকম্পনে তার দীপ্ত বাণী । (শেষ স্তবক)

আরাম বিলাস ও ব্যসন-এর জীর্ণ রাত্রির অবসানের মধ্য দিয়ে পুরাতন বৎসর শেষ হয়ে এলো। নব জীবনের পথে যাওয়ার আহ্বান নিয়ে এসেছে নূতন যুগের অগ্রপথিক, ইতিহাস-বিধাতা। বিলাসের মদ্যপাত্র চূর্ণ হোক। অগ্রপথিকের হাত ধরে যাত্রা শুরু করতে হবে। নূতনের বাণীতে হৃদয় স্পন্দিত হয়ে উঠুক। পুরাতন ও জীর্ণতার আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে নূতন যুগের পথযাত্রা শুরু করার সময় হলো এই আশর্বাদ আজ কবিকণ্ঠ থেকে নবীনদের কাছে। অবশ্য এই নবীন যুগ অজানা। এবং এই যুগে শান্তি, অমৃতত্ব, ও প্রলয়শেষের-সদর্থক কোনো প্রাপ্তি আছে কিনা জানা নেই। ঝড়ের খেয়ার রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন এই প্রশ্নের উত্তরই যেন এখানে, ‘নাই বুঝি নাই চিনি, নাই তারে জানি, কিন্তু তবুও তারি হাত ধরে অগ্রসর হতে হবে, হৃদয়ের স্পন্দন (pulsation) তারি দীপ্ত বাণীতে আরো কম্পমান হয়ে উঠবে।

বলাকা কাব্যের শুরু এবং শেষ প্রায় একই রকম। শুরুতে (১-এ) নবীনদের আহ্বান ‘রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে, ঝড়ের মাল, বিজয়কেতন নেড়ে, অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে। সেই যে নবীনদের যাত্রা শুরু হয়েছিলো তা ববিদ্যা-তরঙ্গের মধ্য

দিয়ে প্রিয়-বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে মৃত্যু ভেদ করতে করতে যেখানে এসে পৌছুলো, বা যে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে তার যাত্রা এর পরেও, তাও ভৈরব সংগীতমন্ত্রিত, কালবৈশাখীর আর্তনাদ-মুখরিত, ভাবত্রিয় বনা-নিনাদিত, এবং অজানা, (৪৫-এ)। শুধু গতির বাণটুকু সত্য কিন্তু গন্তব্যের দিক নির্দেশ নেই। এই অনির্দেশ গতির মধ্যেই কাব্যের পরিসমাপ্তি।

এতক্ষণ আমরা যে কবিতাগুলি আলোচনা করলাম তার মূল বক্তব্য:

১. নবীনের প্রতি কবির আহ্বান পুরা মানসিকতা ও এ থেকে মুক্তি দেরি নয়।

২. যুদ্ধ ও বিপ্লবের মধ্যে অকুতোতর পদসঞ্চারের জন্য সকলকে আহ্বান।

৩. গন্তব্য অজানা। গন্তব্য নয়, গতিতেই মুক্তি, যদিও তা প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু ও প্রলয় চিহ্নিত।

৪.৩ হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনখানের কবিতা

ক। চঞ্চলা (৮ সংখ্যক)

বলাকা কাব্যে গতির কবিতা বেশ কিছু আছে, কিন্তু গতি-সর্বস্বতার কবিতা একমাত্র চঞ্চলা ও বলাকা। প্রথটিতে সম্পূর্ণতঃ বিজ্ঞানভিত্তিক গতি, যদিও শেষ পর্যন্ত কবির অমুকুলিক সত্যে তার পরিণতি। আর দ্বিতীয় কবিতা বলাকা একটি হঠাৎ সংঘটিত দৃষ্ঞকে অবলম্বন করে কবির গতিতঙ্কে উধাও হয়ে যাওয়া। দুটি কবিতাই অবস্তু শেষ পর্যন্ত কাব্যিক উপলব্ধি (Poetic revelation)তে পরিণত, তত্ত্বের চিন্তাধারা অতিক্রম কোরে। দুটি কবিতাই বিশেষ বা অভিজ্ঞতা ও দর্শন (observation) দ্বারা অনুপ্রাণিত। পরিণতিতে রচনায় দীপ্তি ও প্রতি মিলনে অপূর্ব কবিতায় উত্তীর্ণ।

দুটি কবিতা-সম্পর্কে কবি তার অভিজ্ঞতা অনুভব ও উপলবির কথা বলেছেন। কবিতায় ঠিকমতো বুঝবার জন্য কবির সেই বক্তব্য অপরিসীম সহায়তাকারী। কবির নিজস্ব উক্তিতে যাওয়ার আগে কবিতায়ে যে বিশ্ববিজ্ঞানতত্ব (Cosmo logical theory) প্রকাশিত তার বিষয়ে কিছু বলে নেবো।

বিশ্বের উদ্ভব সম্পর্কে একাধিক আছে। তার মধ্যে Big Bang Theory অন্যতম। এই তত্ত্ব অনুসারে সীমাহীন সুদূর অতীতকালে, নবীন্দ্রনাথের ভাষায় সংখ্যাগণনার অতীত প্রত্যুষে, একটি বিরাট বিস্ফোরণ হয়েছিলো। সেই বিশ্ব সৃষ্টির শুরু। বিশ্ব একটি বুদবুদ বা বেলুনের মতো। এবং প্রাথমিক বিক্ষোণের পর তা সম্প্রসারিত হতে শুরু করে চতুর্দিকে। বিপুল গতিতে। বিশ্বের দেশের (space) মধ্যে ছড়িয়ে আছে বস্তুকণা (matter particles)। আতিতে দেশে ছিলাে শুধু নীহারিকাপুঞ্জ (Nebulac)। এটি সূক্ষ বস্তুকণাসমুদয়ের গ্যাসীয় অবস্থা। আকাশের বিশাল বিশাল বিরাট অঞ্চল ব্যাপ্ত কোরে এদের অবস্থান। খুবই লঘু ঘনত্বের (lower density) পদার্থ। এই লঘু ঘনত্বেরও আবার পরিমাণগত পার্থক্য আছে। একটি মতে বলে, নীহারিকার অভ্যন্তরস্থ বস্তুকণা জমাট বেঁধে সৃষ্টি করে নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি। বিপুল ভাবে ৩৪ বস্তুকণা, চতুর্দিকে সম্প্রসারণশল বিশ্বের বিপুল গতিম ফলে, ঘূর্ণিত হতে থাকে। ফলত: তা ক্রমশ: তাপ হারায় ও জমাট বাঁধতে থাকে। তার থেকে জন্ম হয় নক্ষত্রের এবং তাকে কেন্দ্রে রেবে একাধিক বস্তুকণা-রচিত বলয়ের। কালক্রমে ঐ বলয় ভেঙে তৈরি হয় গ্রহ এবং উপগ্রহ। একে বলে Nebular hypothesis। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে বিশ্ববিবর্তনের যে অনুভব তা Nebular hypothesis-এর কাছাকাছি যায়। আর দ্বিতীয়ত: বিপুল গতিতে বিশ্বের যে-সম্প্রসারণ, তার ফলে বিশ্বের অভ্যন্তরস্থ নক্ষত্র সমূদয়ও বিপুল বেগে দূরে সরে সরে যাচ্ছে। কবির উপলব্ধিতে এই গতিময়তাও ধরা পড়েছে। আমরা স্থান বা space-এর এই বিপুল সম্প্রসারণ গতি অনুভব করতে পারি না। আমরা অর্থে এখানে তার মধ্যে বৈজ্ঞানিকেরাও যুক্ত। এই গতির ধারণা করা হয় নক্ষত্রদের বিপুল বেগে, বৈজ্ঞানিকের বীক্ষণাগারে। কবিতাটিতে এই বিশ্ববিবর্তনগত বা জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানগত তত্ব ছাড়াও রয়েছে কবির ভৌগোলিক এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানগত অনুভব। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর যে বার্ষিক গতি, এবং কক্ষপথে হেলে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তন, তার ফলে কখনো সে গ্রহণ করে সূর্যের প্রচণ্ড তাপ, কখনো সেই তাপ ক্রমহ্রাস হয়ে পৃথিবীকে শীতল করতে থাকে। এর ফলে ঋতু পরিবর্তন, এবং ঋতুপরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর উদ্ভিদ জগতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পুষ্পের আবির্ভাব। কবি এই গতি যেমন বহির্জগতে অনুভব করেছেন, তেমন নিজের অন্তরেও।

কবিতা আলোচনায় তা পরিস্ফুট যাবে। কিন্তু সে-আলোচনায় যাওয়ার আগে কবিতা রচিত হওয়ার পিছনে কবর যে অভিজ্ঞতা এবং অনুভব তার পরিচয় নেওয়া যাক। এলাহাবাদের এক পৌষমাসের প্রচণ্ড শীতের রাত্রি । কবি ছাদে বসে আকাশ-দর্শন করছেন। কবির কথায়, "ছাদে বসে আছি। সূর্যাস্তের শেষ আভাটুকু মিলিয়ে গেল। চারিদিক অন্ধকার হয়ে এল। তারপর আকাশের অন্ধকার পটে পুঞ্জ পুঞ্জ তারা ফুটে উঠল।••• চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ । আমার মন যেন অসীমের অপূর্ব পরশ পেয়ে রসের গভীরতায় একেবারে - ডুবে গেল। আকাশব্যাপী অন্ধকার মনে হল যেন অদৃশ্য সৃষ্টিকার, যার বেগ , অবোধ্য। এই দৃশ্য নক্ষত্রতারার পুঙ্গুলিকে মনে হল সেই বিরাট সৃষ্টিধারার - উপরকার ফেনপুঞ্জ।

পদ্মাতে স্রোতের এই লীলাটি দেখে আমি অসীম অনন্তের এই রহস্য বুঝি। দেখতাম পদ্মার অবোধ্য বারিধারা ক্রমাগত চলেছে, তার বেগের একটু আধটু অনুমান করা যাচ্ছে, তার উপরকার ফেনা দেখে। সেই ফেনাও পদ্মারই বেগে সৃষ্ট। আকাশের এই তারা-পুঞ্জের ফেনাগুলিও হয়তো সৃষ্টির বেগেই প্রকাশমান। এদের দিয়েই অদৃশ্য বিরাট বিশ্বধারার পরিচয়।•••"

সেই গতি কি শুধু দৃশ্যমান পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্রে। তা নয়। কখনোই নয়। বিশ্বের গতির পরিচয় আমরা কি জানি? সেই গতি চলেছে সর্ব চরাচর সব অদৃশ্য বিশ্বকে ভরে নিয়ে। তাকে কালই বলআর যাই-ই, সর্ব চরাচর ডরেই সেই অদৃশ্য গতিবেগ। দৃশ্য জগৎ কতটুকু? সদা-সচল বিরাট অদৃশ্য বেগপ্রবাহের উপরে তা শুধু একটুখানি ফেনার মতই ভেসে চলেছে। ঐটুকু দৃশ্য ফেনামাত্র দিয়ে আমরা তার ওলায় চলমান অগাধ অদৃশবাবিধারার একটু সূচনা পাই মাত্র ।চলেছে যে অসীম চরাচর তার সন্ধান পাই না, আমরা দেখি তার উপর। ফেন পুঞ্জের গতিটুকু । তার ভয় যে অগাধ অগীম গতি রয়েছে সেটা শুধু ধ্যানযোগে উপলব্ধি করতে হয়।

প্রাণের অসীম জগতেও চলেছে ঘূর্ণায়মান চক্রমালা। কুঁড়ি হতে ফুল, ফুল হতে ফল, ফল হতে বীজ, বীজ হতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হতে বনস্পতি-এক অবোধ্য বিরাট ধারা সদাই প্রাণবেগে প্রবহমান। আমার শরীরে আমার সঙ্গে আমার শিরায় শিরায় অণু-পরমাণুতে

বিশ্বব্যাপী এই প্রাণতরঙ্গ-মালা চলেছ।•••বিশ্বের প্রচণ্ড গতির তালেই আমার মধ্যে প্রচণ্ড গতিবেগ নিরন্তর চলছে।•••আমার চারদিকে দূরাৎ সুদূর বিরাট জগতে যেমন নিরন্তর গতি, আমার ভিতরেও দেহের অণু-পরমাণুতে তেমন নিরন্তর অদৃশ্য গতি। কী বিরাট এই সৃষ্টি-প্রবাহ।•••সূর্যচন্দ্র তাতে তার উপরকার একটুখানি মাত্র আভাস দেখা যাচ্ছে।•••আবার আমাদের জনমে মরণে উত্থানে পতনে আমাদের ইতিহাসের সেই অতল অপার অদৃশ্য প্রণধারার উপরকার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাই। সবই সেই সৃষ্টির উপরকার একটুখানি ফেনা।

হে বিরাট নদী,

অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল

অবিচ্ছিন্ন অবিরল

চলে নিরবধি। (১ম পঙক্তি)

‘কাজেই এই কবিতাটি একটি মাত্র নয়, এ আমার আনন্দরূপ।

এবার কবিতাটির আলোচনায় প্রবেশ করা যাক। কবিতাটির দুটি ভাগ। শুরু থেকে, অর্থাৎ হে ‘বিরাট নদী' থেকে পঙক্তির শেষ, অর্থাৎ ‘নিঃশেষ নির্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন' পর্যন্ত একটি ভাগ। এটিকে বলা যায় কবির বিধ বীক্ষণের মানস অনুভব ও তার কাব্যিক প্রকাশ। বাকি অংশ, অর্থাৎ 'ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা’ থেকে ‘অতল আধারে-অকূপ আলোতে, অর্থাৎ ৬৫ পঙক্তি থেকে শেষ পর্যন্ত কবিতাটির দ্বিতীয় অংশ। এটিতে বিশ্ববীক্ষণকে কবির নিজ চেতনায় আত্মীকরণ, ও তাকে বোধিতে রূপান্তর। | প্রথমে প্রথম ভাগের আলোচনা। গতিতত্ব প্রসঙ্গে বলেছি, আলোচ্য কবিতায় স্থানের (space continuum) ত্রিমাত্রা (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ), এবং কালের (the time eternal) একমাত্র দ্বারা অনুষ্যত চতুর্মাত্রিক বিশ্বজগৎ নদী-প্রতীকে পরিণত। এই নদী বিরাট, বিপুল ; তার প্রবাহ অদৃশ্য, নিঃশব্দ, অবিরল, অর্থাৎ শান্তিহীন এবং নিত্য। কবি নদীর সঙ্গে এই বিশ্ব-প্রবাহের তুলনা করেছেন এর গতিময়তাকে বোঝানোর জন্য। বস্তুতপক্ষে নদীর সঙ্গে এর তুলনা হয় না। কায় নদীর প্রস্থ আছে এবং গন্তব্য রূপে

সমুদ্র আছে। কিন্তু বিশ্ব স্থানে ও কালে অসীম ও অনন্ত। নদীর জলপ্রবাহ, তার মৃত্তিকাময় তীরভূমি, নদীর উপরিস্থিত আকাশ, জলপ্রবাহের নিম্নস্থ বাদ সবই ভিন্ন, রূপে এবং প্রকৃতিতে। কিন্তু বিশ্বপ্রবাহে সব একাকার। কোনো কিছু আলাদা কোরে বেছে নেওয়া যায় না। এবং সবই অধীনে প্রসারিত। কবি নদীর আর সবকিছুকে গণনার বাইরে রেখে শুধু তার গতিময়তাটুকুকে ধরতে চেয়েছেন। সর্ব পরিচ্ছিন্ন এই গতিময়তার ধারণা করা কঠিন। যার পক্ষে এই ধারণা করা কঠিন নয়, তার পক্ষে নদী-প্রতীকের যাথার্থ্য দুর্বোধ্য নয়। এই গতিময় বিশ্বপ্রবাহের বিশিষ্টতা

স্পন্দনে শিহরে শূন্য তবু ক্ষুদ্র কায়াহীন বেগে;

বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে

পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনা উঠে জেগে;

আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে

ধাবমান অঙ্গকার হতে;

ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে

স্তরে স্তরে

সূর্য চন্দ্র তারা যত

বুদবুদের মতো। (৫-১৩ পঙক্তি)

কবিতাপাঠ এই বিশ্বপ্রবাহ অদৃশ্য, নিঃশব্দ। অথচ শূন্য আকাশ (মহাকাশ, Continuum, যার কোনো রূপ নেই, আকার নেই, আলো নেই, বর্ণ নেই। নক্ষত্রের আলোক ছাড়া যাকে বলা যায় বিপুল ও বিরাট দিক-কাল প্রসারিত অনন্ত অন্ধকার) এই বিশ্বপ্রবাহের কায়াহীন প্রচণ্ড বেগে কম্পমান। এখানে যদিও মহাকাশ ও বিশ্বপ্রবাহকে দুটি আলাদা পত্তাকুণে ধারণায় আনার চেষ্টা হয়েছে, প্রকৃত পক্ষে এই দুই-ই একাকার, ওতপ্রোত।

নদীর তরঙ্গসমূহের পারস্পরিক সংঘর্ষে যেমন ফেনশি উদ্ভূত হয়, উত্থিত হয় বুদবুদ, তেমনি গতিশীল বিশ্বপ্রবাহের অন্তর্গত সূক্ষ্মবস্তুকণাগুলি বা শক্তিকণাগুলির (ফোটন, যা একই সঙ্গে particle এবং wave, বস্তুধর্মী এবং তরকামী) পারস্পরিক সংঘাতে, সংঘর্ষে ক্রমশীতলতা-প্রাপ্তিতে ও জমাট বেঁধে যাওয়ায় সৃষ্ট হয় বিপুল বস্তুপুরে, - নীহারিকা, নক্ষত্র গ্রহ-উপগ্রহের ; অসুবিধের মত দেখা দেয় চন্দ্র তারা যত, এবং বিশ্বপ্রবাহের ঘূর্ণাবর্তে তারা হয় ঘূর্ণমান। যে-বিষ ছিলো বিপুল জমাট অন্তহীন অন্ধকার, নক্ষত্রের আবির্ভাবে তা মাঝে মাঝে তীব্র আলোকচ্ছটায় বিকীর্ণ হয়। নক্ষত্রের চারিপাশে যখন সৌর-পরিবার গোড়ে ওঠে গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টিতে, তখন সেখানে নানা বর্ণের লীলা। নক্ষত্রের একই আলো সাতটি রঙে (VIBGYOR), এবং তার অন্তর্গত বিভিন্ন উপঙে ভেঙে গিয়ে বিচিত্র বর্ণে জড় জগৎ, প্রাণী জগৎ, এবং উদ্ভিদ জগৎকে রাঙিয়ে তোলে। বায়ুমণ্ডলের (atmosphere) সৃষ্টি হলে আকাশে খেলে বিচিত্র বর্ণ (বর্ণান অনেকা), নেবে মেদে বর্ণের সমারোহ। পত্রে পুষ্পে, বিচিত্র পশু পক্ষী মানুষে কী বর্ণলীলা শুরু হয়। একেই কবি অনুভব করেছেন, 'আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠ বর্ণস্রোতে ধাবমান অন্ধকার হতে' বাক্যে।

এর পরেই কবি বললেন,

হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী,

চলেছ যে নিদেশ সেই চল তোমার রাগিণী,

শব্দহীন সুর।

অন্তহীন দূর

তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া?

সর্বনাশা প্রেম তার, নিত্য তাই তুমি ঘর ছাড়া। (১৪-১৯)

এই বিশ্বগতিকে কবি কল্পনা করেছেন প্রিয়তমের দিকে অভিসারিকা নারীর চিত্রকল্পে। তার প্রিয়তম 'অন্তহীন দুয়'–এই ভাবসত্তা। এই প্রিয়তমের ডাক অলভ্য। নারী

প্রতীকায়িত এই গতির চিত্তে সর্বদাই ডাক পাঠাচ্ছে ‘অন্তহীন দূর’ নামক প্রেমিক । এ যেন শ্রাধিকার কাছে কালিন্দী নদী-কূল থেকে ভেসে আসা ঐক?-র বাশির আহবান। কৃষ্ণের বাঁশির ডাকে ঐরাধিকার কাছে সমাজ সংসার সব মিথ্যা হয়ে যায়, তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন অনির্দেশ্যের দিকে। এই রাধিকার অভিসারের চিত্রকল্পে রচিত ‘গতি’-এমীর অভিসার । অন্তহীন দুরের সঙ্গে মিলবার আশায় তিনি সর্বরিক্ত ভৈরবী, সংসারের বা জগতের সকল আকর্ষণকে যিনি পরিত্যাগ করেছেন একটি মাত্র তীব্র অতিতে-সে তার প্রিয় মিলনের আতি। এবং তিনি বৈরাণী ! কোনো আসক্তিই নেই তার। তাই কোথাও তিনি বাঁধা পড়ছেন না। কোন্ সুদূর প্রাচীন কালে, সংখ্যাগণনার অতীত প্রত্যুষে তার এই যাত্রাশুরু অনির্দেশ ‘অন্তহীন দুরের অভিসারে। যেহেতু এই দুর অন্তহীন, তাই তাঁর দিকে শুধু গমনই আছে, কোনো দিন পৌছনো নেই। গতির বিপুলভ উন্মত্ত অভিসারের চঞ্চলতায় সেই গতি-সর্বস্বতাময়ীর -

বক্ষোহারে

ঘন বন লাগে দোলা- ছড়ায় অমনি

নক্ষত্রের মণি।

আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুলে;

এই বিশ্ব-প্রবাহ দুহাতে তার সকল ঐশ্বর্য ছড়াতে ছড়াতে চলেছে, সবই সে ক্ষর কোরে ফেলছে, তার জন্য তার ক্ষোভ, শোক, ভয় কিছুই নেই। চলার বিপুল আনলে সে তার সকল পাথেয়, সব সম্পদ ক্ষয় করে চলেছে

শুধু ধাও, শুধু বাও, শুধু বেগে ধাও

উদ্দাম উধাও;

ফিরে নাহি চাও,

যা-কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।

কুড়ায়ে লও না কিছু করো না সঞ্চয়;

নাই শোক নাই ভয়,

পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় করে ক্ষয়।

প্রসঙ্গতঃ উপরে উক্ত কবিতা-পঙক্তির মধ্য দিয়ে আর-একট সমকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে। কবি সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কি-না, কিংবা এ ওর মনীষী-মানসের বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞা ছিল না। বিশ্ব-ধ্বংসের যে একাধিক প্রকল্প (hypothesis) আছে, এটি তার মধ্যে অন্যতম।

এই প্রকল্প অনুসারে বিশ্বের সকল বস্তু (matter) শক্তি বিকীর্ণ করছে। যদিও বলা হয় বস্তু শক্তিতে এবং শক্তি বস্তুতে পরিণত হতে পারে, কিন্তু বিশ্বজাগতিক ক্ষেত্রে স্বতঃই শক্তির আর বস্তুতে রূপান্তর ঘটছে না, পক্ষান্তরে বস্তু শক্তিতে পরিণত হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। এরই সঙ্গে ঐক্য অনুভব করা যায় কবি যখন বলেন, 'যা-কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও', বা কুড়ায়ে : লও না কিছু করো না সঞ্চয়।' এই ভাবে যখন সমস্ত বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে, তখনি আসবে বিশ্বের অন্তিম অবস্থা বা প্রলয়। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায়। একে বলা হয়েছে entropy doom।

বিশ্বজগতের কাছ থেকে সব শক্তিকণা স্থানে এবং কালে (space এবং time-এ) ছড়িয়ে যাচ্ছে, এই বিশ্বের অন্তিম পরিণতির দিকে। যেমন কম-জীর্ণত জীবকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি বস্তুর ক্রমশ: শক্তিতে রূপান্তর বিশ্বের প্রলয় পরিণতির ভূমিকা। বিশ্বজগৎ দুই হাতে তার শক্তি ছড়াতে ছড়াতে চলেছে, এরই ফলে তার ধ্বংসের অনিবার্যতা সত্ত্বেও। তার এর জন্য শোকও নেই, তয়ও নেই। চলবার আনন্দবেগে সে অবাধে তার সকল পাথেয়, সকল ঐশ্বর্য ক্ষয় করছে। প্রসঙ্গত: মনে পড়ে পরবর্তী কালে রচিত কবির শিশু ভোলানাথ কাব্যের নাম কবিতাটি –

ওরে মোর শিশু ভোলানাথ,

তুলি দুই হাত

যেখানে করিস পদপাত,

বিষম তাণ্ডবে তোর লও তত হয়ে যায় সব;

আপন বিভব ।

আপনি করিস নষ্ট হেলাভরে;

প্রলয়ের ঘূর্ণ-চক্র-'পরে

চূর্ণ খেলেনার ধুলি উড়ে দিকে দিকে;

আপন সৃষ্টিকে

ধ্বংস হতে ধ্বংস মাঝে মুক্তি দিস অনর্গল

খেলারে করিস রক্ষা ছিন্ন করি খেলেনা শৃঙ্খল ।

গতির জন্যই নদী নির্মল। নদীর অবিচ্ছিন্ন ধারা গতির প্রবণতায় সব আবর্জনা সরিয়ে দেয়। নদীর মতোই বিশ্ব তার নিত্যবহমান বিশাল বিপুল ছেদহান প্রবহমানতার দ্বারা বিশ্বকে সচল সঞ্জীবিত ও আবর্জনা রাখে। সঞ্চয়ের অচল বিকারে তা রুদ্ধ হয়ে যায় না। সকল আবর্জনামুক্ত পথে তার অবাধ পূর্ণ নির্মল রূপ প্রকাশ পায়। যখন বিশ্বপ্রবাহ সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ, সর্বাপেক্ষা নিঃস্ব । বিশ্বগতিময়ীর চরণস্পর্শে মৃত্যু; জীর্ণতার অবসানও। নবীন প্রাণের আবির্ভাবের আর স্থান বা অবকাশ থাকতো না

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,

তুমি তাই

পবিত্র সদাই।

তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি

মলিনতা যায় ভুলি।

পলকে পলকে –

মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে। (৩৯-৪৬ পঙক্তি)

আজ যদি এই বিশ্বপ্রবাহ এক মুহূর্তের জন্যও স্তব্ধ হয়ে যায় তাহলে বস্তুর আর শক্তিতে রূপান্তর হবে না। ক্রিয়া (work-এর জন্য যে-শক্তি (energy) দরকার, তা আর পাওয়া যাবে না। [energy বা শক্তির সংজ্ঞা, The power by which any thing acts effectively to move or change other things or accomplish any result. (S.D.)] অর্থাৎ তখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নেই, নক্ষত্র বা সুর্যের আলোক-বিকিরণ নেই, তখন সমস্ত মহাজাগতিক গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র গতি হীন, ফলতঃ দেশ ও কাল স্থির, প্রাণীর সকল কাজ স্তক, কিন্তু তার মৃত্যুও নেই।

কবিতাটির বিশ্বদর্শন কবিকে দুই ভাবে অনুপ্রাণিত করেছে বিশ্বদর্শন-উত্থিত চেতনাকে আত্মীকরণ করতে। একদিকে কবির স্বকীয় প্রাচীনসত্তার গতিময়তা প্রমুভব, এবং অপরদিকে সেই গতিকে অনুভব কোরে কবির ভবিষ্যৎ জীবনকে সঞ্চয়ের আবর্জনা থেকে মুক্ত কোরে বিপুল বিশ্ব প্রবাহের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার আকৃতি। এই দুই প্রেরণা কবির বিশ্বদর্শন থেকে আহত।

কবি সেদিন রাত্রে বিশ্বপ্রবাহকে শুধু বাইরের বিশ্বব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যেই অনুভব করেননি, প্রাণের অসীম জগতেও তাকে অনুভব করেছিলেন। জলে ঢিল ফেললে যে একের পর এক তরঙ্গমালা উত্থিত হয়, প্রাণের গেতেও তার স্পন্দন ওঠে। বিশ্বের অন্তরস্থ স্পন্দন যেমন প্রাণের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধ্যক্ত, তেমনি আবার ব্যষ্টির জীবনের নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়েও ব্যক্ত। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাস থেকে এককোষী এ্যামিবা, এককোষী এ্যামিবা থেকে বহু কোষী কৃমি, তার থেকে ক্রমবিবর্তনের নানা পর্যায়-ছাড়িয়ে মেরুদণ্ডী মৎস্য, মৎস্য থেকে উভচর, তা থেকে সরীসৃণ, সরীসৃপ থেকে দুটি শাখার একদিকে পাখি, এবং অপর শাখায় স্তন্যপায়ী, স্তন্যপায়ী থেকে ক্রমশঃ বানরব। প্রথমে এনথেপিয়েড এপ (চার পায়ে চলা বানর), তার থেকে ক্রমশঃ পিথেকানথে পিস ইরেক্টাস (Pithecanthropus crectus, বা সোজা হয়ে দাড়ানো প্রাক্-শ্য প্রাণী), এবং তার থেকে আবার ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এলো মানুষ ।এই যে ধারা এও বিশ্বপ্রবাহের গতিময়তার প্রকাশ । আবার ব্যষ্টি বা individual-এর ক্ষেত্রে উদ্ভিদ জগতে কুঁড়ি থেকে ফুল, ফুল থেকে ফল, ফল থেকে

বীজ, বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে বনস্পতি, বা উর্বতন, প্রাণীর ক্ষেত্রে, মাতৃগর্ভে পিতার শুক্র দ্বারা নিষিক্ত ডিম্ব, তার থেকে মাতৃগর্ভস্থ শিশুর কম পরিণতি, তার থেকে ভূমিষ্ঠ শিশু, শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবক যুবকী, তাদের মধ্যে শুক্র ও ডিম্বের জন্ম, পরে শুক্রদ্বারা ডিম্বনিষিক্তকরণ, এবং তার থেকে আবার নবজাতক। এই বিশাল বিরাট প্রাণধারা। বিশ্বপ্রবাহেরই তরঙ্গ-স্পন্দন। কবি অনুভব করেছেন, তাঁর শরীরে তাঁর সর্বাদে শিরায় শিরার অণুপরমাণুতে বিশ্বব্যাপী এই প্রাণতরঙ্গমালার স্পন্দন।

শুধু এই নয়। প্রাণ-জগতে যে-প্রাণী যে-বিশিষ্টতা অর্জন করেছে সেগুলি অবার শরীর কোষস্থ 'জিন'-এ সঞ্চারিত করে দিচ্ছে এই প্রাণ-তরঙ্গের লীলা। 'যৌনকোষের জিনের মধ্য দিয়ে তা চলে যাচ্ছে তার সন্তানে। বিবর্তন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা আবার নব বিবর্তিত প্রাণীতে। অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বিবর্তিত মানুষের জিনে সমস্ত প্রাণজগতের বিশিষ্টতা আত্মগোপন করে আছে, ঘুমিয়ে আছে, dormant হয়ে আছে। প্রাণী যখন প্রথম সমুদ্রে দেখা দিয়েছে, তারপর প্রাচীন অণ্যময় স্থলভূমিতে উঠে এসেছে, তখন থেকে এই প্রকৃতি জগতের সকল ছাপ তার জিনে পড়েছে এবং তা ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ পর্যন্ত সঞ্চারিত। কবি-চেতনায় তা আজ রক্তে সমুদ্রের ঢেউ-এর নাচন বা অরণ্যের ব্যাকুলতা রূপে অনুভূত। কোনো দিন সেগুলিই আবার প্রত্যাবর্তন-প্রবণ (recessive) হতে পারে, এবং তার থেকে প্রকাশশীল (expressive)।

'আমার চলার মধ্যেও বিগতির সার্থকতা রয়েছে। আমি একক নই। আমার সঙ্গী দোসর আছে। তাদের সাথে সাথে চলাতেই আমার চলার আনন্দ। আবার আমার গতি ও বিকাশের আনন্দেই প্রকৃতি-পুষ্প-পল্লব, চন্দ্র-সূর্য-তারা উজ্জ্বল ও পরিপূর্ণ। আমার বিকাশের সঙ্গে যোগেই বিশ্ব এত সুন্দর, এত মনোরম। আমার চলার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিরাট ইচ্ছার যোগ রয়েছে বলেই আমার প্রত্যেক পদক্ষেপে এত আনন্দ। এবং এই জন্যই কবির অনুভব

ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা

ঝংকারমুখরা এই ভুবনমেখলা

অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।

খ। বলাকা (৩৬ সংখ্যক)

চঞ্চলা কবিতায় কবির প্রথম ছিল ব্যক্তিগত বিশ্ববীক্ষণ। তারপর সেই বিশ্ব বীক্ষণকে অনুভূতিতে রূপান্তর। এবং তার থেকে একটি সামগ্রিক বিশ্বপটভূমিতে নিজেকে মিলিয়ে নিয়ে অনুভব ।(আর বলাকা কবিতায় একটি ক্ষণিক অভিজ্ঞতার আলোকে জগতের নব উদ্ভাস।এ যেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে নব বিশ্বসৃষ্টি।

যে-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলাকা কবিতাটি রচিত সে প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, ‘এই কবিতা শ্রনগরে থাকতে লিখি। তখন আমি সেখানে ঝিলম নদীতে বোটে থাকতুম। একদিন সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে ঝিলমের জলে অন্ধকার নেমে আসছে। আমি ছাদে বসে আছি। ওপারে অন্ধকার জমাট হয়ে আসছে, নদীর স্রোত কালো হয়ে গেছে, চারিদিকে কোনো শখ নেই। এমন সময় বুনো হাঁসের দল হঠাৎ মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। পদ্মাবগে বাসকালে আকাশে হাসের পাখার ঝাপট অনেকবার অট্টহাস্যের মত হা হা করে চমক লাগিয়ে দিয়েছে।

বলাকা বইটার নামকরণের মধ্যেও এই কবিতায় মর্মগত ভাবটা নিহিত আছে। সেদিন যে এক বুন হাঁসের পাখা সঞ্চালিত হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে স্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়েছিল, কেবল এই ব্যাপারই আমার কাছে একমাত্র উপলব্ধি বিষয় ছিল না। কিন্তু বলাকার পাখা যে নিখিলের বাণীকে জাগিয়ে দিয়েছিল, তাই কবিতাগুলির মধ্যে নানা আকারে ব্যক্ত হয়েছে। বলাকা নামের মধ্যে এই ভাব আছে যে, বুনো হাসের দল নীড় বেঁধেছে, ডিম পেড়েছে, তাদের ছানা হয়েছে, সংসার পাত হয়েছে এমন সময় তারা কিসের আবেগে অভিভূত হয়ে পরিচিত বাসা ছেড়ে পথহীন সমুদ্রের উপর নিয়ে কোন সিন্ধুতীরে আর এক বাসায় দিকে উড়ে চলেছে। | ‘সেদিন সন্ধ্যার আকাশপথে যাত্রী হংসবলাকা আমার মনে এই ভাব জাগিয়ে ছিল-এই নদী, বন, পৃথিবী, বসুরার মানুষ

সকলে এক জায়গায় চলেছে। তাদের কোথা থেকে শুরু কোথায় শেষ, তা জানি নে। আকাশে তারার প্রবাহের মতো, সৌর জগতের গ্রহ উপগ্রহের ছুটে চলার মতে, এই বিশ্বে কোন্ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে প্রতি মুহূর্তে কত মাইল বেগে ছুটে চলেছে। কেন তাদের এই ছুটা ছুটি তা জানিনে। কিন্তু ধাবমান নক্ষত্রের মত তাদের একমাত্র এই বাণী –'এখানে নয়, এখানে নয়'।

দ্রুতি ও দীপ্তি, কাব্যিক চিত্রকল্পের সঙ্গে একাত্মতা এবং জীবনের নব উপলব্ধির উদ্ভাস, এই দুইয়ের মিলনে সার্থক কবিতা। আলোচ্য কবিতাটিতে তত্ত্ব প্রথম থেকেই, কিন্তু সেই তত্ব কি রূপ পরিহার কোরে চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনায় দ্রুতি, ও জগতের নবতাৎপর্যের দীপ্তি সঞ্চারিত করতে পেরেছে। ফলে এটি হয়েছে একটি সার্থক কবিতা। তত্ত্ব এবং কাব্যিক সৌন্দর্যের এমুন মেল বন্ধন রবীন্দ্রনাথের বাইরে দুর্লভ।

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা

আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে-ঢাকা

বাঁকা তলোয়ার;

দিনের ভাটার শেষে রাত্রির জোয়ার

এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে;

অন্ধকার গিরিতটতলে

দেওদার তরু সারে সারে;

মনে হল, সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,

বলিতে না পারে স্পষ্ট করি -

অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে মরছে গুমরি।

প্রথমেই একটি অপূর্ব চিত্রকল্প। কবি রয়েছেন ঝিলম নদীর একটি বাকের (turning-এর) উপরে। অপরাহ্নে রক্তিম আলোয় ঝিকমিক-কর। এই বাঁকা নদীটি যেন বিরাট

একটি বাকা তলোয়ার। এতক্ষণ সেটি কোষমুক্ত ছিলো! ঝক মক করছিলো দিনের আলোয়। ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো। যেন মনে হলো, খাপে ঢাকা পড়লো মুক্ত তরবারিটি। অন্ধকারের শুরুতে তরবারিটি শুধু কোষবদ্ধ হয়, কিন্তু তার পরেই যেন ভরা-কোটালের জোয়ারের মতো রাত্রির অন্ধকার ঝাপিয়ে পড়ে পৃথিবীর উপর। দিন যেন ছিলো ভাটার নদী, রাত তার বিপুল অন্ধকারের বন্যায় দিনকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। রাতের সেই অন্ধকার। তরদের সঙ্গে মিশে চলে এলো সংখ্যাতীত তারকা। এগুলি যেন বিপুল ব্যাপ্ত অন্ধকারের তরঙ্গে ভেসে-আসা তারাফুল।

এই বিপুল অন্ধকারের পটভূমিতে কবি একটি আবছায়াচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন করেছেন ভিন্নতর দৃশ্যের মধ্য দিয়ে। এবং সে-দৃশ্যও অপূর্ব ব্যঞ্জনাবহ! অন্ধকার গিরিতটে সারি সারি দেওদার তরু। দীর্ঘ কাণ্ড, উন্নতশীর্ষ । স্তব্ধ, অন্ধকারে অতিব্যক্ত। যেন অর্ধ-অবগুণ্ঠিত প্রকৃতির অর্ধস্ফুট বাক্য উচ্চারণ। সব কথা স্পষ্ট কোরে বলতে না-পারার অক্ষমতায় ঈষৎব্যক্ত ধ্বনিপুরে বেদনার্ত গুমরানি। আকাশের তারাগুলি তারাফুল। তাদের ঝিকমিকানির মধ্যে যেন অনতিস্ফুট দু-একটি শব্দ-দ্যুতি। আকাশের নিচে দিকব্যাপ্ত অন্ধকারে পত্রবহুল দেওদার তরু সূচিমুখ পরও যেন পুঞ্জিত নীরবতা। তবুও তারাফুলের শব্দ তাদের অনুপ্রাণিত করছে চারিপাশের নীরবতার মধ্যে কিছু বাণী সঞ্চার করতে, communicate করতে।

সহসা শুনি সেই ক্ষণে।

সন্ধ্যার গগনে

শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে

মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দুরান্তরে।

হে হংস-বলাকা,

ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত তোমাদের পাখা

রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে

বিস্ময়ের জাগরণ রহিয়া চলিল আকাশে। (২য় স্তবক)

এও আর-একটি আশ্চর্য চিত্রকল্প। উপরে বিশ্বব্যাপ্ত অনন্ত অন্ধকার আকাশ, সেখানে সংখ্যাতীত তারকার ঝিকিমিকি-দীপ্তি। আর নিচে অন্ধকার গিনিতটতল, ঝিলমের কালোজলে তারাদের প্রতিবিম্ব যেন দিবারাত্রির তরঙ্গভঙ্গে ভাসিয়ে । দেওয়া ফুলের মালা, অন্ধকারের আচ্ছন্নতায় সারি সারি পাইনগাছ, যেন স্বপ্নের আবরণে সৃষ্টির অস্ফুট বাক্য উচ্চারণের ব্যর্থ চেষ্টার বেদনাভাস! এমন সময় হঠাৎ একক পঙক্তিবদ্ধ হংস তাদের পাবার দ্রুত ধাবমান শবে চারিপাশের স্তব্ধতাকে। বিদীর্ণ কোরে বিপুল হর্ষের আবেগে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেলো। যেন সারা পরিবেশের দীর্ঘ প্রসারিত নিদ্রা ভাঙিয়ে বিস্ময়ের আনন্দময় আঘাতে তাকে জাগিয়ে তুলে তাদের এই যাত্রা। তারই প্রকাশ তাদের গতির আবেগে বিস্ময় বিকীর্ণকারী পক্ষ-সঞ্চালনে, রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসির মতো পাবার শদে সমস্ত পরিবে; বিস্ময় ভরিয়ে দিয়ে, দামিনীর চমকের মতো তরঙ্গায়িত রেখায় সম্মুখে মিলিয়ে যার শব্দে। এই চিত্রকল্পের বিপুল মাধুর্য ও গভীরতার চমৎকারিত্ব বিস্ময়কর।

কবির মনে হলো বলাকাপঙক্তির ঐ পক্ষধ্বনির মধ্যে যেন বেজে উঠলো অপ্সরা নারীদের নৃত্য-মঞ্জীরের তান। তপস্যারত, স্তব্ধতায় নিমজ্জিত ঋষিদের ধ্যানভঙ্গ করবার জন্য এই-সব অপরাম। দেবরাজ ইন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত হতেন। ইন্দ্রের ভয় হতো, হয়তো ঐ-সব ঋধিদের তপস্যার লক্ষ্য তার সিংহাসনের অধিকার। অপ্সরীরা নৃত্যে গীতে দেহ-সৌন্দর্যের বিভ্রমে ঋষিদের ধ্যানভঙ্গ করতেন। এমনকি একবার পার্বতীও শিবকে লাভ করবার জন্য তার ধ্যানভঙ্গ করবার চেষ্টা করেছিলেন অনঙ্গ ও বসন্তের সহায়তায়। এই-সব পৌরাণিক ধ্যান উঙ্গের আভাস ও ধ্যানমগ্ন ঋষির সামনে নৃত্যরতা অথচ ঋষির ক্রোধভীত দ্রুত অপসৃয়মান অঙ্গরার ছবিটি ধরা পড়েছে এই পঙক্তি কয়টিতে। নৃত্যের ধ্বনিতে ঋষির ধ্যানভঙ্গ, বিস্ময়ের মধ্যে তার চক্ষু উন্মীলন, চিত্তের উদ্বেলতা, অথচ যার জন্য ধ্যান ভঙ্গ তার দ্রুত সহাস্য পলায়নপরতা চারিপাশকে সচকিত কোরে, তার ছবিও ধরা পড়লো পঙক্তি কয়টিতে -

ঐ পক্ষধ্বনি

শব্দময়ী অপ্সররমণী।

গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি। (৩য় স্তবকের ১ম পঙক্তি)

এবং তার ফলে প্রথম নারীম-আগমনী গানের ছন্দে কুমার-চিত্তের জাগরণের মতো দেওদার বন শিহরিত হলো; এতদিন নারীচেতনাহীনতার অন্ধকারমগ্ন পুরুষচিত্তে অনদের প্রথম স্পর্শের মতো তিমিরমগ্ন গিরিশ্রেণী রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো -

উঠিল শিহরি

গিরিশ্রেণী তিমিরমগন,

শিহরিল দেওদার-বন। (৩য় স্তবক, শেষ ৩ পঙক্তি)

প্রকৃতির এই অর্ধ-জাগরণ ধীরে ধীরে পূর্ণজাগ্রত সচেতনতায় ছড়িয়ে গেলো দিক থেকে দিগন্তরে। বিদ্যুতের মতো দ্রুত অপসৃয়মান বলাকা-পক্ষের শব্দধ্বনি প্রথমে নিশ্চল সৃষ্টির অন্তরে জাগিয়ে তুলল পুলক; তার পরে তাতে সঞ্চারিত কোরে দিলো গতির আবেগ। নিশ্চল হতে চাইলো সচল, পৃথিবীবক্ষে দৃঢ়বদ্ধ। পর্বতের চিত্তে জেগে উঠলো বৈশাখের মেঘের মতো নিরুদ্দেশ যাত্রার তুফা, ঐ বলাকা শ্রেণীর পাখার শব্দের রেখা দেরে তরুশ্রেণী তাদের শাখা-পাখা মেলে দিয়ে মৃত্তিকা-বন্ধন মুক্ত হয়ে সীমাহীন আকাশের সীমাঅন্বেষণের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো মুহূর্তের মধ্যে। সন্ধ্যায় স্বপ্নমগ্ন ধরিত্রীর অনকুল কুমারী (virgin) চিত্তের যে শান্তিময় স্তব্ধতা, তা ভেঙে দিয়ে গেলো সামনের দিকে উডডীয়মান বলাকা শ্রেণীর পশ্চাতের-দআকর্ষণত্যাগী বিবাগী-পথচলা। ধরিত্রীর চিত্তেও জেগে উঠলো ব্যাকুল বৈরাগ্যের বাণী,-এখানে থেমে যেয়ো না, সামনে এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো; পিছনের পথ ত্যাগের দ্বারা ভোগ করো গতির আনন্দ। চরৈবেতি ; সঞ্চয়ের ভারমুক্তির মধ্য দিয়েই গতির সচলতা সৃষ্টি হয়। গন্তব্য জানা নেই, কারণ থামবার কোনো কথা নেই। এখন শুধু পথচলাতেই আনন্দ। এখন। শুধু সামনে-অনুসরণ ধাবমান গতিময় নিরেখার, ‘হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে'

মনে হল, এ পাখার বাণী

দিল আনি

শুধু পলকের তরে

পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে

বেগের আবেগ।

পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;

তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি

মাটির বন্ধন ফেলি।

ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,

আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি।

সুদূরের লাগি

হে পাখা বিবাগী ।

বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে

‘হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে! (৪র্থ স্তবক)

বাইরের প্রকৃতিতে সংঘটিত ঘটনার অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে বিস্তৃততর তাৎপর্য কবির কাছে ধরা পড়লো। আপাত অচলতার আচ্ছাদনে ঢাকা সৃষ্টির অভ্যন্তরে, কবি অনুভব করলেন, সর্বব্যাপ্ত গতির জন্য আকুলতা ও সচলতা। বিপুল কালে ক্রম-উন্মোচিত গতির তাৎপর্য মানুষের ধল্লায়তন আয়ুর সীমায় সব সময় ধরা পড়ে না। কিন্তু সৃষ্টির অভ্যন্তরে গভীর পরিবর্তন চলতেই থাকে, এবং নব নব বিবর্তিত রূপগুলি দীর্ঘ কালসীমায় নিজেদের অভিব্যক্ত করে। আপাত-স্তব্ধ ও আপাত অপরিব! এগতের কেন্দ্রে আছে ‘বেগের আবেগ বা potential উৎস, torch light-এর অভ্যন্তরে ব্যাটারির

মতো, বা বের ভাষায় clan vital-এর মতো। এরই প্রেরণায় জগতের বিবর্তন! চলমান বলাকার পাখার শব্দ কবির Tচত্রে এই সত্য সঞ্চারিত কোরে দিয়েছে। যে-তারাকে আকাশের পটভূমিতে নিশ্চল বলে মনে হয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগারে তার বিপুল বেগ ধরা পড়ে। আর ঐ নক্ষত্র থেকে নির্গত আলোকের কণার গতিবেগ! (১৮৬০০০ মাইল / সেকেণ্ড)। সেই গতিবেগে ঐ আলোক কণা বিশ্বপরিভ্রমণে বেরিয়েছে। এ অলোক কণা বিশ্বের অন্ধকারকে কমান কোরে তুলেছে। কবির উপলব্ধি, ভৌগোলিক, জ্যোতির্বিজ্ঞানিক ও জৈবিক ক্রমবিবর্তনের দীর্ঘধারাপথটি এই কেন্দ্রীয় বেগের-আবেগের ফল পরিণতি। এবং মানুষের সভ্যতার, চিন্তার বা ভাবাদর্শের কাল-থেকে কালান্তরে বা যুগ-থেকে-যুগান্তরে ক্রমসঞ্চারও। কোথাও কোনো জৈববীজ বা চিন্তার বীজ বা আদর্শের বীজ জন্মলাভ কোরে সকলের অলক্ষ্যে উদগত-অঙ্কুর হয়ে কোন্ মহা বনস্পতির সম্ভাবনাকে অভিব্যঞ্জিত কোরে চলেছে, আবার সেই বনস্পতি থেকে জাত নূতন নূতন বীজ নব নব সম্ভাবনাকে ধারণ কোরে ছড়িয়ে পড়ছে সমগ্র জগতে, খণ্ডকালের ছোট পিঞ্জরে বদ্ধ মানুষের কাছে তা ধরা পড়ছে না। কোন কুয়াশাচ্ছন্ন সুদূর অতীতে মানুষের কতত চিন্তা ভাবনা ধারণা ও আদর্শের জন্ম লাভ। তারা ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে মনুষ্য-সভ্যতায় ছড়িয়ে গেছে এবং এখনও তার থেকে নব নব ভাববীর জন্মলাভ করছে, এবং সভ্যতায় নব নব আবেগ-প্রেরণা। তাৎপর্য প্রভাব ও রূপ সঞ্চারিত করে দিচ্ছে। মৃত্তিকা-শায়িত রসস্রাবণ একদিন বৃক্ষের ফল-পত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয় নব রূপে, বা মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ বীজ ব্যক্ত হয় বৃহৎ বনস্পতিতে, ভৌগোলিক বিবর্তনের গতিতে সমুদ্রের-অরণ্যের দ্বীপের পাহাড়ের রূপ ও অবস্থান-স্থানের পরিবর্তন হয় । অজানা থেকে ক্রমশঃ জানার দিকে চলে এই গতি। একদা-অজ্ঞাত একদিন জ্ঞানের সীমায় ধরা পড়ে। আলোকিত হয়ে উঠবার জন্য অন্ধকার এই আকুলতাই অন্তরে বহন করে। নক্ষত্রের স্পন্দমান আলোক-কণা অন্ধকারকে চমকিত কোরে তোলে তার আকুলতাকে সার্থক কোরে।

হে হংস-বলাকা,

আজ রাতে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।

শুনিতেছি আমি এই নিঃশষের তলে

শূন্যে জলে স্থলে

অমনি পাখার শবা উদ্দাম চঞ্চল।

তৃণদল

মাটির আকাশ-'পরে ঝাপটিছে ডান;

মাটির আধার-নীচে, কে জানে ঠিকানা -

মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা।

লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।

দেখিতেছি আমি আজি

এই গিরিরাজি,

এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়

দ্বীপ হতে দীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।

নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে

চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে। (৫ম স্তবক)

চতুর্থস্তবক পর্যন্ত যা ছিলো কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক বিশ্ব বীক্ষণ, পঞ্চম স্তবকে তা কবির অনুভূতিগম্য আন্তরসম্পদে পরিণত হয়েছে। হংস বলাকার গতিময়তায় কবির কাছে ধরা পড়েছে বিশ্বের অভ্যন্তরিক গতিচঞ্চলতা। কবির উপলব্ধিতে আপতি-দৃশ্যমান অচলতার কেন্দ্রে অনুভূত হয়েছে potential বেগের আবেগ, যা সক্রিয় (kinetic) গতিশক্তিতে পর্যবসিত হয়ে সবদিকে কম প্রসার্যমান। ষষ্ঠ স্তবকেও কবির একই আত্মানুভূতি। আত্মানুভূতি বটে, কিন্তু শেষ দুই পঙক্তির আগে পর্যন্ত তা কবির আত্মিক আত্তীকরণে (assimilation-এ) পরিণত হয়নি। কবির

পরিণততর উপলব্ধি, মানুষের সকল প্রচেষ্টা, জগৎ ও জীবন থেকে প্রজ্ঞা-প্রাপ্ত সকল বাণী বা message, কোনো স্থির গন্তব্যে পৌঁছিয়ে ক্ষান্ত হয়ে যাওয়ার নয়। অসীম দেশে ও অন্তহীন কালে অলক্ষ্যে চলে এর সঞ্চারণ বহু আদর্শ, ভাবনা ও চিন্তার সঙ্গে এরাও আকাশে উড্ডীয়মান, যেন বহু পাখিগ্রথিত বাদলের অন্যতম হংস এক-একটি। কবির চিত্তেখিত বাণীসম্পর্কেও একই কথা সত্য। তাঁর কবিতার বাণীগুলিও অলক্ষ্য জগৎ-পথের পথিক। একদা তারা জাত হয়েছে কবির চিত্তগহ্বরে। কবির চিত্তই ছিল এই-সব নবজাতকের নীড়। কিন্তু এখন তারা তাদের সেই বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। আলোকিত যুগ বা অকার যুগান্তরের পথ অতিক্রম কোরে তাদের যাত্রা সম্মুখের দিকে। বিবর্তনের কোনো একটি পর্যায়ে, সমাজের কোনো একটি পরিণতিতে, মনুষ্যসভ্যতার কোনো একটি স্তরে এসেই তাদের (ঐ message-এর) আবেদন শেষ হয়ে যাবে না। বিচিত্রমুখী নব নব ভাব ও তাৎপর্যের উৎসারণ ঘটবে তার মধ্য দিয়ে, এবং তার আভ্যন্তরীণ আকূতি কেবল এই প্রবর্তনচালিত হয়ে চলতে থাকবে, 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।' বহির্বিশ্বের সত্যের এই কবি-কৃত আত্মীকরণে কবিতাটির সমাপ্তি

শুনিলাম, মানবের কত বাণী দলে দলে

অলক্ষিত পথে উড়ে চলে

অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।

শুনিলাম আপন অন্তরে

অসংখ্য পাখির সাথে

দিনে রাতে

এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে

কোন্ পার হতে কোন্ পারে।

ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে -

হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথ, অন্য কোনখানে!

৪.৪ আরও গতির কবিতা

পূর্বে-উল্লেখিত কবিতাগুলি ছাড়াও কবির আরও কয়েকটি গতি-চেতনাবাহী কবিতা বলাকা কাব্যে রয়েছে। কিংবা বলা যায় কবির বলাকা কাব্য সকল কবিতা গুলিতেই কোনো-না-কোনো ভাবে গতিচেতনাই ব্যক্ত। অবশ্য পূর্বোক্ত 'চঞ্চলা' ও 'বলাকার' মতো এত অপূর্ব কাব্যিক সৌকর্যে ব্যক্ত উদ্দেশ্যহীন গতির কবিতা আর নেই। উত্বেহীন গতির কবিতা অবশ্য আরও আছে, সেগুলি কাব্যিক সৌন্দর্যে হীন এবং একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি। আরও কিছু অপূর্ব সৌন্দর্যে-ধত কবিতা আছে, কিন্তু তারা শুধু গতি-চেতনার কথাই বলে না। আরও কিছু বলে।

ক। আমার গান (১৫ সংখ্যক)

প্রথমে ১৫ সংখ্যক 'আমার গান' কবিতাটি। কবির বক্তব্য, কবির জীবনে যেমন, তার গানের মধ্যেও তেমনি অনির্দেশতার ব্যঞ্জনা। কবির গানগুলি সব ভাসমান শৈবালের মতো। কোথাও মূল প্রাথিত কোরে এরা বদ্ধ হয়ে যায় না। কিন্তু এরা ফুল ফোটায়, ফুলের চারিপাশে পত্রোদগমও হয়। গীতায় ছন্দের আবির্ভাবকে পত্রোদগমের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কবিতার ছন্দের মতো সঙ্গীত-পুষ্পগুলি কবিমানসের অন্তরবাণীকে সঞ্চারিত কোরে (communicate) : দেয় বহির্বিশ্বে। ফুলগুলি যদি হয় মানসবৃক্ষের 'চিঠি' বাইরের জগতের কাছে, পাতা গুলি তাহলে ঐ চিঠির চারিদিকে নিস্তব্ধতার পাড় (border)। এরা (গানগুলি) সব অজানা অতিথি। কবির চিত্তে এরা কখন আসবে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। তবে যেদিন কবির চিত্তে সৃষ্টির শ্রাবণ-ধারা নামে, যেদিন 'ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া' এবং 'তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী অথির বিছুরিক পাতিয়া', সেদিন কবির গানের শৈবাল দল হয় উদ্দাম চঞ্চল। সেদিন তারা পথ হারায়, দেশে দেশে এবং দিকে দিকে ভেসে যায়।

কবি শুধু বিশ্বদর্শনেই নিরুদ্দেশ গতিকে অনুভব করেন না। তার চলার পথই শুধু অনির্দেশ গন্তব্যের দিকে ধাবমান, এটুকুই শুধু নয়, তার সৃষ্ট সংগীতেরও শেষ স্থান

কোথাও আছে কিনা তাও তিনি জানেন না। পরিবেশের প্রেরণায় ও জীবনের বিপুল বেগে তাদের আবির্ভাব কবির চিত্ত-গহ্বর থেকে। তারপর তাদের যাত্রা বাইরে দুরে, কত মানুষের ধারার কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে করতে, ভাবনায় দীপ্ত করতে করতে, নূতন অনুভবে প্রাণিত করতে করতে। কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছিয়ে তা থেমে যাবে না। তা অনাগত কাল ধরে চলতে থাকবে মানুষের লোকালয়ের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীর ঘাট ছুঁতে ছুঁতে।

যেদিন শ্রাবণ নামে দুর্নিবার মেঘে,

দুই কুল ডোবে স্রোতেবেগে,

আমার শৈবালদল

উদ্দাম চঞ্চল,

বন্যার ধারায়

পথ যে হারায়,

দেশে দেশে

দিকে দিকে যায় ভেসে ভেসে।

খ। যাত্রা (১৮ সংখ্যক)

'যাত্রা' কবিতাটিতে স্থিতির কুশ্রীতার প্রকাশ। স্থিতি কুৎসিত, এবং কদর্য, কারণ তা কোনো নবীন আনন্দময় সৃষ্টির দ্বারা বিশ্বকে সমৃদ্ধ করে না। যে শুধু বস্তুভার সঞ্চয় কোরে, এবং সঞ্চিত বস্তুকে রক্ষা করবার উদ্বিগ্ন প্রচেষ্টায় চারিপাশকে সংশয়ে ভয়ে নিরানন্দে পূর্ণ কোরে তোলে। ফলে

দুঃখের বোঝাই শুধুই শুধু বেড়ে যায় নূতন নূতন;

এ জীবন

সতর্ক বুদ্ধির ভারে নিয়েযে নিমেষে

বৃদ্ধ হয় সংশয়ের শীতে, পক্ককেশে।

কিন্তু চলার বেগে চারিপাশের পর্দা সরে যায়, কুৎসিত-সঞ্চয় ক্ষয় হতে থাকে। গতি আমাদের প্রতি মুহূর্তে নবীন চেতনায় স্নান করিয়ে নির্মল কোরে তোলে। চলমানতা আমাদের জীবানুভবের অমৃত পান করায়, আমরা প্রতিমুহূর্তে বার্ধক্য-জয়কারী যৌবনে অভিষিক্ত হয়ে উঠি। কবি স্থিতি নামক মৃত্যুর বিলাসে ও আলিঙ্গনে ঘরে বদ্ধ থাকতে চান না। গতিতেই তিনি জীবনের সার্থকতা অনুভব করেন –

কেন মিছে

আমারে ডাকিস পিছে?

আমি তো মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে

রব না ঘরের কোণে থেমে।

আমি চিরযৌবনেরে পরাই মালা,

হাতে মোর তারি তো বরণডালা।

কবি নিজের চিত্তোত্থিত এই গতিপ্রাণায় অন্তর পূর্ণ কোরে বলে ওঠেন

ওরে মন,

যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন।

তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি

গান গায় চন্দ্র তারা রবি।

গ। যাত্রার গান (২০ সংখ্যক)

'যাত্রাগান' কবিতাটিতে কবির গতিচেতনা-সম্পর্কিত ভিন্নতর তাৎপর্য ও মাত্রা ধরা পড়েছে। কবির গতিমানসিকতার উৎস, এবং যার আকর্ষণে তিনি সামনে এগিয়ে চলেছেন, এই দুইয়ের পরিচয় কবিতাটিতে কবি প্রকাশ করেছেন। কবির চিত্তস্থ

ব্যথাই কবিকে গতিচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। পূর্বে উল্লিখিত আমার গান কবিতায় কবি বলেছেন, যেদিন শ্রাবণ নামে দুনিবার বেগে, সেদিন কবির চিত্তের জাগরণ। এই শ্রাবণ যখন বেদনার, তখনই তা গভীরতম আনন্দকে ব্যক্ত করে । 'বেদনা' শব্দের একটি অর্থ 'হৃদয়ানুভূতি'। কবির বক্তব্যের তাৎপর্য, দুঃখের অনুভূতিতেই হৃদয়ের সার্থকতম জাগরণ। তখনই জীবনের যাত্রা শুরু নিদ্রা থেকে উদ্যানের পর। পারে-ভেড়া জীবন-তরী তখন নিজেকে ভাসিয়ে দেয় অনুকূল স্রোতে বা উজান স্রোতেও।

বেদনা potential energyর মতো কবিচেতনায় গতির আবেগ সৃষ্টি করে। আর কবিকে সামনের দিকে আকর্ষণ কোরে টানতে থাকে যে শক্তি, তা হলো 'অজানা। অজানাকে জানবার, অপরিচিতকে চিনবার আগ্রহে কবিমানসের কেবলই সামনের দিকে গমন। সীমাবদ্ধ স্থিতির বাসা ছেড়ে কবি-বিহঙ্গের এখন তাই অসীম আকাশে ডানা-প্রসারণ

কোনো কালে হয় নি যারে দেখা-ওগো,

তারি বিরহে

এমন ক'রে ডাক দিয়েছে,

ঘরে কে রহে?

বাসার আশা গিয়েছে মোর ঘুরে,

ঝাঁপ দিয়েছি আকাশ-রাশিতে।

পাগল, তোমার সৃষ্টিছাড়া সুরে

তান দিয়ে মোর ব্যথার বাঁশিতে।

(যাত্রাগান / শেষ ২য় স্তবক)

ঘ। অজানা (৩০ সংখ্যক)

অজানার এই আকর্ষণ আরও গভীরভাবে ব্যক্ত কবির 'অজানা' নামক কবিতাটিতে। 'অজানাই কবির জীবন-তরীর মাঝি, অঙ্গানাই কবিমানসকে সীমার বন্ধন থেকে মুক্ত করে; অজানাই কবির নির্দয় প্রেমিক, সে ভয় দেখিয়ে ভয় ভাঙায়। কবি এখন ঐ অজানার প্রেমে স্থিতি-খ্যাতি-মান-সম্পদে ঘেরা সভা ভঙ্গ কোরে, পিছনের বাধন ছিড়ে জোয়ার জলের তরঙ্গে তার নৌকো ভাসানোর জন্যে আকুল -

অজানা মোর হালের মাঝি, অজানাই তো মুক্তি,

তার সনে মোর চিরকালের চুক্তি।

ভয় দেখিয়ে ভাঙায় আমার ভয়।

প্রেমিক সে নির্দয়:

মানে না সে বুদ্ধিশুদ্ধি, বৃদ্ধজনার যুক্তি

মুক্তারে সে মুক্ত করে ভেঙে তাহার শুক্তি। (৩য় স্তবক)

ঘণ্টা যে ওই বাজল কবি, হোক রে সভাভঙ্গ

জোয়ার-জলে উঠেছে তরঙ্গ।

এখনো সে দেখায় নি তার মুখ,

তাই তো দোলে বুক।

কোন্ রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাব সঙ্গ

কোন্ সাগরের কোন কূলে গো কোন্ নবীনের রঙ্গ! (৫ম স্তবক)

ঙ। পথের প্রেম (৪৩ সংখ্যক)

‘পথের প্রেম’ কবিতাটি কবির বলাকা কাব্যস্থ সামগ্রিক গতি-দর্শনের পরিচায়ক। এই কবিতাটিতে কবির গতিচেতনা, গতির মধ্যে গন্তব্যের দ্যোতনা, সকল চলার সঙ্গে প্রিয়তম সঙ্গীর অদৃশ্য উপস্থিতি-অনুভব, গতির প্রেরণসঞ্চারে potential energy (স্থিতি শক্তি) রূপী প্রেম-প্রেরণা, এই সকলেরই ইঙ্গিত। কাব্যিক বিশিষ্টতায় বলাকা কাব্যের অন্যান্য বহু কবিতার মতো এটির অপূর্বত্ব না থাকলেও, কবির গতি-দর্শনের সমগ্র রূপটি এর মধ্যে ব্যঞ্জিত। কবির ব্যক্তিগত জীবন পর্যায়ের মধ্যে প্রকাশিত গতির বিশিষ্ট অভিব্যক্তি, জন্ম-জন্মান্তরের মধ্যে আবার তার নব নব রূপায়ণ, এবং তার গতিচেতনার মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে মিশে থাকা তারা ঈশ্বরচেতনার চকিত-চকিত দ্যুতি কবিতাটিতে প্রকাশিত।

প্রথম স্তবকে কবির বক্তব্য, হয়তো নিজেকে লক্ষ্য করেই, দুঃখের অভিঘাতে মুমুর্ষ হয়ে থাকার কোনো কারণ নেই। কালস্রোত চিরন্তন, অবিরাম, অন্তহীন। ব্যক্তিসত্তা অনন্তের পথে চলমান। তবে এই চপা তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ । তার রথের সারথি, বা তার তার কর্ণধার, যে-রূপেই তাকে ভাবি-না-কেন তিনি উদ্দাম বেগে উধাও হয়ে চলেছেন, রথীর ইচ্ছাকে কোনো পাত্তা না-দিয়েই । তার পথ দু:খের মধ্য দিয়ে, আবার সুখের মধু দিয়েও। বেদনার মধ্য দিয়ে এবং আনন্দের মধ্য দিয়ে। কোনো দুঃখই জগদ্দল পাথরের মতো অনড় হয়ে বুকে চেপে থাকতে পারে না।

ব্যক্তিজীবনের প্রতি পর্যায় পরবর্তী অজানা ভবিষ্যতের সম্ভাবনাহ, দ্বিতীয় ওবকের এই-ই ইঙ্গিত। শৈশবের আনন্দময় দিনগুলি মায়ের কোলের আশ্রয়ের মতো। কিন্তু তারা ভেসে যায়। আসে নবীনতায় স্পন্দমান, আশা দীপ্ত, কিন্তু সংঘাতময় সংগ্রামমুখর যৌবনের দিনগুলি। কিন্তু সেই দিনও শেষ হয়, আসে বার্ধক্যের বনচ্ছায়াতলে’র শান্তির নিরালা। কিন্তু তার মধ্যে আত্মগোপন কোরে থাকে জগৎ থেকে আসন্ন বিদায়ের পূর্বাভাস। কিন্তু তবুও প্রত্যেক পর্যায়ে পরবর্তী পর্যায়ের যথাযথ রূপ ও পরিচয়গুলি অজ্ঞেয়ই থেকে যায়। শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক পরবর্তী দিনটি অভাবিত অসম্ভাব্যের সম্ভাবনাগর্ভ।

ব্যক্তিজীবনের এই গতিচেতনা সামগ্রিক কালচেতনার মধ্যেও প্রসারিত। আমরা সকলেই চলার পথের পথিক। স্থিতির জন্যে দরকার অনেক আসবাব, বস্তুসঞ্চয়। চলার পক্ষে লটবহর (luggage) দারূপ। পথিকের কাছে বৃহৎ গারি তার চলার বাধা। তার চলা যেন হালকা মেঘের খেয়া-বাওয়া। অপহ্নয়মান দেহরেখার অস্পষ্ট ছাপ বাতাসে আঁকতে-আঁকতে তার গমন। সে কোনো স্থায়ী আলোকচিত্র (Photograph) রেখে যায় না। বাতাসে আঁকা তার দেহরেখার অস্পষ্ট ছাপও দ্রুত মিলিয়ে যায়।

দেহযাত্রা মেঘের খেয়া বাওয়া,

মন তাহাদের ঘূর্ণাপাকের হাওয়া।

বেঁকে বেঁকে আকার এঁকে এঁকে

চলছে নিরাকার। (৩য় স্তবকের শেষ ৪ পঙক্তি)

সহজ ভারহীন গতিই তার সম্পদ। পথিকদের পথের কিনারায় নূতন প্রাণের প্রকাশ, কান্না-হাসির ফুল ফোটানোতেই তার সার্থকতা। চতুর্থ স্তবকের এই বক্তব্য।

পঞ্চম স্তবকে কবির অনুভব, এই পৃথিবী থেকে তার বিদায় নেওয়ার দিন আসছে। ইহলোকের খেলা এবার শেষ করতে হবে। পশ্চাতে ফেলে রেখে যেতে হচ্ছে যেন সেই জীবন থেকে কবি যে ভালোবাসা পেয়েছেন, তাকে তিনি সুগভীর প্রেমের বেদনায় অভিষিক্ত করছেন। আবার সামনে যে অনাগত অপরিচিত নিরুদ্দিষ্ট অপেক্ষমাণ সেও প্রেমের সুগভীর আকর্ষণে কবিকে টানছে। তাকেও কবি স্বীকৃতি জানান পরম ভালোবাসায়। পশ্চাতের জীবনকে ছেড়ে আসার বেদনা, এবং সামনের অজানাকে জানার আকুলতা, এই দুই নিয়ে কবির। যাত্রা জন্মান্তরের পথে।

ফেলে-আসা জীবনের অনুরূপ সূর্ত প্রাণের ঢেউ আবার নবীন জন্মেও কবির জীবনে তরঙ্গায়িত হবে। বন্ধুর, প্রেয়সীর, প্রিয়জনের মধুর দৃষ্টির স্মৃতিঘেরা সেই অতীত। হয়তো নূতন জন্মে আবার নূতন কোরে যাদের পাওয়া যাবে, তাদের মুখেও সেই একই কান্নাহাসির প্রকাশ, ভবিষ্যতের একজনের মুখে হয়তো প্রতিবিম্বিত হবে কতো অতীত মুখের প্রতিভাস -

বঁধুর দিঠি মধুর হয়ে আছে

সেই অজানার দেশে।

প্রাণের ঢেউ সে এমনি করেই নাচে

এমনি ভালোবেসে।

সেখানেতে আবার সে কোন্ দূরে

আলোর বাঁশি বাজবে গো এই সুরে,

কোন মুখেতে সেই অচেনা ফুল

ফুটবে আবার হেসে!

(৬ষ্ঠ স্তবক)

এই জগৎ থেকে কবি চলে যাবেন, কিন্তু এই জগতে লব্ধ ও উপলব্ধ অনুভূতি গুলি কবির প্রাণসত্তায় মিশে যাবে। কবি এই জগৎকে ফেলে যাবেন, এই জগৎ থেকে গৃহীত বস্তুগত উপকরণ উপাদান ও আসবাবসহ, কিন্তু তার চিরন্তন চেতনায় : দ্রবীভূত হয়ে যাবে এই জগতের অনুভাবগুলি। এই জগতের বীণা ফেলে যাবেন কিন্তু হৃদয়ে নেবেন এই জগতের গান। সপ্তম স্তবকের এটিই মর্মকথা। নূতন জীবনে যাকে কবি এই গান শোনাবেন, সে জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে কবির চিরদিনের সঙ্গী। প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের অন্তরালে সেই তো অন্তরঙ্গ বিভাব, সেই একই তো জন্মজন্মান্তরে নব নব প্রেয়সীর রূপে আবির্ভূত, সেই তো সুগভীর ভালোবাসায় কবিকে বার বার বরণ কোরে নেয়। প্রতিজন্মের প্রতি বাসর ঘরে তারই কণ্ঠে কবির মাল্যার্পণ, পূজার ঘরে তারই চরণে কবির অর্ঘ্য নিবেদন, তারই হাতে কবির রাখ-বন্ধন। সেই তো কবির ঈশ্বর বন্ধু প্রেয়সী সঙ্গী। তার আবির্ভাব জীবনপথের কোন অভাবনীয় বাঁকে, কোন্ চকিত ক্ষণে, অকস্মাৎ। অসময় সে থাকে অন্তরের গভীর গোপনে। তাকে নিয়ে ঘর বাধা হয় না। তবে জন্মজন্মান্তরের সাংসারিক দিনগুলিতে সঙ্গী সাথী বন্ধু ,প্রেয়সীর হাসিকান্না আনন্দদুঃখের অভিব্যক্তির মধ্যে তারই অনঙ্গ উপস্থিতি ধরা পড়ে।

পথের বাঁকে হঠাৎ দেয় সে দেখা

শুধু নিমেষ-তরে ।

সন্ধ্যা-আলোয় রয় সে বসে একা

উদাস প্রান্তরে।

তারে নিয়ে হল না ঘর বাঁধা,

পথে পথেই নিত্য তারে সাধা

এমনি করেই আসা-যাওয়ার ডোরে

প্রেমেরই জাল-বোনা। (৯ম-১০ম স্তবক-অংশ)

অতএব কবির গতি-চেতনা একেবারে নিরালম্ব শূন্যতা-অভিসারী নয়। এর মধ্যে ব্যঞ্জিত রয়েছে একটি চিরন্তন প্রেমানুভব। সেই প্রেম আদিতে কবির জীবন অভিব্যক্তির পশ্চাৎ-প্রেরণা, কবিসত্তার ক্রমবিকাশে (becoming) তা কবির সঙ্গে বিমিশ্রিত কবির জীবনদেবতা, আবার কবির প্রেয়সীও, এবং পরিণতিতে কবির আনসর্বস্ব গন্তব্যও। অতএব কবির গতিচেতনা অনির্দেশ্যের কাছাকাছি গেলেও, শেষ পর্যন্ত তা সার্থক স্থিতি প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছে। প্রসঙ্গতঃ কবি যে রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে লক্ষশুন্য গতিকে শেষ পর্যন্ত মূঢ়তা বোলে মনে করেছেন তার বলিষ্ঠ পরিচয় রয়েছে পরিশেষ কাব্যের ‘লক্ষশূন্য’ কবিতায়। উদ্দেশ্যহীন গতি অতি তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্ধ কবিতাটিতে -

রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠায় উর্ধ্বরে ডাকি

“থামো থামো, কোথা তুমি রুদ্রবেগে রথ যাও হাঁকি,

সম্মুখে আমার গৃহ। রথী কহে, “ওই মোর পথ,

ঘুরে গেলে দেরি হবে, বাধা ভেঙে সিধা যাবে রথ।”

৪.৫ অনুশীলনী

১। গতিতত্ত্বের কথা ‘সবুজের অভিযান’ কবিতায় কিভাবে ব্যক্ত হয়েছে?

২। ‘সর্বনেশে’ কবিতায় ভোরের আলোর অবদান আলোচনা করো।

৩। ‘আহ্বান’ কবিতার বিষয়বস্তু উল্লেখ করো।

৪। কি কি কারণে ‘শঙ্খ’ কবিতাটি বলাকা কাব্যগ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ কবিতা সে বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

৫। ‘ঝড়ের খেয়া’ কবিতার মৃত্যুচেতনা আলোচনা করো।

৬। ‘যৌবন’ কবিতায় কিভাবে মৃত্যুর কথা উঠে এসেছে?

৭। ‘নববর্ষের আশীর্বাদ’ কবিতার বিষয়বস্তু উল্লেখ করো।

৮। কিভাবে ‘বলাকা’ কবিতায় গতি চেতনা ফুটে উঠেছে আলোচনা করো।

৯। ‘চঞ্চলা’ কবিতায় সুদূরের প্রতি কবির আকর্ষণের কথা ব্যক্ত করো।

১০। গতিতত্ত্বের প্রয়োগ কিভাবে ‘যাত্রা’ ও ‘যাত্রা গান’ কবিতায় এসেছে আলোচনা করো।

১১। ‘আমার গান’ কবিতাটির মর্মকথা ব্যক্ত করো।

১২। ‘অজানা’ ও ‘পথের প্রেম’ কবিতা দুটি কিভাবে বলাকা কাব্যগ্রন্থের বিশিষ্ট কবিতা হয়ে উঠেছে উল্লেখ করো।

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১. বলাকা -১৩৯৫-এর নূতন সংস্করণ, এবং তার গ্রন্থপরিচয়।

২. “পথের সঞ্চয়-রবীন্দ্রনাথ।

৩. কালান্তর'-রবীন্দ্রনাথ।

৪. রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ-২য় খণ্ড, ১৩৫৬ সংস্করণ, প্রমথনাথ বিশী

৫. বলাকা কাব্য পরিক্রমা'–৫ম সংস্করণ, ক্ষিতিমোহন সেন

৬. রবীন্দ্রনাথের বলাকা'-অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

৭. রবীন্দ্রজীবনকথা'-১৩৬৬, প্রভাত কুমার মুখপাধ্যায়

৮. রবীন্দ্রবন্দনা'-বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী

৯. 'কবিতা আধুনিকতা ও আধুনিক কবিতা'-বারীন্দ্র বসু

১০. স্বদেশ কথা ও পৃথিবীর ইতিহাস'-ড. কিরণ চৌধুরী

১১. 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান। (১৯৮৮)

১২. বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'-জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (সাহিত্য সংসদ)

১৩. বঙ্গীয় শব্দকোষ'-হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪. বারীন্দ্র বসুর "কবি ও কালান্তর"

একক ৫ কবিতাপাঠ

বিন্যাসক্রম

৫.১ গতি থেকে স্থিতি, অসীম থেকে সীমা, ভাব থেকে রূপ, প্রেম থেকে সৃষ্টি

ক। ছবি

খ। শাহজাহান

গ। তাজমহল

ঘ। রূপ

৫.২ অনুশীলনী

৫.৩ গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ গতি থেকে স্থিতি, অসীম থেকে সীমা, ভাব থেকে রূপ, প্রেম থেকে সৃষ্টি

কবির অনির্দেশ গতিচেতনা বস্তুতপক্ষে নিরালম্ব শূন্য-বিহারী নয় । এবং এর উৎসও শূন্য নয়। kinetic energyর উৎস potential energy ; তেমনি কবির গতি চেতনার আদিতে সীমায়িত প্রেম। প্রেমই সেই potential energy যা ব্যক্তিকে সকল কর্মে অনুপ্রাণিত করে। স্থির ব্যক্তিত্বকে ক্রিয়াশীল ব্যক্তিতে(অভিব্যক্তি-তে) পরিবর্তিত করে তার পরিবেশে প্রতিবেশে নব নব তাৎপর্য ও আকর্ষণ সঞ্চারিত করে, তাকে ভালোবাসায়। সমস্ত পরিমণ্ডল তার প্রিয়তম হয়ে ওঠে, সুন্দর হয়ে ওঠ। প্রিয়তম ব্যক্তি বা মধুর সৌন্দর্য তো অনন্ত নিরাকার অসীমেরই সীমাবদ্ধ রূপমূর্তি। নিরুদ্দেশ গতি প্রেমানুভব থেকে উত্থিত। আবার সেই গতি প্রিয়তমকে ও সুন্দরকে একান্ত কোরে তার becoming বা হয়ে-ওঠার মধ্যে পেতে চাইছে। পেতে-পেতে চলতে চাইছে। সুতরাং

গতি নিরুদ্দেশ নয়। ব্যক্তিসত্তার গতিময়তার মধ্যে অসীমের আকৃতিব্যঞ্জিত সীমাবদ্ধ রূপের জন্য আকর্ষণ সর্বদাই বর্তমান।

গতিময়তা যে শুধু সুন্দর এবং প্রেমকে পেতে চাইছে, তাই নয়। সে সুন্দরকে রচনা করতেও চাইছে। সে-ই তার সৃষ্টি। সে চিত্রে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে তার নিরাকার প্রেমানুভব ও সৌন্দর্যমুভবকে রূপযুতি দিতে চাইছে। জীবন্ত যে-'ভালোবাসার ধন' একদা ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়ে চলেছিলো, মানুষ তাকে চিরন্তন সৌন্দর্য-রূপে বন্ধ কোরে ধরে রাখতে চায়। সে সীমাবদ্ধ ক্ষণকে করতে চায় অনন্ত কালের প্রতিনিধি, সীমাবদ্ধ দেশের মধ্যে প্রতিফলিত করতে চায় অসীম দেশকে। অনন্ত ভাবকে সে সীমায়িত রূপের মধ্যে ধারণ করতে চায়। যেমন অসীম অরূপ নীহারিকা গলে গিয়ে কয় ফোটা জল। তার লক্ষ্য তখন concretion of an idea, deification of a moment। কবি Keats-এর মতো সে মনে করে when a thing is embodied in beautiful form it becomes a joy for ever, we strony সত্তার অন্তরে নিহিত যে-উদ্দেশ্য, তা হলো অনন্তকে সীমাবদ্ধ-কোরে প্রকাশ করবার আকৃতি।

ক। ছবি (৬ সংখ্যক)

কবিতাটির অনুপ্রেরণা একটি প্রতিকৃতি-ছবি (Portrait)। ১৯১৪-র অক্টোবর নভেম্বর মাস। বাঙলা ওরা কার্তিক, ১৩২১। কবি এসেছেন এলাহাবাদে ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র সুপ্রকাশের বাসায়। সেখানে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পরিবেশে তার মৃত বৌঠাকুরানী কাদম্বরী দেবীর (দাদা জ্যোতিরিন্দ্র নাথের স্ত্রী) ছবি প্রকাশের ঘুরে দেখেন। কিন্তু আচার্য, ক্ষিতিমোহন সেনের মতে ছবিখানি কবির পরলোকগতা পত্নী মৃণালিনী দেবীর। এবং কবি এই ছবি এলাহাবাদে সত্যপ্রকাশের জামাতা প্যারীলাল বন্দোপাধ্যায়ের গৃহে দেখেছিলেন।

যাই হোক, কার ছবি তা খুব বড়ো কথা নয়। মূল কথা ঐ ছবিকে কেন্দ্র। কোরে কবির অনুভব ও ভাবনা। উক্ত দুইজন নারীই কবির অত্যন্ত প্রিয়, এবং জীবনের সঙ্গে গভীর

ভাবে বিজড়িত। দুজনেই তার জীবনের প্রেম ও প্রেরণা। দুজনের যে-কোনো জনকে কেন্দ্র কোরেই এমন অপূর্ব কবিতা সৃষ্টি সম্ভব।

জীবিতকালে ঐ নারী কবির একান্ত প্রিয় সঙ্গিনী ছিলেন। কবির জীবনযাত্রায় ও জীবন-অভিব্যক্তিতে তার প্রভাব ও সাহচর্য কবিকে পূর্ণ প্রাণের আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছে, তার চারিপার্শ্বের প্রকৃতিতে নব মাধুর্য সঞ্চার করেছে। কিন্তু আজ তিনি মৃত ও ছবিতে পরিণত। একদা যিনি ছিলেন দৈনন্দিন ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত জীবন্ত সত্তা, আজ তিনি সত্তাহীন প্রতিচ্ছবি মাত্র । প্রতিচ্ছবির মধ্যে জীবন্ত সত্তার কোনো আভাস, কোনো অবশেষ বা কোনো আভা কি থাকে? ছবিকে লক্ষ্য কোরে কবির তাই প্রশ্ন (হয়তো নিজেকেই)

তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা?

-ওই যে সুদূর নীহারিকা

যারা করে আছে ভিড়

আকাশের নীড়,

ওই যারা দিনরাত্রি

আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী

গ্রহ তারা রবি,

তুমি কি তাদের মতো সত্য নও?

হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি? '(১ম স্তবক)

ছবি জীবন্ত সত্তা নয়। সত্তার সঙ্গে ছবির পার্থক্য – সত্তার চঞ্চল, বিকাশল, স্পন্দমান ; আর ছবি স্থির, নিস্পন, পরিবর্তনবিরহিত। জীবন্ত মানবসত্তার আরো বিশিষ্টতা, তার মধ্যে চেতনা চিন্তা, অনুত,সচেতন ক্রিয়া, বুদ্ধি ও বধির প্রকাশ যার অস্তিত্ব (existence) আছে তাই-ই সত্তা, তাই-ই অস্তিত্ববান, বাস্তব, সত্য। সচেতন জীবন্ত

মানুষের সঙ্গে তাই অপর জীবন্ত সত্তার যথাযথ যোগ সম্ভব। জীবন্ত মানুষের অনুভূতিতে জীবন্ত মানুষের স্পর্শ সঞ্চারিত হয়, সপ্রাণ মানুষের চেতনায় সপ্রাণ মানুষের অভিঘাত, মানুষের অভিব্যক্তিতে মানুষেরই প্রেরণা। সুর আকাশের বিশাল স্থান ব্যাপ্ত কোরে আছে বৃহৎ গ্যাসীয় নীহারিকা। রয়েছে নক্ষত্রসমূহ, আমাদের সুর্য এবং গ্রহ-উপগ্রহ। নক্ষত্রসমুহ তার আভ্যন্তরিক বিস্ফোরণ জনিত স্পন্দনে বাইরের দেশে (space-এ) আলোক বিকীর্ণ কোরে চলেছে। গ্রহ-উপগ্রহ সূর্য থেকে পাওয়া আলো প্রতিফলিত করছে। তাছাড়া তাদের গতিও রয়েছে। দেশের বা continuum-এর নিজস্ব কোনো আলো নেই। নীহারিকা, নক্ষত্র ও গ্রহের আলোকেই দেশ আলোকিত। কবিকল্পনায়, চলমান অলোক বিকীর্ণকারী ঐ-সব নীহারিকা নক্ষত্র প্রভৃতি যেন আলেহাতে আঁধারের যাত্রী ; চলমান, স্পর্ণমান ওরাও কবির কাছে সপ্রাণ বাস্তব সত্তা, সত্য, অস্তিত্বসম্পন্ন। মানুষের জীবন-অভিব্যক্তিতে এদের কার্যকারিতা ও মানুষের অনুভবে এদের প্রেরণা অনস্বীকার্য। ছবির এমন কোনো ভূমিকা নেই। তা অনড়, গতিশূন্য, অধাতব, অসত্য, সত্তাহীন। অথচ ছবির পরিপার্শ্ব, চতুর্দিক, অস্থির চঞ্চল গতিময়। গতিসর্বস্ব জগতে গতিহীন ছবি যেন অপ্রাসঙ্গিক অসঙ্গত অবান্তর। ছবির এই স্থিরত্ব কবিকে পীড়িত করে। মহাকাশে এবং পৃথিবীতে চলমান সব কিছুর সঙ্গী হওয়ার জন্য কবির ছবিকে আহ্বান। দ্বিতীয় স্তবকে কবি স্থির ছবির সঙ্গে চারিপাশের অস্থির পরিমণ্ডলের একটি অপূর্ব কাব্যিক তুলনা রচনা করেছেন।

সকলের মাঝে থেকে সব হতে আছ এতদূরে।

স্থিরতার চির-অন্তঃপুরে?

এই ধুলি

ধূসর অঞ্চল তুলি

বায়ুভরে ধার দিকে দিকে,

বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি

তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে,

অঙ্গে তার পত্রলেখা দেয় লিখে

বসন্তের মিশন-উষায়

এই ধুলি এও সত্য হয় ।

এই তৃণ বিশ্বের চরণতলে লীন,

এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবি

-তুমি স্থির, তুমি ছবি,

- তুমি শুধু ছবি।

(২য় স্তবক)

এই অনড় ছবির অবস্থান সকল জীবনস্পতি গতিশীল অস্তিত্ববান সামগ্রীর মধ্যে। সেই সকল সামগ্রীর মধ্যে বৃহৎ ক্ষুদ্র সামান্য অসামান্য সবই আছে। কিন্তু সব কিছু-নির্বিশেষে তারা গতিশীল, সক্রিয়। চারিপাশের সব কিছুর সঙ্গে তাদের পরস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সহযোগিতা। সামান্য ধূলিকণা, সবার চরণতলে লীন তৃণরাশি, তারা তাদের অস্থির সক্রিয়তায় যে সত্য পরিচয় তুলে ধরে, ছবি সেই পরিচয় বঞ্চিত। শীতে রিক্ত পত্র রিক্ত পুষ্প উদ্ভিদ ও কুয়াশা-আচ্ছাদিত ধরিত্রী যে বিধবার বেশ ধারণ কৰে। ধূলিকণা তাকে গৈরিকর্ণে সাজিয়ে দেয় বৈশাখের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে। এতেই তার সজীব সক্রিয়তা প্রমাণিত হয়। আর বৈশাখের শুভ্র পুস্পরাশ ধরিত্রীর কপাল ও কপোলে যেন তিলক বা চিত্ররচনা কেরে দেয় । শ্যামল তৃণল সকলের পদত-লাঞ্ছিত। তবুও ধরিত্রীর সৌনসজ্জায় তার বিপুল অবদান। তার কারণ তা জীবন্ত সত্তা, তা নব নব জীবনধারাপ্রবাহে বার বার ধরিত্রীর শীতে-শূন্য প্রান্তর বসন্ত ও গ্রীষ্ম আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শ্যামল আস্তরণে আচ্ছাদিত কোয়ে দেয় । চঞ্চল ধূলিকণা ও উদ্ভিন্ন তৃণরাশির এই , সার্থকতা ছবিতে নেই, যদিও ছবির স্থান জীবন্ত ও চঞ্চল জগতেই। সকল চঞ্চলতার মধ্যে থেকেও স্থিরতার চিরন্তন অন্তঃপুরে তার অবস্থান।

কিন্তু একদিন চারিপাশের সকল প্রাণপূর্ণ সত্তার মতো সেও জীবন্ত আনন্দ সঞ্চারী, স্ফূর্ত প্রাণ-বিকীর্ণকারী ছিলো। সেদিন সকলের সঙ্গে সমতলে সে চলেছে, সকলের সঙ্গে ক্রমবিকশিত হয়ে উঠেছে। সেদিন তার becoming সকলের সঙ্গে সমভাবে।

সেদিনের সেই সত্তাকে লক্ষ্য কোরে কবির উক্তি

একদিন এই পথে চলেছিল আমাদের পাশে।

বক্ষ তব দুলিত নিশ্বাসে;

অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব

কত গানে কত নাচে

রচিয়াছে

আপনার ছন্দ নব নব

বিশ্বসাথে রেখে তাল;

সে যে আজ হল কত কাল।

(৩ স্তবক)

কবির জীবনেও তার প্রভাব সেদিন (যেদিন তিনি জীবিত ছিলেন) অন্তহীন, প্রতি মুহূর্তে নবনবায়মান। সেদিন কবি তাকে ভালোবেসে তার ভালোবাসার দুতিতে জগৎকে সৌন্দর্যসারাৎসার বদলে অনুভব করেছেন। চেতনায় যাকে সবথেকে গভীর ভাবে অনুভব করি, আমাদের জীবনে সেই সব থেকে সত্যরূপে ধরা পড়ে। সেই অনুভবের আলোকে কবির উপলব্ধি

এ জীবনে

আমার ভুবনে

কত সত্য ছিলে?

মোর চক্ষে এ নিখিলে

দিকে দিকে তুমিই লিখিলে

রূপের তুলিকা ধরি রসের মুরতি।

সে প্রভাতে তুমিই তো ছিলে

এ বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী। (৩য় স্তবক)

যার সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের যোগ, ভাবের যোগ, আত্মার যোগ সবথেকে বেশি, সেই আমাদের সবথেকে প্রিয়। বাণী বা ভাষার কাজ আভ্যন্তরিক সেই ভাবানুভবকে ব্যক্ত কোরে তোলা, প্রিয়তমের কাছে সেই হৃদয়-সংবাদ পৌছিয়ে দেওয়া। (এই জগতের বাণী আমাদের কাছে পৌচোচ্ছে (communicated হচ্ছে) তার পত্র-পুস্প, নদী-তরঙ্গ, নক্ষত্র-দীপ্তি, পাখির কূজন, মানুষের সাহিত্য সঙ্গীত ভাষার মধ্য দিয়ে। কবির কাছে এই বিশ্বের অন্তরসত্যের বাণীবাহী ছিল (message bearer) সেদিন তারই (ঐ ছবির) জীবন্ত সত্তা। কবির জীবনে তিনিই ছিলেন এ বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী। তাঁরই ভালোবাসার আলোকে সেদিন এই নিখিলের বিচিত্রবর্ণ রসমূর্তি কবির চোখে ধরা পড়েছিলো।

তারপর একদিন সেই জীবন্তসত্তার এই জগৎপ্রাঙ্গণ থেকে বিদায়-গ্রহণ। চলমান সত্তার সেদিন চিরকালের মতো থেমে-যাওয়া। চারিপাশের আর সকল কিছু কিন্তু তখনও সমান প্রাণস্পন্দিত, সমান বিকাশশীল, সমান গতিময়। একজনই শুধু নেই। সেদিনের সেই সঙ্গীর চলা থেমে গেছে, কিন্তু কবির চল থামেনি। কবি দুঃখে সুখে এখনও রাত্রি দিন সামনের দিকে চলেছেন। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন আগেরই মত সমান আবর্তমান। আকাশসমুদ্রে আলোক আঁধারের জোয়ার-ভাটা অপরিবর্তিত গতিতে প্রবহমান। ঋতুতে ঋতুতে ধরিত্রীর প্রাঙ্গণে নব নব ও বিচিত্রবর্ণ পুষ্পের আগেরই মতো আবির্ভাব-সমারোহ। এখনও চারিপাশের জীবনপ্রবাহ সহস্রধারায় দ্রুত ধাবমান জন্ম-মৃত্যুর চক্র-পরিক্রমার মধ্য দিয়ে। কবিও চলেছেন সামনের দিকে নিরুদ্দিষ্ট গন্তব্যে শুধু পথকে ভালোবেসে গতিকে একান্ত কোরে। শুধু কবির সেদিনের সেই

প্রেয়সী এই চলমান পথ থেকে নিজেকে সংবরণ কোরে নিয়ে একস্থানে স্থির। চলমান ও পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে ও পটভূমিতে কবির প্রেয়সীরই শুধু ছবি হয়ে যাওয়া। কবির এই অনুভব কবিতাটির চতুর্থ স্তবকে প্রকাশিত।

এতক্ষণ কবিতাটির মধ্যে কবির যে অনুভবের প্রকাশ তাকে, সংক্ষেপে অনুধাবন করা যাক। এর পরে কবি-মানসে ভিন্নতর প্রতিক্রিয়ার আবির্ভাব।

কবির উপলব্ধি, ছবি (প্রতিকৃতি) আমাদের যত প্রিয়জনেরই হোক-না কেন, সে আমাদের সচল জীবনধারার সঙ্গী হতে পারে না। তার জীবনকালে যখন সে সক্রিয় ও বিকাশশীল ছিলো, তখন সে তার জীবনতিতে ও জীবন-অভিব্যক্তিতে চারিপাশকে প্রাণিত করেছে, কবিকেও উদ্দীপ্ত করেছে, পরিবেশে ও প্রক্ষাপটে নব তাৎপর্য সঞ্চার করেছে। কিন্তু এখন সে শান্ত, স্থির, গতিহীন, ছবিতে পর্যবসিত। জীবন্ত প্রাণ প্রতিমুহূর্তে হয়ে-ওঠার, becoming-এর ব্যাপার। যা-কিছু আমাদের চারিপার্শ্বে হয়ে-উঠছে তারই সঙ্গে জীবন্ত-আমাদের—যোগ। কারণ আমরাও তো হয়ে-উঠছি। হয়ে-ওঠার প্রাসঙ্গিকতায় আমাদের চারিপার্শ্বের জীবন্ত সত্তা আমাদের সতীর্থ। সবাই সব পান্থজনের পান্থ-সখা। এই becoming রূপে সঙ্গী থাকতে থাকতে কেউ যদি হঠাৎ প্রান্ত-পরিণতিতে (finished product-এ) পেছিয়ে থেমে যায়, তার আর হওয়ার কিছু থাকে না, তখনই তার মৃত্যু, তার সমাপ্তি। সে তখন রি, গতিহীন, আমাদের সঙ্গহারা। তখন সে পরিবেশ থেকে কিছু নেয় না, পরিবেশকে কিছু দেয়ও না। তখন তাকে আমাদের স্মৃতিতে নানা ভাবে ধোরে রাখতে পারি, কিন্তু সেই স্মৃতিরূপের সঙ্গে তার জীবনকালেম বিকাশশীল রূপের কোনো মিল নেই। তার এক-একটি বিশিষ্ট ক্ষণ-ধৃত স্থির মৃতি আমাদের অনুভূতিতে সঞ্চারিত হতে পারে, আমরা চিত্রে, শিল্পে সাহিত্যে, ভাস্কর্যে, এমন-কি সঙ্গীতেও তার কোনো-কোনো ক্ষণিকা-ভাবমূর্তি ধোরতে পারি, কিন্তু তার অস্তিত্ববান সত্তাকে কোনো ভাবেই পেতে পারি না। কারণ

শিল্পে সাহিত্যে তার যুক্তি স্থির রেখার বন্ধনে অচল। এবং তা শিল্পী সাহিত্যিকের মানস-মুর্তি, একদা জীবন্ত সত্তার কোনো সত্য মুর্তি নয়। তার স্মৃতির কাছ থেকে আমরা প্রেরণা পেতে পারি, কিন্তু তাকে আর কিছু দিতে পারি না। সে তো আর

কোনো বিকাশশীল সত্তা নয়। প্রতিমুহূর্তের হয়ে-ওঠার মধ্যে সত্তার যে সুখদুঃখ, চঞ্চলতা-রূঢ়তা, আশা-আশঙ্কা, ভালোবাসা-দেওয়া ও ভালোবাসা-নেওয়া জীবনক্রিয়া তা আর কোথায় পাওয়া যাবে? সে। আমাদের কাছ থেকে কিছুই নিতে পারে না, এবং আমরাই বা তার কাছ থেকে কি নিতে পারি? আর তাকে কোথায় বা পাব? চিত্রে, কাব্যে, প্রতিমূতিতে? কিন্তু সে কি তাকে পাওয়া? জীবন্ত হৃদয় ছাড়া খানিকটা রঙলিপ্ত কাগজ বা রেখাঙ্কিত পত্র, বা খাোদিত পাথর! সে কী তাই? ঐ সৃষ্ট শিল্পগুলি তার স্মৃতি, মাত্র; আমাদের মনে তার পুরাতন কথা জাগিয়ে তুলবার অনুঘটক (catalytic agent) হতে পারে, কিন্তু তপ্ত হৃদয়স্পন্দিত তার ব্যক্তিসত্তাকে কোথায় পাবো? আর তা না-পেলে আমাদের তৃপ্তিই বা কোথায়? কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূতি নয়। হৃদয় জীবন্ত-হৃদয় চাইছে। শেষ স্তবকে এসে অবশ্য কবি হঠাৎ নব উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ। এতক্ষণ যাকে ছবি বেলে মনে করেছেন, অকস্মাৎ তার মধ্যে নব তাৎপর্য অনুভব করেছেন। নূতনতর সত্য, ছবিকে কেন্দ্র কোরে, উদ্ঘাটিত হয়েছে। কবির, বক্তব্য, তাকে আমরা কিছু দিতে পারি না, কিন্তু এখনও তার স্মৃতির কাছ থেকে কিছু পেতে পারি। একে আমরা বলতে পারি 'বেগের আবেগ' বা বিজ্ঞানের ভাষায় Potential impulse।সচেতন ও উর্ঘায়িত (sublimated) অনুভব বিশিষ্ট-মানুষের সকল প্রকার স্ফুর্ত জীবন-অভিব্যক্তি ও জীবন-ক্রিয়ার অন্তরালে। যে স্থির শক্তি বা vital force (বের্গসঁর ভাষায় elan vital) অবস্থিত থেকে তাকে সকল কিছুতে উদ্দীপ্ত করছে, সেটি তার ভালোবাসার পাত্রের কাছ থেকে পাওয়া প্রেরণা।প্রেমই প্রেরণায় পরিণত। প্রেমানুভূতিই সমস্ত পরিবেশকে সুন্দর কোরে তোলে। ব্যক্তি চিত্তে অনুভূত প্রেমই বাইরে অজস্র কর্মে তাকে অনুপ্রাণিত করে।

তাই শেষ স্তবকে কবির উপলব্ধি, প্রিয়তমের জীবনক্রিয়া শেষ হলেও তার অনুভাব আমাদের জীবনে কাজ কোরে যেতেই থাকে। জীবন-কালেও সে যেমন প্রভাবসঞ্চারী, মৃত্যুর পরেও তেমনি। প্রেয়সী তার জীবনকালে আমাদের চিত্তে; যে প্রেম-প্রেরণা সঞ্চারিত কোরে যায় তা অনঙ্গ থেকে অলক্ষ্যে আমাদের সফল জীবনক্রিয়াকে প্রঙাবিত ও অনুপ্রাণিত করে। আমাদের চিত্তকে যদি টর্চলাইটের ব্যাটারি বলে কল্পনা করি, তা

হলে প্রিয়তমের কাছ থেকে পাওয়া প্রেম-প্রেরণা তার বিদ্যৎ-আধান (electric charge)। আহিত (charged) ব্যাটারি যেমন টর্চ-লাইটকে চালু রাখে, তেমনি প্রিয়তমের প্রেমপ্রাণিত চিত্তও আমাদেরকে। তা আমাদের কর্মেন্দ্রিয় এবং আমাদের চেতনা দুইকেই সক্রিয় করে। আমরা তখন জীবনানন্দে মেতে উঠি, ভালবাসার আলোকে আমাদের চারিপাশকে মধুর কোরে অনুভব করি। যদিও তার প্রেম-প্রেরণা সম্পর্কে আমরা সর্বদা সচেতন নাও থাকতে পারি, তার ক্রিয়া অলক্ষ্যেই চলতে থাকে।

যে-ব্যাটারির শক্তি ক্ষয় হয়ে গিয়েছে, তা যেমন আর টর্চের আলো জ্বলতে পারে না, তেমনি কবিহৃদয়ে কবিমানসীর সমস্ত অনুতাব যদি তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যেতো, তা হলে চারিপাশ থেকে কবি আজও যে ভালোবাসা, সৌন্দর্য, আনন্দ, রসানুভূতি সংগ্রহ করেন, তা সম্ভব হতো না। তাই বাইরে কবি-প্রিয়া ছবিতে পরিণত হলেও কবির অন্তরে আর একজন জীবিত কবির মতই তিনি কবিতা রচনা কোরে চলেছেন। সেই কবিরূপী-প্রিয়তমার দৃষ্টির আলাকেই আজও রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা পড়ে নদী-তরঙ্গের সৌন্দর্য, সোনালিপাড়-মেঘের অপরূপতা, মাধবী-বনের মর্মর মুখর ছায়ার মধ্যদিয়ে ব্যক্ত কবি-প্রিয়ার অলকগুচ্ছের অনির্বচনীয় আভাস।

কী প্রলাপ কহে কবি?

তুমি ছবি?

নহে, নহে, নও শুধু ছবি।

কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে

নিস্তব্ধ ক্রন্দনে?

মরি মরি, সে আনন্দ থেমে যেত যদি

এই নদী হারাত তরঙ্গবেগ,

এই মেঘ

মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।

তোমার চিকন

চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত

তবে

একদিন কবে

চঞ্চল পবনে লীলায়িত

মর্মরমুখর ছায়া-মাধবীবনের

হ'ত স্বপনের ।

জীবন্ত সত্তারূপে কধিপ্রিয়া আজ বর্তমান নেই। কিন্তু কবির সমস্ত রক্তকণিকায়, নিশ্বাশে-প্রশ্বাসে, জীবন-মূলে তার অনঙ্গ অবস্থান । বাইরে আপাত তাকে ভুলে পাকা, কিন্তু রক্তে তার চিরন্তন'দোলা, প্রাণের ক্রিয়ায় তার নিরন্তর সুর-সঞ্চার। বাইরের দিক দিয়ে কবি যখন তার মৃত প্রিয়তমাকে ভুলে থাকেন, তখন সেই ভুলে থাকার শূন্যতাও ঐ সুর-সঞ্চারে অলক্ষ্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে। তার জীবনকালে তিনি কবির নয়নসম্মুখে সৌন্দর্য-প্রতিমারূপে প্রতিভাত হতেন। আর আজ কবির নয়নের দৃষ্টিরূপে (sight-এ) তিনি পরিণত। তিনিই কবির মধ্য দিয়ে কবি হয়ে জগৎকে দেখছেন, আবার বাইরের জগৎ-এর সকল সৌন্দর্য-প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনিই প্রকাশিত হচ্ছেন। তিনিই কবির প্রতিভায় পরিণত, কবির সৃষ্টিক্ষমতায় রূপান্তরিত। বহু দিন আগে কবি তাকে হারিয়েছেন, তখন কবির জীবন-প্রভাত। আজ যখন কবির জীবন পরিণতিতে এসে পৌঁছিয়েছে, সামনে অন্ধকার রাত অপেক্ষমাণ, তখন আবার সচেতন ভাবে প্রিয়তমাকে অনুভব। কিংবা বলা যায় সারাজীবন ধাে্রে নিজের আগোচর-অন্ধকারে কবি যাকে তার সমস্ত সৃষ্টির অভ্যন্তরে, বা প্রেরণারূপে, বা বহিঃসৌন্দর্যরূপে অনুভব করেছেন তিনি এই ছবিধত ঠারই একদা-জীবিত প্রিয়তমা।

তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে?

তুমি যে নিয়েছে বাসা জীবনের মূলে;

তাই ভুল।

অন্যমনে চলি পথে, ভুলি নে কি ফুল?

ভুলি নে কি তারা?

তবুও তাহারা

প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর,

ভুলের শূত্যতা-মাঝে ভরি দেয় সুর ।

ভুলে থাকা, নয় সে তো ভোলা;

বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।

নয়নসম্মুখে তুমি নাই,

নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাই;

আজি তাই

শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।

আমার নিখিল তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল ।

নাহি জানি, কেহ নাহি জানে,

তব সুর বাজে মোর গানে;

কবির অন্তরে তুমি কবি,

নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।

তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,

তার পরে হারায়েছি রাতে।

তার পরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি।

নও ছবি, নও তুমি ছবি। (৫ম স্তবক)

দশ বৎসর পরে কবি এই একই অনুভূতিকে আরও সংহত কোরে প্রকাশ করেছেন। তাকে স্মরণ করা যাক।

তারপরে চুপে চুপে

মৃত্যুরূপে

মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার।

দেখাশুনা হল সারা,

স্পর্শহারা

সে অনন্তে বাক্য নাহি আর।

তবু শূন্য শূন্য নয়,

ব্যথাময় অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে-গগন।

একা-একা সে অগ্নিতে

দীপ্ত গীতে

সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।

প্রেমানুভবের সবথেকে বড় সার্থকতাও কবি দীপ্তিপথে নব আবিষ্কারের মতো উপলব্ধি করেছেন, এবং আমাদের চিত্তেও সেই উপলব্ধি সঞ্চারিত কোরে দিয়েছেন। প্রেম মানুষের অনুভব ও উপলব্ধি সীমা অনেক বাড়িয়ে দেয়, তার ইন্দ্রিয়ানুভবে। নূতন মাত্রা সৃষ্টি করে, জগৎকে নব সৌন্দর্যে বিধৃত করে, প্রেমের প্রেরণায় প্রতিভার উন্মোচন ঘটে। দর্শন-শক্তির (observation) অন্তরালত সত্যের সঙ্গে একাত্মতা অনুভূত হয়। সেই একাত্মতাই কবিতার মর্মের সঙ্গে পাঠকমর্মের দ্রুতি ঘটায়। কবি মানসের সঙ্গে পাঠকমানসের আত্মীয়তা সংঘটিত হয়। কবিতার সার্থকতা ধরা পড়ে। কবিতাটির শেষে ভিন্ন চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে সেই কথা ধরা পড়ে। যেমন, কবিপ্রিয়া একদা কবির

চারিপাশ্বে যে আনন্দ-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিলেন, তা যদি আজও না-থাকতো তা হলে এই নদী হারাত তরঙ্গবেগ',/ 'এই মেঘ / মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন, কবি-উপলব্ধ বিশ্ব থেকে কবি প্রিয়ার 'চিকন চিকুরের ছায়খানি যদি মিলিয়ে যেতো, তাহলে সেই চিকুরের আভাস-লাগা চঞ্চল পবনে লীলায়িত/ মর্মর মুখর ছায়া মাধবীবনের / হ'ত স্বপনের।' এই চিত্রকল্পগুলি আমাদের মানস-দ্রবণে পরিণত হয়।

কবিতাটিতে ব্যক্ত আরও কিছু কিছু পঙক্তির কাব্যিক তাৎপর্যও গভীর রসঞ্চারী। বক্তব্যের বৈপরীত্যের অন্তর্নিহিত সত্য, আপাত অসম্ভবের অন্তরাল অপরূপ সম্ভাব্যতা, বিভিন্ন উপমা-উৎপ্রেক্ষার অভিনবত্ব প্রভৃতি আশ্চর্য কাব্যিক ব্যাঞ্জনা সৃষ্টি করেছে।

খ। শাজাহান (৭ সংখ্যক)

কবিতাটি বলাকা কাব্যগ্রন্থের তথা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। বাংলা সাহিত্যের ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা বটে। একই সঙ্গে দীপ্তি ও দ্রুতি, অনুভব ও উপলব্ধি-সঞ্চারক এই কবিতাটি । তত্ত্ব হিসেবে কবিতাটি বড়, কাব্য হিসেবে তদধিক, একথা বলেছেন অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী। কবিতাটির মূল তত্ব সূত্রকারে বলা যায় ১. জগতের সব কিছু ক্ষণস্থায়ী, বিশেষ ভাবে জৈব জগৎ। এই ক্ষণস্থায়িত্ব আমাদের সুগভীর বেদনার কারণ।

২. এই ক্ষণস্থায়িত্ব থেকে মুক্তির জন্য মানুষ শিল্প-সাহিত্য রচনা করে। শিল্পের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে মানুষ চেষ্টা করে ক্ষণস্থায়ীকে চিরন্তনত্বে উত্তীর্ণ কোরে দিতে। মানুষ নিজের প্রেমানুভবকে শিল্পের মধ্য দিয়ে স্থায়ী করবার প্রযত্ন করে।

৩. কিন্তু শিল্পের মধ্য দিয়ে যা ধরা পড়ে তা প্রেমের পাত্র নয়। অতিমাত্র। প্রেমিক, প্রেমের উদ্দিষ্ট, কেউই শিল্পের দ্বারা বাঁধা পড়ে না। কারণ মানব- চলমান সত্তা। তা অনন্ত গতিশীল। জীবন-কালে তা যেমন নিয়ত পরিবর্তনশীল। বাল্য থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন, যৌবন থেকে প্রৌঢ়, প্রৌঢ়ত্ব থেকে বার্ধক্য এবং বার্ধক্য থেকে মৃত্যুতে, তেমনি মৃত্যুর পরেও জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দির তার অনন্ত গৃতি। নিজ-রচিত শিল্পের আকর্ষণে সে যেমন খাবরে পরিণত হয় না, তেমনি যার উদ্দেশ্যে তার

শিল্পরচনা, তার চঞ্চল সত্তাকেও সে ধরে রাখতে পরে না অনন্তকাল। আম, শিল্পীর বা শিল্প-উদ্দীষ্ট যারই হোক-না-কেন, সে শিল্পকে পাশ-কাটিয়ে, সৌন্দর্য-আকর্ষণকেও দুহাতে সরিয়ে দিয়ে অনন্ত বিশ্বপথে চলতে থাকে।

৪. কিন্তু সেই আত্মা বা সত্তা (যে অভিধায় তাকে নির্দেশ করিনা কেন) তা এমন কিছুর স্থায়ী বীজ রেখে যেতে পারে, যা কালক্রমে বিকশিত হয়ে দীর্থ কাল ধরে সমকালীন ও অনাগত ভবিষ্যতের মাব-মানবীর কাছে একটি মৃত্যুহীন উপলব্ধি ব্যক্ত করে। সে উপলব্ধি প্রেমের, সৌন্দর্যের, করুণার বা প্রজ্ঞার।.

৫. কবির মৃত্যু-দর্শন।

বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত কবিতাগুলিতে শিল্পের বিচিত্র বিশিষ্টতাসমূহ ধরা পড়েছে। শিল্পের কাজ অসীম ভাবকে সীমাবদ্ধ রূপ-সৌন্দর্যের মধ্যে প্রকাশ করা। 'ছবি' করিতায় 'শিল্প মানব-মানবীর চিত্ত সেই potential energy, যা kinetic energy রূপে তার নানা ক্রিয়া উপলব্ধি ও অনুভবকে ব্যক্ত করে। যা চৈতনা-উদ্দীপকও প্রেরণা-সঞ্চারক। 'শাজাহান' কবিতায় শিল্প বৃহৎ উদ্ভিদের সম্ভাবনাবহ বীজের মত। বর্তমানের ও অনাগত মানব-মানবীর কাছে তা বিপুল আনন্দ-সৌন্দর্যময় উপলব্ধি বা প্রেমের সঞ্চারক । কিন্তু গতিময় মানব আত্মাকে তা কোনোভাবে স্থানগত বা কালগত কোনো সীমায় বন্ধ করতে পারে না। জীবিত মানুষই শিল্প সামগ্রী (ছবি বা তাজমহল প্রভৃতি)-র কাছ থেকে প্রেরণা বা উদ্দীপনা পেতে পারে, যার ফলে সারা জগৎ তার কাছে সৌন্দর্যের আলম্বন-বিভাব মনে হয়। কিন্তু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুক্ত আয়া গতির প্রবণতায় সকল স্থবির আকর্ষণকে অতিক্রম কোরে চোলে যায়। (শাজাহান কবিতাটি একদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদর্শনের কবিতাও বটে।) মুত্যুর পরে মানবআর যে-প্রবণতা থাকুকনা-কেন, মৃত্যুর আগে মানুষ শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়ে তার ভালোবাসাকে, এবং ভালোবাসার পাত্রকে, তার প্রিয়তম বা প্রেয়সীকে চিরন্তনত্ব দিতে চায়। মানুষের অভিজ্ঞতা, কিছুই থাকে না। বজ সুকঠিন রাজশক্তি সন্ধ্যার পশ্চিমাকাশে মেপে-প্রতিফলিত ক্ষণস্থায়ী রক্তিম বর্ণাভাসের মতো দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায়। রাজকীয় ঐশ্বর্য, সম্রাটের অতি মূল্যবান হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা ইন্দ্রধনুচ্ছটার মতো দেখতে

দেখতে বিলীয়মান। মানুষের শেষ আশা, সকল বস্তুর এই মূল্যহীনতা ও ক্ষণস্থায় কে একমাত্র অতিক্রম করতে পারে শিল্প, তার সৌন্দর্যময় সৃষ্টিসম্ভার।

মোগলসম্রাট শাজাহানও তাই ভেবেছিলেন। সমস্ত হয় দিয়ে ভালো, বেসেছিলেন তার প্রিয়তমা মমতাজকে। তিনি জানতেন, তাঁর সব ঐশ্বর্য তুচ্ছ পর্যবসিত হবে, ধাবমান কালস্রোতে জীবন যৌবন ধন মান ক্ষমতা প্রতাপ সব কিছু ভেসে যাবে। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রেমকে তুচ্ছতা ও মূল্যহীনতা। থেকে, বিস্মরণের ধূলি-আবরণ থেকে মুক্ত কোরে রাখবেন স্মৃতিমনিরের দ্বারা, যে স্মৃতি-মন্দির হবে শিল্প-সার। সৌন্দর্যের অভিব্যক্তিতে যা মানুষের মনকে চিরকাল অধিকার কোরে থাকবে। মমতাজের বিরহ-স্মৃতির বেদনা একটি নিটোল অশ্রু বিন্দুর মতো অনাদ্যন্ত মহাকাল-রমণীর কপোলে টলটল করতে থাকবে। শুভ্রতায় তা আগত ও অনাগত মানুষের সৌন্দর্য-চেতনাকে স্বাগত জানাবে।

প্রথম স্তবকে পার্থিব সামগ্রীর করুণ নশ্বরতা ও তার পটভূমিকায় প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখবার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টার যে-পরিচয় উপরে ব্যক্ত, তার পরে দ্বিতীয় স্তবকে সেই আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টাকেও পরিহাস করা হয়েছে জীবনের ক্ষ স্রোতে ভাসমান মানবহৃদয়ের তীব্র গতিময়তার জন্য। সময় নেই সময় নেই। হির হয়ে বেসে প্রেয়সীর প্রেমানুভবের সময় নেই, চারিপাশের পরিবেশ ও প্রকৃতির সৌন্দর্য-অনুভবের সময় নেই, সময় নেই জীবনকে রসিয়ে উপভোগের। যে অনুব করবে সে যেমন অবিরাম গতিশ্মল, তেমনি যাকে বা যে-পরিবেশকে সে অনুভব বা উপভোগ করতে চায়, তা-ও মুহুর্মুহু পরিবর্তমান। মানবসত্তা সওদাগরের মতো এক হাটে পণ্যক্রয় কোরে অন্য হাটে তাকে বিক্রয় কোরে দিচ্ছে। আবার সেই অন্য হাটে অন্য পণ্য ক্রয় এবং ভিন্নতর হাটে তাকে বিক্রয়। কৈশোরের কত পণ্য কিনে নিচ্ছে যৌবন, পিতার কাছ থেকে ক্রীত পণ্য বিক্রীত হচ্ছে সন্তানের কাছে, প্রাচ্য থেকে সংগৃহীত পণ্য ক্রয় করছে পাশ্চাত্য, ভালোবাসা দ্বারা প্রাপ্ত প্রেয়সী প্রিয়তমের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে সন্তানের কাছে, কামনার ল্যে নীর বক্ষে সঞ্চারিত স্তন্য, বাৎসল্যের মূল্যে পুষ্টি জোগাচ্ছে পুত্রের। এমনই

কোরে অতি তীব্র দ্রুততায় আমরা একহাটে বোঝা সংগ্রহ কোরে, অন্য হাটে তাকে বিক্রি করে দিচ্ছি।

আমাদের চারিপাশের পরিবেশ সম্পর্কেও একই কথা সত্য। বসন্তের ফুল ফুটতে না-ফুটতেই খবর পেয়ে যায়, গ্রীষ্মের স্পর্শে তার ঝরে-যাওয়ার সময় হয়। শীতের কুন্দ ফুল শীত বিদায় নেওয়ার আগেই অপহৃত। আমাদের কোনো সঞ্চয় কোনো সম্পদ, কৈনে বিত্তই আমাদের চলমান সত্তার অবিচ্ছিন্ন সঙ্গী নয় । সত্তা চলমান, পথ ভিন্নতর, পথপার্শ্বের পান্থজন-সখা প্রতিক্ষণে বিচিত্রতর । ছাড়তে ছাড়ত, হারাতে হারাতে সত্তার এই পথচলা। তাই তো উপনিষদ বলেন, 'ত্যক্তেন ভুঞ্জিতা' বত্যাগ করতে করতে চলো। আর সেটিই তো সার্থক ভোগ।

হায় ওরে মানবহৃদয়,

বার বার

কারো পানে ফিরে চাহিবার

নাই যে সময়,

নাই নাই।

জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই

ভুবনের ঘাটে ঘাটে –

এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে।

দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে।

তব কুঞ্জবনে

বসন্তের মাধবীমঞ্জরী

যেই ক্ষণে দেয় ভরি।

মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,

বিদায়গোধূলি আসে ধুলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।

সময় যে নাই;

আবার শিশির রাত্রে তাই

নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোল' নব কুন্দরাজি

সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।

হায় রে হৃদয়

তোমার সঞ্চয়।

দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।

নাই নাই, নাই যে সময়।

কিন্তু উপনিষদের এই উপদেশ মন মানে না মন চায় ভালোবাসার ধনকে, মৃত হলেও, চিরঞ্জীবী কোরে রাখতে। এবং মনে ভাবে আমি ভালোবাসি যারে/ সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে।' মন তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় অন্তত শিল্প-প্রতীক রূপে ; স্মৃতিমন্দির, কবিতা, চিত্র বা অন্য কোনো শিল্পের অবয়বে। সৌন্দর্যই তো চিরন্তন আনন্দ সঞ্চারী। A thing of beauty is a joy for ever .মানুষ মনে করে, চিরন্তন কালপ্রবাহকে সে সৌন্দর্য দিয়ে ভোলাবে। যে মরণ সমস্ত রূপময়ত থেকে সত্তাবে যুক্ত করে, দেহের সীমা থেকে আমাকে ভাবরূপে উত্তীর্ণ কোরে দেয়, স্মৃতিমণির বিচিত্র ভাস্কর্যের ও স্থাপত্যের মধ্য দিয়ে অপরূপ রূপসজ্জায় সেই মরণ ব্যক্ত হবে। 'তাজমহল' হবে 'রূপহীন মরণের মৃত্যুহীন অপরূপ প্রকাশ, বিচিত্র শিল্প ও মাধুর্যে ব্যক্ত। এবং শাজাহান-প্রিয়তমার চিরন্তনত্বের স্বাক্ষরবহ সৌন্দর্য-আনন্দ প্রতিমা। মমতাজ-বিচ্ছেদের যে অশান্ত ক্রন্দন তার চিত্তকে বেদনায় বিদীর্ণ কোরে দিচ্ছে, জীবিত সম্রাটের নানামুখী ও বিচিত্র-পথযাত্রী কর্মধারা তাকে অনুভব কোরবার অবকাশ দেয় না। তাই সেই বেদনাকে কঠিন প্রস্তরে স্থায়িত্ব দিলেন এই সম্রাট কবি, নির্বাক

প্রস্তরের অন্তরের অন্তস্থলে রইলো প্রবহমান অদৃশ্য অশ্রুসঞ্চয় এ হলো tears in marble। বিচিত্র অনুভবসমূহ প্রতীকায়িত হলো প্রশান্ত মণ, নানা চিত্রখচিত তাজমহল-স্থাপত্যের সামগ্রিক প্রকাশের মধ্যে। পূর্ণিমা রাত্রে আগ্রার দূর্গ প্রাসাদের ছাদে বেড়াতে বেড়াতে সম্রাট মৃদুস্বরে তাঁর প্রেয়সীকে যে নামে ডাকতেন, তাজমহলের মর্মর প্রস্তরে তা মূর্তিমান হয়ে ধরা রইলো। যা ছিল সেদিনের ব্যক্তিগত প্রেমিক প্রেমিকার কানে কানে ডাকা, তা সর্বাত্মক রূপ পেয়েছে এই প্রস্তর-মন্দিরের মধ্যে। তাজমহলের প্রশান্ত পাষাণে খচিত সুন্দর পুষ্পপুঞ্জ ব্যক্ত করছে সম্রাটের করুণকোমল প্রেমাভিক্তি

হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়

চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয়হরণ

সৌন্দর্যে ভুলায়ে।

কণ্ঠে তার কী মালা দুলায়ে

করিলে বরণ

রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে?

রহে না যে

বিলাপের অবকাশ

বারো মাস,

তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে

চিরমৌনজাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে।

জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে

প্রেয়সীরে

যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে

সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে

অনন্তের কানে।

প্রেমের করুণ কোমলতা

ফুটিল তা

সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।

(৩য় স্তবক / প্রথম ১৯ পঙক্তি)

তাজমহল স্মৃতিমন্দিরকে কবি বিচিত্রমুখী প্রতীকে ধরেছেন। তৃতীয় স্তবকের প্রথমাংশে উদ্ধত পঙক্তিগুলিতে তার নানা পরিচয় আমরা পেয়েছি। রূপহীন মরণের মৃত্যুহীন অপরূপ সজ্জায় ব্যক্ত এই সমাধিমন্দিৰ সম্রাটের অশান্ত বিচ্ছেদ বেদনার প্রস্তরত কঠিন মৌনীরূপ, প্রেয়সীকে কানে-কানে ডাকার অস্ফুট বাণীর মূর্তিময় অভিব্যক্তি, করুণ প্রেমের কোমল প্রকাশ । কিন্তু কবির কাছে এর সব থেকে মহৎ যে প্রতীকায়িত রূপ ধরা পড়েছে, তা হলো, এ যেন এক মহৎ কবির কাব্য। প্রেমের একটি নিটোল গীতিকবিতা। কবি কালিদাস লিখেছিলেন সার্থকতম প্রেমের ও বিরহেয় গভীরতম কাব্য ‘মেঘদূত’। এও যেন আর একখানি মেঘদূত। কবি ‘তাজমহল’ স্মৃতিমন্দিরকে লক্ষ্য করে এবং শাজাহানকে উদ্দেশ্য কোরে বলেছেন,

হে সম্রাট কবি,

এই তব হৃদয়ের ছবি,

এই তব নব মেঘদূত,

অপূর্ব অদ্ভুত

ছন্দে গানে

উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে

যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া।

রয়েছে মিশিয়া

প্রভাতের অরুণ-আভাসে,

ক্লান্তসন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,

পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য বিলাসে

ভাষার অতীত তীরে

কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে।

তোমার সৌন্দর্যদুত যুগ যুগ ধরি

এড়াইয়া কালের প্রহরী

চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া

'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।' (৩য় স্তবক/শেষাংশ)

মেঘদূত কাব্যে যক্ষের হৃদয়ের বিরহ-আকুলুর বার্তা বহন—কোরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছিল মেঘদূত। তাকে যেতে হবে অলকাপুরীতে যক্ষের প্রিয়তমার কাছে, বিরহের বেদনায় যে যক্ষপ্রিয়া মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থলপদ্মের মতো যে সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিতও নয়, আবার একেবারে অক্ষুটও নয়। শাজাহান কবিতাতেও শাজাহান তাজমহল সমাধিমন্দিরকে নব মেঘদূতের মত তার বিরহবেদনার বার্তাবহ কোরে তুলেছে।

এই স্মৃতি-শিল্পের মধ্য দিয়ে শাজাহানের প্রেম যে-প্রেয়সীর উভেঙ্গে প্রেরিত, সেই প্রেয়সীও যক্ষপ্রিয়ার মতো বিরহ-পীড়িত। তবে তার মতো সে অনতিক্ষুট নয়, সে একেবারে অনগ্ন হয়ে গেছে। এই অনঙ্গ-প্রেয়সীর অভিব্যক্তি চারিপাশের পরি মণ্ডলের সুকুমার মাধুর্যের মধ্যে। অরুণবর্ণের আভাস নিয়ে ব্যক্ত প্রান্তে আলোয়, অপহৃয়মান সন্ধ্যার অস্বচ্ছ আলোয় অক্ষুট-দৃষ্ট দিগন্তের করুণ একাণে, বা পূর্ণিমায় প্রস্ফুটিত চামেলির অতমুলাবণ্যে; অনির্বচনীয় সেই বিরহিণীর ইন্দ্রিয়াতীত প্রকাশ । শাজাহানের

এই নব মেঘদুত (তাজমহল) ঐ অতনু-তনিমার কাছে শাজাহানের হৃদয়োত্থিত যে-বাণী পৌছিয়ে দিচ্ছে, তা হলো, মমতাজ, আমি তোমাকে ভুলি নি প্রিয়তম।

শাজাহানকে লক্ষ্য কোরে কবির উক্তি, এ-জগৎ এবং জগৎ সবকিছু ক্ষণস্থায়ী। সম্রাট, তুমি এই জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে, তোমার রাজ্যও আর নেই। তোমার প্রবল প্রতাপান্বিত শক্তিধর সৈন্যদলও আজ শুধু পুরাতন স্মৃতির মতো, তাদের বাস্তব সত্তা অতীত। প্রভাতে বন্দনাকারী বৈতালিক, নৃত্যপরায়ণ পুর সুন্দরী, যমুনাকল্লোলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নহবত থেকে উত্থিত হতে থাকা সঙ্গীত, সব কিছু নিয়ে সেই দিনগুলি আজ অপসারিত। সেদিনের নানা নৃত্যগীত-প্রতাপ রাজনীতি নিয়ে পারাবত কাকলির মতো শব্দপূর্ণ প্রাসাদ আজ ভগ্ন, বিধ্বস্ত। সেদিনের সেই শব্দ ও সঙ্গীতের অবশেষ রয়েছে আজকের ভগ্নপ্রাসাদের কোণ থেকে উত্থিত বিল্লির গানে। কিন্তু এই মৃতের সাম্রাজ্যে তাোমার মেঘদূত, তোমার তাজমহল, তোমার সৌন্দর্যসত্তা, তার সকল অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে বর্তমান ও অনাগতকালে তোমার প্রিয়তমার কাছে তোমার প্রেমের বাণী ঘোষণা করছে

তবুও তোমার দূত অমলিন,

শ্রান্তিক্লান্তিহীন,

তুচ্ছ করি রাজ্য-ভাঙাগড়া,

তুচ্ছ করি জীবনমৃত্যুর ওঠাপড়া

যুগে যুগান্তর কহিতেছে একস্বরে।

চিরবিরহীর বাণী নিয়া-

ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।

(৪র্থ স্তবক / শেষ ৮ পঙক্তি)

কিন্তু সত্যিই কি না-ভুলে থাকা যায়? কে ভুলবে না? এবং কাকেই বা মনে রাখবে ? বস্তুত: প্রিয়তমকে চিরন্তন কোরে মনে রাখা সম্ভব নয়, কারণ বিনি মনে রাখেন তিনিই তো চিরন্তন নন।

মৃত্যুতে শরীরের ধ্বংস । কিন্তু শরীরমুক্ত আয় শুদ্ধ সত্ব। তিনিই শরীর ধারণ কোরে জীবরূপে ব্যক্ত, আবার মৃত্যুর পর তিনি দেহমুক্ত আত্মা। পার্থিব জীবনের সকল মোহ ও আকর্ষণ থেকে মুক্ত এই আয়া। পৃথিবীর জীবনকালে অর্জিত সর্ব প্রকার সংস্কার ও স্মৃতি থেকেও তা মুক্ত। পার্থিব কোনো আকর্ষণই তার অনন্ত গতিপথে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। তার প্রেম, প্রেয়সীর স্মৃতির প্রতি তার সুগভীর ভালোবাসা, সেই ভালোবাসাকে কেন্দ্র কোরে শিল্প-রচনার প্রেরণা, এ সবই তার পার্থিব আয়ুকালের আকৃতি। স্মৃতিমন্দির মৃতব্যক্তির স্মৃতির মন্দির। মরণকে বা মৃত ব্যক্তিকে সে স্মরণ করায়, যারা বেঁচে আছে তাদের মনে। তাজমহল পার্থিব দর্শকদের সৌন্দর্যানুভূতি, প্রেমানুভূতি ও আনন্দানুভূতি-সঞ্চারক। কিন্তু এই স্মৃতি-মন্দির মমতাজ বা শাজাহান, কারো আত্মাকেই ধোরে রাখতে পারে না। এবং এ সত্য কেবল মাত্র শাজাহান বা মমতাজ-সম্পর্কেই সত্য নয়। সকল প্রাণী-সম্পর্কেও সত্য। জন্ম-জন্মান্তরে, কালে কালান্তরে, দেশে দেশান্তরে, বিভিন্ন নক্ষত্রে, গ্রহে, আয়ার গতি। সকল ক্ষেত্র থেকে তার আহ্বান, সকল লাোকে তার নিমন্ত্রণ। টলস্টয় বলেছিলেন, মানুষের জন্য মাত্র সাড়ে তিনহাত জমি দরকার। তাই শুনে নাকি শেকড়, বলেছিলেন, সে তো কেবল মৃতদেহটুকুর জন্য, That is for the corpse। কিন্তু মানুষের জন্য তো দরকার সারা বিশ্ব। শেকড়, এবানে মানুষ অর্থে, বুঝে বা না-বুঝে, আত্মাকেই নির্দেশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'জীবন' শব্দের দ্বারা পঞ্চম ওকে ঐ আত্মাকেই নির্দেশ কোরে বলছেন, পূর্বের স্তবকের শেষ পঙক্তি 'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া'র অনুবৃত্তিরুপে

মিথ্যা কথা কে বলে যে ভোল' নাই?

কে বলে রে খোল' নাই

স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার? (-৫ম স্তবক /১ম ৩ পঙক্তি)

কদাচ নয়। বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়ে মমতাজের স্মৃতি থেকে তা মুক্ত। সমাধি-মন্দির স্থির, একই স্থানে বদ্ধ। কিন্তু জীবন বা সত্তা বা আত্মাকে -

কে রাখিতে পারে?

আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।

তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে

নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।

'স্মরণের গ্রন্থি টুটে

সে যে যায় ছুটে

বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।

জীবন, বা আত্মা বা সত্তা, যে নামেই তাকে নির্দেশ করা হোক-না-কেন, তা সকল সঙ্কীর্ণ সীমাকে, সে সীমা দেশের, বা কালের, বা স্মৃতির, যারই হোক-না কেন, ছাড়িয়ে যায়। দেশের বা কালের সীমা যত বিশালই হোক, তাতাকে বারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আত্মা নিজের দেহসহ সকল পার্থিব আকর্ষণের সামগ্রীকে উৎসব শেষে বর্জিত মৃন্ময় পানপাত্রের মত দুই পায়ে ঠেলে চলে যায় অনন্তের দিকে।

সত্তা অনন্ত সম্ভাবনাময়। সে যা সৃষ্টি করে পার্থিব জীবনকালে তার থেকে আরো বেশি সৃষ্টির সম্ভাবনা ও ক্ষমতা তার। এবং নিজের সৃষ্টির মোহে আত্মা বদ্ধও নয়। বার বার নিরচিত সৃষ্টি, নিজের যে বিপুল কীতি, তাকে সে অতিক্রম করে। তাজমহল যত সুন্দর শিল্প হোক-না-কেন, এবং শাজাহানের দৃষ্টি প্রতিভার যত পরিচয়বহ তা হোক, তাকে অতিক্রম কোরেই শাজাহান-আত্মার মহাপ্রয়াণ। একথা সকল মনুষ্য সম্পর্কেই সত্য। এখানে মহারাজ কেবল শাজাহানকেই বলা হয়নি। সকল মানুষকেই তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারণ সকল মানুষই বিপুল সম্ভাবনাগর্ভ, সকল মানুষই প্রতিমুহূর্তে চিন্তায় ভাবনায় অনুভবে কল্পনায় ক্রিয়ার এবং ভালোবাসায়, 'তাজমহলের অনুকল্প সৃষ্টি কোরে চলেছে। তা কখনও অদৃশ্য কথনও দৃশ্য। কবির এই চেতনারই-পরিচয়বহ উচ্চারণ

মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন

পারে নাই তোমারে ধরিতে;

সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে

নাহি পারে

তাই এ ধরারে।

জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে

মৃৎপাত্রের মত যাও ফেলে।

তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,

তাই তব জীবনের রথ।

পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার

বারম্বার।

তাই

চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।

(৫ম স্তবক, ১৯-৩০ পঙক্তি)

সত্তা বা জীবন চলমান। যে-প্রেম ঐ চলার সহায়ক নয়, সার কাছে তা বর্জনীয়; এই চলার পথে যা প্রতিবন্ধক, তাকে সে অতিক্রম কোরে যাবেই। সেই প্রতিবন্ধক যত সুন্দর, যত আকর্ষণীয় যত মোহসঞ্চারী হোক না-কেন। মানুষের সব থেকে বড়ো মোহ নিজের সৃষ্টিতে এবং প্রেমে। তা রাজকীয় ময়ুর-সিংহাসনের মতো বহু মণিমুক্তাখচিত ঔজ্জ্বল্যে আমাদের চিত্তকে আবিষ্ট করে। তা যেন বিলাসী গদগদ ভাষণে আমাদের সম্ভাষণ কোরে অনুরোধ করে, আর কিছুক্ষণ ঐ আসনে বসে যাওয়ার জন্য। যে-পথ চলার, সেখানে ঐ সিংহাসন পেতে উক্ত মোহসঞ্চারী প্রেম ও কীর্তির অনুরোধ, চলমান

সত্তার পা জড়িয়ে ধরে। কিন্তু আয় উক্ত বাধা ও আকর্ষণ উপেক্ষা কোরে চলে যায়। পথের বাধাকে সে পথেই ফিরিয়ে দেয়। স্বকীয় কীতিকে সে উৎসবশেষের মাটির পানপাত্র-অপেক্ষা বেশি মুল্য দেয় না। এসব কিছু ছাড়তে ছাড়তে, বর্জন করতে-করতে তার যাত্রা।

যে প্রেম সম্মুখপানে

চলিতে চালাতে নাহি জানে,

যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,

তার বিলাসের সম্ভাষণ

পথের ধূলার মতো জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে,

দিয়েছ তা ধুলিরে ফিরায়ে।

(৫ম স্তবক, ৩১-৩৬ পঙক্তি)

কিন্তু তাজমহল যদি কেবল উক্ত মোহ ও অর্থহীনতার বাণীবহ একটি শিল্প সামগ্রী মাত্র হতো, তা হলে তা তার স্রষ্টার কোন্ অমর্ত্য পরিচয়কে বহন করতে? সত্তা যদি অনন্ত গতিময় ও অসীম গুণবিধৃত আত্মা হয়, তা হলে তার সকল প্রকাশ সকল অভিব্যক্তিও কি তাই নয়? শিল্প কি শিল্পীসত্তার একটি আত্মিক প্রকাশ নয়? অবশ্যই তা আত্মারই অন্যতম প্রকাশ। তা বৃক্ষের বীজের মতো। নব নব অঙ্কুরোদ্গমের দ্যোতনা এই বীজ পুরুষানুক্রমে বহন কোরে চলে। পুরুষানুক্রমে। তার ক্রমবিকাশই তার অনন্ত পথ-চলা, আর অনন্ত পথ-পরিক্রমার মতো। প্রেমানুভবও তাই। একজনের প্রেমানুভবের অভিব্যক্তি শিল্পরূপে যখন প্রকাশিত। তখন তা দীর্ঘকাল অপরের মনে প্রেমকে সঞ্চারিত কোরে চলে। প্রেমই সত্তার সার্থকতম আত্মপ্রকাশ। জীবাত্মা (ব্যক্তিরূপে সীমাবদ্ধ আত্মা) জগৎ-ব্যাপ্ত আত্মা সমুদ্র বা পরমাত্মার কাছ থেকেই এই বিশিষ্টতা আহরণ করেছে। সমুদ্রের জল ঘটিতে পুরলে ঘটির জল জলত্ব পরিহার করে না। একই জল থাকে। পরমাত্মার প্রেমও জীবাত্মায় একই প্রেমরূপে বিরাজিত। এবং

জীবাত্মার প্রয়াণের পরও তার শিল্পরূপী প্রকাশের মধ্যে এই প্রেম বীজরূপে থেকে যায় ও অনাগত ভবিষত্রে মানুষের। মধ্যে প্রেমানুভব সঞ্চারিত করে। নিম্নের উদ্ধৃতিতে এই সত্যেরই প্রকাশ ।কিন্তু এই বীজ সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি ঘোষণা করে। সেই ঘোষণা কবিতা টির শেষ এগারে পঙক্তিতে। শাজাহান চলে গেলেও সেই বীজ অমর অঙ্কুরে /উঠেছে অম্বর পানে, গাহিছে গম্ভীর গানে - .

যত দূর চাই ।

নাই নাই, সে পথিক নাই।

প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,

রুধিল না সমুদ্র পর্বত।

আজি তার রথ।

চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে

নক্ষত্রের গানে

প্রভাতের সিংহদ্বার-পানে ।

তাই

স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি,

ভারমুক্ত সে এখানে নাই।' (৫ম স্তবক)

দেহমুক্ত আত্মার সর্ববাধা-অতিক্রমকারী গতিবেগের পরিচয়বহ উপরি-উক্ত পঙক্তিগুলি। শেষ পঙক্তির পূর্ব-পঙক্তির 'আমি' এখানে সেই প্রেমের বীজ যা তাজমহল রূপ স্মৃতিমন্দিরে সংগুপ্ত। তা এই জগতে ভূমিবদ্ধ থেকে প্রেমানুভবের বিকিরণ ঘটিয়ে চলে দিনের পর দিন । কিন্তু তার মধ্যদিয়ে এই সত্যও ব্যক্ত হয়, এই শিল্পের স্রষ্টা শাজাহান-রূপ ব্যক্তিসত্তা সকল ছোট-বড় পার্থিব আকাণ-মুক্ত হয়ে, প্রিয়তমা, সম্পদ, রাজ্য, সমুদ্র, পর্বত সকল বাধা পেরিয়ে নক্ষত্র-গ্রহ-উপগ্রহ নীহারিকার মধ্যদিয়ে-

অভিব্যক্ত এই বিশ্বের সামগ্রিক ঐকতানের অন্যতম তান রূপে অন্ধকার পেরিয়ে (রাত্রির আহ্বানে), আলোকের উদ্দেশে (প্রভাতের সিংহদ্বার পানে) চলমান। তাজমহল ধরে থাকে মমতাজ ও শাজাহানের স্মৃতি। আর উক্ত দুই সত্তা মুক্তভার-হয়ে তাজমহল-থেকে বিযুক্ত ও অনন্ত পথে প্রস্থিত।

তাজমহলের শেষ দুটি লাইনের সর্বনাম 'আমি' ও 'সে'-যে চলে যায় সেই হচ্ছে 'সে', তার স্মৃতিবন্ধন নেই; আর যে অহং কাঁদছে সেই তো ভার-বওয়া পদার্থ । এখানে আমি বলতে কবি নয়, 'আমি-আমার ক'রে যে কান্নাকাটি করে সেই সাধারণ পদার্থটা। আমার বিরহ, আমার স্মৃতি আমার তাজমহল' যে মানুষটা বলে তারই প্রতীক ওই গোরস্থানে, আর মুক্ত হয়েছে যে, সে লোকলোকান্তরের যাত্রী-তাকে কোনো-একখানে ধরে না, না তাজমহলে, না ভারতসাম্রাজ্যে, না শাজাহান-নামরূপধারী বিশেষ ইতিহাসের ক্ষণকালীন অস্তিত্বে।

ছবি ও শাজাহান এর তুলনা

ছবি ও শাজাহান কবিতাদ্বয়ের তুলনা চলতে পারে। দুইয়ে মিলে একটি পরিপূর্ণ ভাব। দুটি কবিতার চিন্তা, শিল্পের সঙ্গে মানবজীবনের ও জাতের। সম্পর্ক নিয়ে। মানুষের অপূরের প্রতি ভালোবাসা, ভালোবাসার পাত্রকে এ নিজের প্রেমকে চিরন্তন কোরে রাখার প্রয়াস, প্রিয়তমকে স্মৃতিরূপে স্বকীয় চেতনায়, এবং স্মৃতিকে শিল্পরূপে বাইরের মানুষের সৌন্দর্যমুভবে পরিণত করবার প্রচেষ্টায় ব্যক্তিমানুষের অদম্য আকৃতি । শিল্প-রচনার মধ্য দিয়ে মানুষ বাঁচতে চাইছে নিজে, এবং বাচাতে চাইছে নিজের প্রিয়তমকে চিরকালের জন্য। কবিতা দয়ের মধ্য দিয়ে কবি এই বাচা ও বাঁচানোর প্রাসঙ্গিকতায় আরো কিছু 'সুগভীর ভাবনা আমাদের উপহার দিয়েছেন। প্রথম কবিতাটিতেভাবনার প্রসার একটি ছবিকে কেন্দ্র কোরে, এবং দ্বিতীয়টি একটি স্থাপত্য-ভাস্কর্যকে কেন্দ্র কোরে ছবিটি কবির অতি প্রিয় একজনের, এবং ছবিকে কেন্দ্র কোরে কবির মন্ময় ভাবনা ও অনুভব। দ্বিতীয়টি শাজাহান-প্রিয়তমা মমতাজের অতিমন্দির, এবং এই পতি মন্দিরকে কেন্দ্র কোরে শাজাহানের ভাব ও ভাবনা। মৃত্যু-উত্তর শাজাহান-সত্তার পরিণতি কবি নিজ-অনুভবে ধরবার চেষ্টা করেছেন। শিল্পবস্তু সম্পর্কে কবির প্রথম

কথা, শিল্পসামগ্রী কতদূর জীবনাভাস দিতে পারে। জীবিত ব্যক্তির জীবনকালের প্রতিদিনের চঞ্চলতা, প্রাণের বিচ্ছুরণ, সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে তার প্রতিদিনের অভিব্যক্তি ; প্রতিক্ষণে, প্রতিদিন, মাসে-ঋতুতে বৎসরে তার নব-নবায়মান হয়ে-ওঠা (becoming); তার জীবনলীলা ও প্রাণের ফুরণ, সকলের সঙ্গে সমভাবে জীবনপথ-পরিক্রমা, এর কোনো কিছুই কি শিল্প সামগ্রী আভাসিত করতে পারে ? ছবি কবিতায় কবির উত্তর, তা সে পারে না। ছবি কবিতায় কবি শিল্পে-ধৃত বা ছবির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ব্যক্তির (এখানে, কবির বৌদি কাদম্বরী দেবীর, বা কবির স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু-উত্তর বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে চেয়েছেন।) শাজাহান কবিতায় অবশ্য শিল্পে ধৃত মমতাজের মৃত্যু উত্তর বৈশিষ্ট্য অনুধাবন নয়, এখানে শিল্পী অর্থাৎ শাজাহানের (বা শাজাহান সত্তার) মরণের পরবর্তী-পরিণতি অনুভবের প্রয়াস।

ছবি কবিতায় যদিও কবির উপলব্ধি, ছবিধৃত মৃত সত্তা স্ফুর্ত জীবনবেগ প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু সে তার জীবিত ভালোবাসার পাত্রকে জীবনবেগে পূর্ণ কোরে দিতে পারে। হতে পারে তার প্রেরণা। এ-ক্ষমতা ছবির আছে। ছবিতে ব্যক্ত সত্তা potential energy বা স্থির শক্তির মতো জীবিত প্রিয়জনের চিত্তে অবস্থান কোরে সেখানে kinetic শক্তির উদ্ভব ঘটাতে পারে, হতে পারে তার চিত্তে আবেগের দ্যোতনা, যা তার কর্মে সক্রিয়তার এবং চেতনায় অনুভবের বেগ সঞ্চারিত কোরে দেয়। ছবিধৃত সত্তা জীবনকালে একদা তার প্রিয়জনের চিত্তে যে প্রেমানুভূতি সঞ্চারিত কোরে দিয়েছিলো, সেই সত্তার স্মৃতিতে প্রেমানুভূতির আবার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এবং তার ফলে ঐ জীবিত প্রিয়জনের কাছে জগৎ এবং জীবন নূতন মাধুর্যে ভোরে ওঠে।

এ হল জীবিত ব্যক্তির চিত্তে মৃতব্যক্তির স্মৃতির কার্যকারিতা। কিন্তু উক্ত জীবিত ব্যক্তি যদি আর জীবিত না-থাকেন। তখন ঐ স্মৃতি কি কোনো ভাবে মৃত সত্তাকে প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত করে? স্মৃতি-কেন্দ্রিত প্রেমের প্রতি কি কোনো আবেগ মৃত সত্তা অনুভব করেন। তা হলে আগেই প্রশ্ন আসে, মরণোত্তর সত্তার কি জীবিত সত্তার মতো পার্থিব ভালোবাসা, সংস্কার, জীবনাবেগ, কামনা, বাসনা থাকে? এই প্রশ্নের উত্তর-ভাবনা শাজাহান কবিতায়।

ছবি কবিতার ছবির শিল্পী কবি নিজে নন। কিন্তু শাজাহান কবিতায় মমতাজের স্মৃতিমন্দিরের পরিকল্পক-শিল্পী শাজাহান নিজেই। তাই শিল্প তাজমহল, এবং শিল্প-কেন্দ্রিণ (Nucleus) মমতাজ শাজাহানের আরো গভীর আত্মিক।

মৃত্যু-উত্তর শাজাহান কি এখনও মমতাজের গভীর প্রেমামুতি গ্রহণে তৎপর? মমতাজের প্রতি তার ভালোবাসা কি এখনও অক্ষয়? এই ভালোবাসার আকর্ষণে কি তার আত্মা এখনও মমতাজের আত্মার সমীপবর্তি হতে চায়? শাজাহানের জীবাত্মা কি মমতাজের জীবাত্মার মিলন-প্রয়সী? এর উত্তর জীবিত মানুষের কাছে খুবই জরুরী। কারণ জীবিত মানুষ তার মৃত প্রিয়জনকে বারবার ফিরে ফিরে কাছে পেতে চায়। প্রিয়জনের মৃত্যুর পরও সে মনে করে মৃত প্রিয়জনের সত্তা তার কাছে-কাছে পাশেপাশে আছে। সে গভীর প্রত্যয়ে অনুভব করে, 'আমি ভালোবাসি যারে, সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে।'

রবীন্দ্রনাথ তার কল্পনা বা অনুভব বা উপলব্ধি থেকে যে উত্তর পেয়েছেন তা নেতিব্যাঞ্জক। মৃত্যু-উত্তর সত্তা পার্থিব জীবনকালের কোনো বিশিষ্টতায় আর বিধৃত নন। তখন তিনি দেহাতীত; বুদ্ধ অনাসক্ত সংস্কারহীন নিত্যমুক্ত আত্মা। এবং অসীম ও অনন্ত দেশ-কালে পরিভ্রমণশীল। তখন তার আর পার্থিব কিছুর সঙ্গে, মমতাজ সত্তা বা মমতাজস্মৃতি বা তাজমহল স্মৃতিমন্দিরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তখন তার মুক্তগতি অনন্তের পথে।

তবে ছবি ও তাজমহলের ফল-পরিণতির একজায়গায় মিল আছে। ছবি যেমন জীবিত প্রিয়জনের চিত্তে প্রেম ও প্রেরণা সঞ্চারী, তাজমহল স্থাপতও তেমনি এই পৃথিবীতে সৌন্দর্য প্রেম ও আনন্দের বীজের মতো উদগত-অঙ্কুর হয়ে এই পৃথিবীর সমকালীন ও এখনও-অনাগত জীবিত মানুষের মনে প্রেমসঞ্চারী। আবার মুক্তসত্তার সংস্কারমুক্ত গতিময়তার অশ্রত ঘষণাকারীও সে।

কবিতাদ্বয়ের গঠনে মিল আছে। প্রত্যেক কবিতার দুটি কোরে ভাগ । প্রথমটিতে একটি প্রতিপাদ্য, দ্বিতীয়টিতে আকস্মিক জোরের (emphasis) সঙ্গে তার প্রতিবাদ। এর ফলে কবিতাটিতে নাটকীয়তা এসেছে। যেন পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ। যেমন ছবিতে প্রথম

ভাগে (প্রথম থেকে শুরু কোরে চতুর্থ স্তবকের শেষ, তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি) একটি প্রতিপাদ্য -ছবিধৃত মৃতসত্তার কোনো জীবনেপম লীলা নেই। তারপর থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত উক্ত ভাবনার প্রতিবাদ, 'বিস্মৃতির মর্মে বসি' সে জীবিত প্রিয়জনের রক্তে দোলা নেয়, তরি অনুভবে কবির কাছে জগৎ সৌন্দর্য-প্রতিমা রূপে প্রতিভাত হয়।

শাজাহান কবিতায় ব্যাপারটি যেন উল্টে গেছে। ছবিতে যা ছিল উত্তর পক্ষের প্রতিপাদ্য, তারই প্রায় সমধর্মী প্রতিপাদ্য এই কবিতার পূর্বপক্ষে, এবং তারই প্রতিবাদ আবার আলোচ্য কবিতার উত্তরপক্ষে। তবে মনে রাখা দরকার ছবিতে যেখানে মৃতসত্তার আবেদন জীবিত মানুষের কাছে, শাজাহানে তেমনি মৃতসত্তার আবেদন মরণোত্তর সত্তার কাছে।

কাব্য-সৌন্দর্য

শুধু তত্ত্বের দিক দিয়ে নয়, কাব্য-সৌন্দর্যের দিক দিয়েও শাজাহান রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। কবিতার সৌন্দর্য আমাদের কাছে দুই ভাবে উদঘাটিত হতে পারে, এ-কথা আমরা অনেক আগেই জেনেছি। সে দুই ভাব দ্রুতি ও দীপ্তি। কবিতায় তত্ত্ব বা জ্ঞানের কথা থাকতে পারে। কিন্তু সেই তত্ত্ব বা জ্ঞানকে। কাব্যিক হয়ে উঠতে হলে তাকে দীপ্তি-বৈশিষ্ট্য আত্মসাৎ করতে হয়। অর্থাৎ তত্ব, যতক্ষণ আমাদের অনুভূতির সামগ্রী,না হচ্ছে, বা আমাদের প্রজ্ঞায় পরিণত না হচ্ছে, ততক্ষণ সে দর্শনের সামগ্রী, কবিতার নয়। তত্ত্ব যখন প্রজ্ঞায় পরিণত হবে, আমাদের কাছে জগৎ ও জীবনের কেন্দ্রীয় সত্য তার মধ্য দিরে উন্মোচিত হবে, আমাদের অনুভূতিগম্য হবে সেই সত্য, তবেই তা হবে কাব্যিক। এই কবিতার মূলতত্ত্ব, মরণোত্তর আমার অসীমে অনন্ত গতিময়তা। এই মূলত কবিতায় দীপ্তিতে পরিণত হয়নি। আমরা কখনো অনুভূতিতে এই সত্য লাভ করি না। তা কখনো আমাদের প্রজ্ঞায় (wisdom) পরিণত হয় না। সুতরাং মূলত টি এখানে প্রানের সামগ্রী হয়েই আছে, কবিতার সামগ্রীতে হয়নি।

কিন্তু কবিতাটিতে অন্য কিছু কি জ্ঞানের বিষয় আছে যা আমাদের অনুভব ও উপলব্ধিতে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের প্রজ্ঞায় পরিণত হয়, ও আমাদের নতুন বোধে দীপ্ত কোরে তোলে। সেখানে সেগুলি অবশ্যই কবিতার সামগ্রী, এবং কবিতাটির ঐশ্বর্য। আমাদের প্রজ্ঞা, অনুভব ও উপলব্ধিতে পরিণত হয়। সমস্ত কবিতার সর্বাঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হয় এরই ট্রাজিক বেদনা। এবং তারই ফলে দীপ্তিবহ সার্থক কবিতায় এটি পরিণত। কবিতার অন্তর্গত বিভিন্ন চিত্র ও চিত্রকল্পের সঙ্গে আমরা, পাঠকেরা যখন একাত্ম হয়ে যাই, তার সৌন্দর্য দ্যুতি ও লাবণ্যের মধ্যে গলে যাই, দ্রব হয়ে যাই তখনই কবিতার দ্রুতিরূপ কাব্যিক বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই রচনাটি কবিতায় উত্তীর্ণ হয়। কবি এই কবিতায় আশ্চর্য আশ্চর্য চিত্রকল্প উপহার দিয়েছেন। চিত্রকল্পগুলি তার শব্দসম্ভারের বাচাতীত ধ্বনিময়তা ও অর্থের অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনা-সহ বৈদগ্ধ্য-ভঙ্গি-ভণিতির মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হয়ে অপূর্ব রস-সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। চিত্রকল্পগুলি সৌন্দর্যসমৃদ্ধ তো বটেই, কিন্তু তাকে ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছে এর অনির্বচনীয় ও বিমূর্ত ভাবঐশ্বর্য ও কল্পনা-নির্যাস। কিছু উদাহরণ, দেওয়া যাক।

মমতাজের স্মৃতিমণ্ডিত তাজমহলের বিচিত্র সৌন্দর্য, বহুমুখী ভাবগত বহুমাত্রিক তাৎপর্য এবং শাজাহান-সত্তার প্রেমের নানা ব্যঞ্জনা বিভিন্ন চিত্রকল্পের মধ্যদিয়ে ব্যক্ত

১. কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস / নিত্য-উচ্ছসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ

২. শুধু থাক/ একবিন্দু নয়নের জল /কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল

৩. করিশে বরণ / রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে

৪. তব অশান্ত ক্রন্দনে / চিরমোনাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে

৫. জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে / প্রেয়সীরে / যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে/ সেই কানে কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে / অনন্তের কানে।

৬. প্রেমের করুণ কোমলতা / ফুটিল তা/ সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।

উদ্ধৃত ছয়টি চিত্রকল্প প্রত্যেকটি তাজমহলকে ব্যঞ্জিত করছে। কিন্তু প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যবহ।

১. প্রথম চিত্রকল্পটি একটি বিমূর্ত ভাবকে (শাজাহানের বিরহ বেদনার সকরুণ বেদনাকে) তাজমহল স্মৃতিমন্দির-রূপে মূর্ত কোরে তুলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত করুণার অনুভবকে একটি বিশ্বব্যাপ্ত ও চিরন্তন আবেগে পরিণত করেছে (নিত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ)

২. দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিতে তাজমহল হয়েছে একটি ভাবকল্পনার অপূর্ব করুণ ও সৌন্দর্য-অতিশায়ী রূপ, যা নারী-মুখমণ্ডলে পতিত বেদনার অশ্রুবিন্দুর মতো টলটল - করছে। শাজাহানের নিত্য অনুভূত বিরহবেদনা ও তাজমহলের শুদ্ধত্র আন্তর। সৌন্দর্য এখানে একত্রে সম্মিলিত।

৩. এবানে কবি তাজমহল স্মৃতিমন্দিরের মধ্যদিয়ে দুটি বিমূর্তভাবকে একসঙ্গে একান্ন করেছেন। একটি রূপহীন মৃত্যু এবং অপরটি শিল্পসৌন্দর্যের চিরন্তন , (মৃত্যুহীন অপরূপ সাজ)।

৪. শাজাহানের বিরহক্রন্দনের শিল্পমূতি তাজমহল।

৫. শ্রবণরূপ ইন্দ্রিয়ানুভবকে নিস্তব্ধ স্থাপত্য-ভাস্কর্যমূর্তি দান। এর মধ্যে বিমিশ্রিত শাজাহানের মমতাজের প্রতি ভালোবাসা, জ্যোৎস্নারাতের আধ-আচ্ছন্ন। পরিবেশের স্বপ্নময় সৌন্দর্য, প্রেমাবেগে অস্ফুট বাক্য-উচ্চারণ-এই সব বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভবের একত্র সমাবেশ।

৬. তাজমহলের শুভ্র পাষাণের ভাস্কর্যের মধ্য দিয়ে অডিব্যক্ত শাজাহানের করুণ কোমল বিমূর্ত প্রেমানুভবের মূর্তরূপমাধুর্য।

আরো একটি তাজমহলকেন্দ্রিক চিত্রকল্প আছে যার ভাবগর্ভত এবং সৌন্দর্য ব্যঞ্জনা অতুলনীয়। তাজমহলকে কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে। তাজমহল হয়েছে বিরহাতুর চেতনার বাণবহ মেঘদূত, যে-মমূত সারা জগতের সকল

অনঙ্গ অশ্রত অদৃশ্য অনুভবসমুদয়ের সঙ্গে একাত্ম মমতাজসত্তার কাছে শাজাহানের বিরহবেদনাতুর চিত্তের করুণার্ধ ভালোবাসার বাণী বহন কোরে নিয়ে চলেছে।

গ। তাজমহল (৯ সংখ্যক)

৭-সংখ্যক শাজাহান-নামক কবিতায় শিল্পের একাধিক তাৎপর্য ধরা পড়েছে। ঐ কবিতাষ তাজমহল-স্থাপত্য জীবিত শাজাহানের প্রেকৃতিকে ধোরে রাখে, কিন্তু শাজাহান-সত্তা বা মমতাজ-সত্তাকে সে ধরে রাখতে পারে না। অবশ্য সে একটি প্রেমের বীজের মতো, জীবিত মানুষদের মধ্যে গভীর প্রেম-চেতনা সৃষ্টি ও সঞ্চারিত কোরে চলে।

তাজমহলকে কেন্দ্রে রেখে বলাকা কাব্যের ৯-সংখ্যক কবিতাটিও, যে-কবিতাটির নাম ‘তাজমহল’। ৭-সংখ্যক কবিতাটি তাজমহল-কেন্দ্রিক হলেও, তার উদ্দীঃ তাজমহল-স্রষ্টা শাজাহান। তাজমহল কবিতায় তাজমহল-ই উদ্দীষ্ট। শাজাহান কবিতায় শেষের পঙক্তিগুলিতে বলা হয়েছে, শাজাহান সত্তা বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন ভাবে চলে গিয়েছেন, কিন্তু ফেলে গিয়েছেন জীবনের মালা থেকে খসে পড়া একটি বীজ, সেই বীজ অমর অঙ্কুরে / উঠেছে অম্বর পানে । রবীন্দ্রনাথ তার ব্যাখ্যায় বলেছেন, ঐ বীজ বিরহের একটি সজীব বীজ। পরিপার্শ্বের আলো-হাওয়া-মৃত্তিকারসে তা এখন অমর বনস্পতিতে পরিণত। তাজমহলের অন্তর-বাণী ঐ বীজের দ্বারাই ব্যক্ত। কিন্তু ঐ বীজ কোথা থেকে ঐ আলো-বাতাস-মৃত্তিকারস পেয়েছে ও পাচ্ছে যার : ফলে এখনও তা সজীব প্রণপূর্ণ এবং অপরের চিত্তে প্রেম-সঞ্চারী ? তারই উত্তর আলোচ্য ৯-সংখ্যক কবিতাটিতে, যার নাম কবি দিয়েছেন তাজমহল।

তাজমহলকে উদ্দেশ্য কোরে কবির প্রথমেই জিজ্ঞাসা, তাজমহল যিনি পরিকল্পনা ও সৃষ্টি করেছিলেন সেই শাজাহান, তিনি বিগত। যাকে কেন্দ্র কোরে তাজমহল রচিত হয়েছিল, সেই মমতাজ, তিনি তো আগেই গত। এবং তাদের আস্থাও অনন্ত গতিশীল। অনন্তের পথ-যাত্রী। তাজমহল স্থাপত্য-শিল্প রয়ে গেছে একথা সত্য, কিন্তু শাজাহান? সেই বিশ্ব-পথিক? ৭-সংখ্যক কবিতায়:

‘যত দুর চাই।

নাই নাই, সে পথিক নাই।

প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,

রুধিল না সমুদ্র পর্বত।

আজি তার রথ চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে

নক্ষত্রের গানে

প্রভাতের সিংহদ্বার-পানে।’

শাজাহান সম্পর্কে যে-কথা সত্য, মমতাজ সম্পর্কেও তাই-ই। কিন্তু একথাও তো মিথ্যা নয়, এখনও তাজমহল তার দর্শকদের মনে অপূর্ব আনন্দ-বিকীর্ণ করে, প্রতি বৎসর বহু মানুষ তাজমহল-দর্শনের জন্য আগ্রায় আগমন করে, রবীন্দ্রনাথের মতো কবিও ঐ-স্মৃতিমন্দির দেখে তার সৌন্দর্য অনুভব কোরে কবিতা রচনা করেন, তার সৌন্দর্যানুভূতিতে তাজমহল হয়ে দাড়ায় কালের কপোলতলে শুভ্র সমুল একবিন্দু নয়নের জল। পাশ্চাত্য সহৃদয় দর্শকের কাছে ‘tears in marble’। এ কেমন কোরে সম্ভব? যে-তাজমহল তার কেন্দ্র (মমতাজ) ও তার সৃষ্টিকর্তা (শাজাহান)-বিরহিত, সে কোথা থেকে পায় এমন আনন্দসঞ্চারী শক্তি, এমন সুন্দর দীপ্তি? কোথা থেকে পায় প্রাণ শক্তি?

কে তোমারে দিল প্রাণ,

রে পাষাণ?

কে তোমারে জোগাইছে এ অমৃতরস

বরষ বরষ?

(১ম স্তবক)।

মমতাজ-শাজাহানের মৃত্যুতেও তাজমহলের সৌন্দর্যের বিন্দুমাত্র হানি হয়নি, তার আনন্দ-সঞ্চারক শক্তিও সমান বর্তমান। এখণও এই তাজমহল তায় শিল্প সৌন্দর্যের দ্বারা ঊর্ধ্ব লোকের দিকে ধরণীর আনন্দমঞ্জরী ফুটিয়ে তুলছে, যেমন করে ধরিত্রী ফুলের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করে ওর বাণী। শাজাহান যে বিরহ বেদনাকে অন্তহীন কালে এবং অমীম দেশে পৌছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, শাজাহানের মৃত্যুর পরও কি ভাজমহল এখনও ওর প্রকাশ-সক্ষম। এখনও বিরহের আকুলতা, সুগভীর প্রেমের আকৃতি তাজমহলের শুভ্র সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে সমান প্রকাশমান।

•••বহে বারোমাস ।

অবসন্ন বসন্তের বিদায়ের বিষণ্ন বিশ্বাস

মিলনরজনীপ্রান্তে ক্লান্ত চোখে

ম্লান দীপালোকে

ফুরায়ে গিয়েছে যত অশ্র-গলা গান - এখনও তাজমহলের অন্তরে তা চিরন্তন হয়ে অনুরণিত।

এখানেই আসে শিল্প তত্ত্বের কথা। রবীন্দ্রনাথ তার "সাহিত্যের সামগ্রী" (সাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্গত) প্রবন্ধ বলেছেন "ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা, ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা।" ভাব সর্বসাধারণের । প্রেম, বিরহ প্রভৃতি সাধারণ : ভাব। এই সাধারন ভাব যখন ব্যক্তিবিশেষে অনুভবে গভীরভাবে ধরা পড়ে, ব্যক্তির উপলব্ধিতে প্রেম বিরহ প্রভৃতি গভীর সাক্ষর সঞ্চার করে, তখন ঐ সাধারণ ভাব ব্যক্তিগত সম্পদে পরিনত হয়।

তাজমহলের ক্ষেত্রে তাই-ই হয়েছে। প্রেম, বিরহ প্রভৃক্তি সাধারণ ভাব। তা যন শাজাহানের অভূতিকে গভীরভাবে আপ্লুত করেছে, তখন তা শাজাহানের ফযয় সামগ্রী। এই গন্যায়-অনুভব যখন তাজমহল শিমজার মধ্যে অন হয়ে মিশে গেলো, তখন তা আর শাজাহানের ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে রইল না, এ হয়ে দাড়ালো সর্বসাধারণের সাদ। এই তাজমহলের কাছ থেকে প্রেম বা সিহানুভূতি বা সৌযানুভূতি পাওয়ার জন্য

শাজাহান বা যত্মতাভের বেঁচে থাকার কোনো দরকার নেই। আজ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরেও আমরা যেমন রবীন্দ্রনাথের কবিতার রস অনুভব করি, নিভের শতবকে প্রকাশ করবার দন্ত কবির কাছ থেকে উতি ধার নিই, নিজের অনুভবকেই আবার নূতন কোরে আবিষ্কার করি র কবিতায়, তাজমহলের ক্ষেত্রেও তাই। পৃথিবীর সকল শিল্প (যত প্রাচীনই হক-না-কেন-)সম্পর্কে একই কথা সত্য। তাজমহলের শিল্প প্রশে যে বিরহের অনুভব, তার কেন্দ্রে ছিলো শাজাহানের বিরহাকুল হৃদয় ভূতি। কিন্তু তা এখন যেমন সূর্বসাধারণের বিরহ ও প্রেমানুভব-সঞ্চারক প্রেরণা, তেমনি আবার সর্বসাধারণের অনুভবের বিমিশ্রণে তা পুষ্ট ও সমৃদ্ধ। রাজবিহী শাজাহানের তাজমহল সম্পর্কে কবির বক্তব্য, যা ছিল একদা শাজাহানের চিত্ত সামগ্রী, তা এখন বিশ্বলোকের সম্পদ।

বিদীর্ণ হৃদয় হতে বাহিরে আনিল বহি

সে রাজবিরহী

বিরহের রত্নখানি;

দিল আনি

বিশ্বলোক হাতে

সবার সাক্ষাতে।

(৩য় স্তবক)

'বিরহ' একটি ভাব। যে-কোনো ব্যক্তির জীবনে তা আসতে পারে। মমতাজের মৃত্যুতে শাজাহানের সুগভীর বিরহ শাজাহানের ব্যক্তিগত উপলব্ধিতে পরিণত, ঠার মন্ময় অনুভূতিতে রূপান্তরিত। তখন সার্বজনীন বিরহের ভাবনীহারিকা গাঢ়-সংহত হয়ে শাজাহান-মানসে কঠিন হীরকের ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। শাজাহান তার এই ব্যক্তিগত ভাবকে আবার জগতের সর্বসাধারণের কাছে পৌছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তাজমহলরূপ স্থাপত্য-ভাস্কর্য সৃষ্টির দ্বারা। যখনই তাজমহলের মধ্যে শাজাহানের

বিরহবেদনা প্রতীকায়িত হয়েছে, তখন আবার তা সকলের সামগ্রী। শাজাহানের বেদনা তখন 'বিশ্বলোক-হাতে সমর্পিত। তখন বিশ্বের সব-কিছু দ্বারা তার অভিনন্দন। তখন তা রত্নমাণিক্যের মত কঠিন সিন্দুকে এবং প্রহরীর পাহারায় রক্ষণযোগ্য নয়। তখন তার প্রহরী অবারিত দশদিক, তার উপর নেমে আসে আকাশের চুম্বন, প্রতি প্রভাতের রক্তিম সূর্য তার ললাটে একে দেয় অরুণ অভিনন্দন। ম্লান জোৎস্নার পাণ্ডুসৌন্দর্য তার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত বিরহের আভাসকে অধিকতর কারুণ্যে নিষিক্ত করে :

নাই সেথা সম্রাটের প্রহরী সৈনিক,

ঘিরিয়া ধরেছে তারে দশ দিক।

আকাশ তাহার 'পরে

যত্নভরে

রেখে দেয় নীরব চুম্বন

চিরন্তন;

প্রথম মিলনপ্রভা।

রক্তশোভা।

দেয় তারে প্রভাত-অরুণ,

বিরহের ম্লানহাসে।

পাণ্ডুভাসে...

জ্যোৎস্না তারে করিছে করুণ। (২য় স্তবক)

যা-ছিলো শাজাহানের কাছে তার ব্যক্তিগত প্রেয়সীর প্রেমের স্মৃতি ও বিরহের অনুভব, তা যখনই তাজমহল-শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হলো, তখনই তা বিশ্বের সকল মানুষের অনুভবের উৎসেও পরিণত হল। তা জগতের সকল মানুষের, তাদের প্রিয়তমের প্রতি, ব্যক্তিগত ভালোবাসার অনুভূতিতে সঞ্চারিত কোরে দিলো এক বৃহৎ

অনুভব, এক বিশাল মাত্র। তাজমহল এখন আর শাজাহানের ব্যক্তিগত বিরহবেদনার প্রতীক মাত্র নয়, তা জগতের সকল বিরহীর বিরহ-বিদীর্ণ হৃদয়ের আকৃতির প্রতিভাসকও বটে। তাজমহলের মধ্য দিয়ে এখন যা প্রকাশমান তা হলো, বিশ্বের সকলের ভালবাসার সঙ্গে সম্রাটের ভালোবাসার সমন্বিত অভিব্যক্তি :

সম্রাটমহিষী,

তোমার প্রেমের স্মৃতি সৌন্দর্যে হয়েছে মহীয়সী।

সে-স্মৃতি তোমারে ছেড়ে

গেছে বেড়ে

সর্বলোকে।

জীবনের অক্ষয় আলোকে।

অঙ্গ ধরি সে অনঙ্গ স্মৃতি

বিশ্বের প্রীতির মাঝে মিলাইছে সম্রাটের প্রীতি। (৩য় স্তবক)

শাজাহানের ভালোবাসার গভীরতা সকল মানুষের গভীর ভালোবাসার প্রতীক হয়ে উঠেছে। তাজমহল হয়েছে সকল মানুষের বিরহবেদনার প্রতিনিধি, কেবল মাত্র সম্রাটের ভালোবাসার প্রতীক নয়। রাজা থেকে দীনতম মানুষ পর্যন্ত সকলের ভালোবাসাই গভীরতম মহিমা ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত তাজমহল সৃষ্টির মধ্য দিয়ে :

রাজ-অন্তঃপুর হতে আনিল বাহিরে।

গৌরবমুকুট তব, পরাইল সকলের শিরে

যেথা যার রয়েছে প্রেয়সী।

রাজার প্রাসাদ হতে দীনের কুটিরে

- তোমার প্রেমের স্মৃতি সবারে করিল মহীয়সী। (৩য় স্তবক)

সম্রাট শাজাহান তার প্রতাপ-প্রতিপত্তি ধন-জন-মান প্রভৃতি-সহ বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। এমনকি তার মন এবং তার সত্তা(বা আত্মা, যে নামেই বল হোক-না কেন) তাও বিশ্বের অনন্তপথযাত্রী হয়ে বিদায় নিয়েছে। (আমরা সাত সংখ্যক কবিতায় তা দেখেছি)। তবুও তার প্রতিষ্ঠিত তাজমহল একটি প্রেমের বীজের মতো রয়ে গিয়েছিল পৃথিবীর মাটিতে। সেই বীজ এখন উদগত অঙ্কুর হয়ে অমর বনস্পতিতে পরিণত। তা দুই ভাবে তাৎপর্যময়। এক ভাবে, তা জগতের সকল মানুষের ভালোবাসাকে মহৎ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং অপরভাবে, মানুষের ভালোবাসা দ্বারা প্রতি মুহূর্তে অভিসিঞ্চিত হচ্ছে তাজমহল, যার কথা সংহত ক্ষুদ্রায়ত শেষ স্তবকটিতে বলা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছেন, কালিদাস ‘মেঘদূতের’ মধ্যে বিরহী যক্ষের যে বেদনা সঞ্চারিত কোরে দিয়েছিলেন তা শুধু যক্ষের বেদনা নয়। যক্ষের বেদনার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল বিশ্বের সকল বিরহীর বেদনা। এবং বিশ্বের যে-সকল বিরহী। এই কাব্য শ্রবণ করেছে তারাও তাদের বেদনার অনুভব এই কাব্যের শ্লোকরাশির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে তাকে আরো ভাৰসমৃদ্ধ ফোয়ে তুলেছে। কালিদাসকে উদ্দেশ্য কোরে রবীন্দ্রনাথের উক্তি কালিদাশ সেদিন উজ্জয়িনী রাজপ্রাসাদে শ্রোতাদের মেঘদূত কাব্য পাঠ কোরে শোনাচ্ছিলেন।

শাজাহান এবং তাজমহল এই দুটি কবিতা পরিপুরক। শিল্পী শিল্পসৃষ্টি করেন। শেষপর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও) শিল্পীর সঙ্গে শিল্পের কী সম্বন্ধ থাকে, তার পরিচয় শাজাহান কবিতায়। মৃত্যুর পরে শিল্পী সত্তা নিত্য মুক্ত বুদ্ধ আত্মা, সকল আকর্ষণের অতীত, অনন্ত কাল ও অসীমস্থানের অভিযাত্রী। আর তার রচিত জাগতিক শিল্পসামগ্রী জগতের জীবিত মানুষের কাছে প্রেরণাসঞ্চার কোৰে চলে দিনের পর দিন, এবং রসিকের অনুভবের দ্বারা ক্রম-সমৃদ্ধ হয়ে চলে। তাজমহল কবিতায় এই উপলব্ধির প্রকাশ।

কবিতাটি তত্ত্ব-প্রধান। অবশ্য তত্ত্বটি শেষ পর্যন্ত আমাদের একটি উপলকি সঞ্চারিত কোরতে পারে। একজনের মন্ময় উপলব্ধিজাত শিল্প কেমনভাবে তন্ময় সর্বসাধারণের বস্তু হয়ে ওঠে, এবং সর্বসাধারণের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ভাবের সঙ্গে মিলে তারও আন্তর

সৌন্দর্যের সমৃদ্ধি লাভ, তারই কিছু কাব্যিক প্রকাশ কবিতাটিতে। কিন্তু তবুও এ-কথা স্বীকার করতে হয়, এটির ঝোঁক তত্ত্বের দিকেই। শিল্প সম্পর্কিত পূর্বে আলোচিত দুটি কবিতা, ছবি এবং শাজাহানে দ্রুতিব্যঞ্জক যা কিছু আশ্চর্য পঙক্তি আছে, এখানে তার অভাব। ছবি কবিতার শেষের 'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাই'••তার পরে 'অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি। নও ছবি, নও তুমি ছবি।' পঙক্তিগুলিতে অনুভূতি উদ্রেককারী যে-বিশিষ্টতা আছে, তার সমতুল্য পঙক্তির অভাব এই কবিতায় । শাজাহান কবিতাতেও শেষের স্তবক ছাড়া অন্যান্য স্তবকগুলির মধ্যে ব্যক্ত সব ছেড়ে যাওয়ার ট্রাজিক বেদনা ও ধূসর বিষন্নতা, সমস্ত আকাঙ্ক্ষার রিক্ত পরিসমাপ্তির করুণচিত্র, যা আমাদের অনুভবে সুগভীর আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম। তাজমহলে এমন কোনো গভীর ব্যঞ্জনা-সঞ্চারক চিত্র বা দীপ্তি নেই। কবিতাটি পাঠশেষে আমরা জ্ঞানলাভ করি, ব্যক্তি,রচিত শিল্প কেমনভাবে অপরের উপলব্ধির আলোকে বিশ্বের সামগ্রীতে পরিণত হয়। অবশ্য কবিতাটির প্রথম স্তবকে কিছু কাব্যানুভূতি সঞ্চারক পঙক্তি আছে। সেটুকুতেই এর কাব্যিক মূল্য। যথা, কে তোমারে জোগাইছে এ অমৃতরস | বরষ বরষ', 'দেবলোক-পানে নিত্য তুমি রাখিয়াছ ধরি ধরণীর আনন্দমঞ্জরী', 'তোমারে ঘিরি বহে বারোমাস/অবসন্ন বসন্তের বিদায়ের বিষন্ন নিশ্বাস', 'মিলনরজনীপ্রান্তে ক্লান্ত চোখে / ম্লান দীপালোকে / ফুরায়ে গিয়েছে যত অশ্রু গলা গান। এই পঙক্তিগুলির আবেদন আমাদের অনুভূতিতে। অন্যান্ত অংশে এমন পঙক্তি নেই। এবং সামগ্রিক ভাবেও কোনো দ্রুতি ও দীপ্তি কবিতাটি দেয় না। তবে কবিতাটির তাত্ত্বিক বক্তব্য, শিল্পসম্পর্কে কবির গভীর উপলব্ধি সুন্দরভাবে কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন। মানসী কাব্যের মেঘদূত কবিতাটিকে একসঙ্গে পড়ে নিলে কবির এই বিষয়ে বিশেষ বলবার ব্যাপারটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়।

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মহাশয় সংক্ষেপে কবিতাটির তাৎপর্য উদঘাটিত করেছেন। এখানে তা উদ্ধারযোগ্য। কবিতাটিতে 'শাজাহান এবং মমতাজ প্রধান নয় ; তাহারা তাহাদের সৃষ্টির অন্তরালে পড়িয়াছেন; ব্যক্তিগত সুখদুঃখ বিগত হইয়া সকলের ধন হইয়া উঠিয়াছে। আর্টের বিশ্বজনীনতা ব্যক্তিগত শোককে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়া

পৃথিবীর সকলের সাধনার সম্পদ করিয়া তুলিয়াছে। এখানে আর্টের পূর্ণতাকে জীবনের মহৎ অপূর্ণতার অপেক্ষা বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে।'

ঘ। রূপ (১৬ সংখ্যক)

রূপ কবিতায় কবির বক্তব্যের তাৎপর্য:

১. এ-জগৎ ভাব-ভাণ্ডার। বিচিত্র ভাবে জগতাকাশ পূর্ণ। আকাশ যেন ভাব-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত। অথবা গতি বলতে যা-বুঝি ভা। এই ভাবেই তরঙ্গ ময়তা।

২. কিন্তু ভাব, অদৃশ্য লক্ষ্য নিরালম্ব ভাৰ, রূপধৃত না-হওয়া পর্যন্ত অসার্থক। ভাব সীমার মধ্যে, রূপের মধ্যে, শিল্পের মধ্যে, শব্দের মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে, সঙ্গিতের মধ্যে পেড়ে সার্থক হতে চাইছে। ভাব চাইছে রূপ বদ্ধ হতে শরীরবদ্ধ হতে; মানুষের কাছে শুধু তত্ত্ব রূপে নয়, তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ অনুভূতিতে ধরা পড়তে।মানুষের মেধার কাছে নয়, তার চিত্তের কাছে তার তবেদন সঞ্চারিত কোরে দিতে। মেধার কাছে সুন্দর অন্তর নেই, কিন্তু চিত্তের কাছে আছে। তাই ভাবকে চিত্তগম্য হতে হলে তাকে সুন্দর হতে হয়, শিল্প হতে হয়।

৩. এই তাবকে যিনি রুপবদ্ধ কোরে মানুষের অনুভূতিগম্য রসের সামগ্রীতে পরিণত করেন, তিনিই শিল্পী। সভ্যতা বলতেও বুঝতে হবে স্থান কালে ভাসমান বিচিত্র অসীম ভাবকে সীমায় বন্ধনে রূপ দান করা; অসীমকে মূর্তিমান কোরে তুলে তাকে ভোগকরা। নগরী সভ্যতার সন্তান। তারও আন্তর-প্রেরণা তাই। চিত্তের কঠিন চেষ্টার মধ্য দিয়ে ভাবকে বহুরূপ দান।

৪. জগৎসমুদ্র ভাবসমুদ্র। এই ভাব কোথা থেকে এলো? জগৎ সৃষ্টি থেকেই সেখানে ভাবের প্রবাহ। কোনো ভাব রূপ মূর্তি বা বস্তু মূর্তি পেয়েছে! কোনো ভাব এখনও পায়নি। কখনও কখনও কোনো ভাবের রূপমূর্তি পাওয়ার অন্য পদ লক্ষ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।

৫. পূর্বের ভাবের সঙ্গে আবার নূতন ভাবও সৃষ্ট হচ্ছে। প্রতিভাবানেরা, শুধু প্রতিভাবান কেন, সাধারণ মানুষও, নূতন নূতন ভাবসঞ্চারিত কোরে দিচ্ছে জগতে। এই সকল ভাবের অনেকগুলির রূপবদ্ধ হওয়ার জন্য বহু বৎসর, লক্ষ লক্ষ বৎসর লেগে যেতে পারে। হয়তো তার জন্য যে পরিবেশ-পরিস্থিতি দরকার, জগৎ তা এখনও আয়ত্ত করতে পারেনি। সেই পরিবেশ বা অবস্থা হয়তো সম্ভব হবে বর্তমান পৃথিবীর সম্পূর্ণ পরিবর্তনের পর। তার অঙ্গ হয়তো দরকার অনেক বিপ্লব, অনেক যুদ্ধ, অনেক ধ্বংস। আজ যে যুদ্ধকে (১৯১৪-এ মহাযুদ্ধ) সর্বনাশের ইজি বেলে মনে হচ্ছে, তা হয়তো হবে নতম এবং কল্যাণতম চেতনায় অংশু ভাবনাকে রুদ্ধ করবার এক নুতন আয়োজন।

কবিতাটির প্রথম কে কবির বক্তব্য, এই বিশ্বজগৎ বস্তুতে (matter) পূর্ণ । আমাদের ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি, এই বিশাল বস্ত-বিশ্বের নানা লীলা অবলোকন কেরে। নীহারিকা বিল বিস্তার, নরে উপ প্রকাশ, নক্ষত্রকে কেন্দ্র কোওে এহের অবন, এহকে কেন্দ্র কোরে উপহ, রাতের আকাশ বিদীর্ণ কোরে দীর কাশি নিয়ে উত্তর নেমে আসা, পৃথিবীর বুকে কীট-পতন পণ্ড মানুষ উড়িয়ে বিচিত্রলীলা, ফুল ফোটা, পাতা ঝরা, শিশুর টলমল পায়ে চলা, কশোরীর মুখে প্রথম প্রেমানুভবের রক্তিমাভা, মানুষের আরো বহু বহু লীলা-বিকাশ, নব বর্ষায় মেঘের আবির্ভাব, বসন্তে পাখির কূজন, গ্রীষ্মের ঝড়ঝঞ্ঝা, এ-সবই বস্তুর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত জগৎ-লীলা। জগতে যদি বস্তুর আবির্ভাব না-হতো তা হলে এই আনন্দ লীলা কোথায় থাকতো ? জগতের এই বস্তুর ভূমিকার দিকে তাকিয়ে কবির মনে হয়,

বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি

উঠে অট্টহাসি;

ধুলা বালি, দিয়ে করতালি

নিত্য নিত্য

করে নৃত্য

দিকে দিকে দলে দলে ।

আকাশে শিশুর মতো অবিরত কোলাহলে।

জগতের অন্তর্গত বহু ভাব বা idea-ই রূপবদ্ধ হয়ে জগৎকে আনন্দময় লীলানিকেতনে পরিণত করেছে। মানুষের অসংখ্য কামনা-বাসনা ভাব-ভাবনা এখনো রূপবদ্ধ হয়নি। কিন্তু তারা সব রূপমত্ত বস্তুর আহ্বানে রূপলাভ কোরে এই বিশ্বলীলায় অংশগ্রহণ করতে চাইছে, কবির কল্পনায় এই সত্য ধরা পড়ছে। মানুষের চেতনায় যত অব্যক্ত অনিকেত স্বপ্ন বা কল্পনা উত্থিত হচ্ছে, তারা সীমাবদ্ধ রূপায়তনে ব্যক্ত হয়ে সার্থক হতে চাইছে। কবির কল্পনা চাইছে কবিতায় আয় প্রকাশ করতে, নিরাকার মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ আকৃতি চাইছে প্রতিমা হতে, সুন্দরের প্রতিমূর্তি হতে। নিরালম্ব ভাব এমন অবলম্বন চায়, যার দ্বারা অপরের অনুভূতি গম্যরূপে তা স্থায়ী হতে পারবে। সঙ্গীত চায় রেকর্ড-বদ্ধ হতে, সৌন্দর্য চায় চিত্র বদ্ধ হতে, বা মর্মরে ব্যঞ্জিত হতে, ভাব চায় ভাষাবদ্ধ হতে, সভ্যতার অন্তনিহিত আকৃতি চায় স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্প সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হতে। লৌহ কাষ্ঠের দৃঢ়মুষ্টিতে ধরণীকে আঁকড়ে ধরে নগরী চায় দীর্ঘ জীবন লাভ করতে। মানুষের চিত্তের কঠিন চেষ্টা, যার কোনো বাইরের রূপ নেই। নিজেকে ব্যক্ত কোরে নগরীর রূপ দান করছে সে। বাইরে থেকে দেখতে গেলে, এ হয়তো শুধু ইষ্টক প্রস্তর। কিন্তু তা নয়, এ ভাবেরই রূপমূতি লাভ। Ideas are being concretized

মানুষের লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য ভাবনা,

অসংখ্য কামনা,

রূপে মত্ত বস্তুর আহ্বানে উঠে মাতি

তাদের বেলায় হতে সাথী ।

স্বপ্ন যত অব্যক্ত আকুল

খুজে মরে কূল;

অস্পষ্টের অতল প্রবাহে পড়ি

চায় এরা প্রাণপণে ধরণীরে ধরিতে আঁকড়ি

কাষ্ঠলোষ্ট্র সুদৃঢ় মুষ্টিতে,

ক্ষণকাল মাটিতে তিষ্ঠিতে।

চিত্তের কঠিন চেষ্টা বস্তুরূপে

স্কুপে ভূপে উঠিতেছে ভরি ।

সেই তো নগরী

এ তো শুধু নহে ঘর,

নহে শুধু ইষ্টক প্রস্তর । (২য় স্তবক)

শুধু নিজের মনের কথাকেই যে মানুষ রূপদান করতে চাইছে তা নয়, অপর বহু মানুষের মনের কথাও কবি শিল্পী প্রভৃতির রচনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে। হয়তো সেসব মানুষ আজ আর নেই, কিন্তু তাদের ভাব-ভাবনা এখনও জগতে অনঙ্গ হয়ে ভাসমান, কোনো শিল্পীর রচনায় রূপবদ্ধ হয়ে ব্যক্ত হওয়ার জন্য। সেগুলি যেন এখনও আলোহীন যাত্রীদল, শিল্পসৃষ্টির আলোক সম্পাতে তারা জগতের কাছে প্রতিভাত হবে। হয়তো কবির (রবীন্দ্রনাথের) বাণীতে তারা ধরা পড়তে চাইছে, কবির কাব্যে তারা প্রকাশিত হয়ে লোকালয়ের মানুষের মনে নূতন সাড়া জাগাবে। কত অতীত দিনের কত সাধারণ মানুষের, কবির, শিল্পীর অব্যক্ত অঙ্গ ভাব আজ রবীন্দ্রনাথের রচনায় অলাভ কোরে অস্তিত্ববান হয়ে উঠতে চাইছে।

আবার ঐ-সব অতীতদিনের অনঙ্গ ভাব-ভাবনার অভিঘাতে বর্তমান কালের কবির চিত্তেও বহু নব নব ভাবের উত্থান হচ্ছে। তারা আবার ভবিষ্যতের অন্ত । কোনো শিল্পীর রচনায় আকার ধারণ কোরে সার্থক হওয়ার জন্য, এখনও অনাগত ও অদৃশ্য কাল-সীমা অতিক্রম করবার জন্য, ব্যর্থ হয়ে উঠেছে।

কোন ভবিষ্য যুগ-যুগান্তরে কবির (রবীন্দ্রনাথে) চিত্তের এই নব-জাগ্রত ভাবনা, যারা পুরাতন ভাবনার অভিযাতে উত্থিত হচ্ছে, তারা আবার কোন্ সেদিনের নবীন কবির

রচনায় বর্ণবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হবে, আজ তা দুজ্ঞেয়। কিংবা তাজমহলের মধ্য দিয়ে যেমন শাজাহানের বেদনা রূপবদ্ধ হয়ে অভিব্যক্ত হচ্ছে আজ, সেদিনও আর কোনো শিল্পীর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হবে অন্য কোনো ভাবের প্রকাশ। আভ তার কোনো আভাস নেই। আজ তা কল্পনাতীত। কবির চিত্তে যে-ভাব উধিত হচ্ছে, তা এমনই অভিনব, বর্তমান পৃথিবী তাকে রূপবদ্ধ করার কথা কল্পনাও করতে পারে না। তার জন্য হয়তো দরকার হবে সমাজমানসের বিপুল পরিবর্তন। আর যে-যুদ্ধকে(কবিতাটির রচনা ২৭শে পৌষ, ১৩২১, ইংরেজি ১৯১৪ ডিসেম্বর, তখন প্রথম মহাযুদ্ধ বিপুল বিক্রমে শুরু হয়ে গেছে) ভয়ঙ্কর অণ্ডত মনে হচ্ছে, সেই যুদ্ধই হয়তো ভূমিকা রচনা করছে কবির মনের ভাবকে ধারণ-করবার উপযুক্ত সম-পরিবেশ সৃষ্টির ।

৫.২ অনুশীলনী

১। গতি থেকে স্থিতির পথে কিভাবে ‘ছবি’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফিরে এসেছেন আলোচনা করো।

২। ‘শাহজাহান’ কবিতায় মৃত্যুচেতনা কিভাবে ধরা পড়েছে- আলোচনা করো।

৩। ‘ছবি’ ও ‘শাহজাহান’ কবিতার তুলনামূলক আলোচনা করো।

৪। ‘ছবি’ ও ‘শাহজাহান’ কবিতার কাব্য সৌন্দর্য সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখ।

৫। সীমা এবং অসীমের তত্ত্ব ‘তাজমহল’ কবিতায় কিভাবে ধরা পড়েছে?

৬। প্রেম থেকে যে সৃষ্টি সম্ভব তা ‘শাহজাহান’ ও ‘তাজমহল’ কবিতা অবলম্বনে আলোচনা করো।

৭। ‘রূপ’ কবিতাটির বিষয়বস্তু বর্ণনা করো।

৫.৩ গ্রন্থপঞ্জি

১. বলাকা -১৩৯৫-এর নূতন সংস্করণ, এবং তার গ্রন্থপরিচয়।

২. “পথের সঞ্চয়-রবীন্দ্রনাথ।

৩. কালান্তর-রবীন্দ্রনাথ।

৪. রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ-২য় খণ্ড, ১৩৫৬ সংস্করণ, প্রমথনাথ বিশী

৫. বলাকা কাব্য পরিক্রমা'–৫ম সংস্করণ, ক্ষিতিমোহন সেন

৬. রবীন্দ্রনাথের বলাকা'-অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

৭. রবীন্দ্রজীবনকথা'-১৩৬৬, প্রভাত কুমার মুখপাধ্যায়

৮. রবীন্দ্রবন্দনা'-বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী

৯. 'কবিতা আধুনিকতা ও আধুনিক কবিতা'-বারীন্দ্র বসু

১০. স্বদেশ কথা ও পৃথিবীর ইতিহাস'-ড. কিরণ চৌধুরী

১১. 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান। (১৯৮৮)

১২. বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'-জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (সাহিত্য সংসদ)

১৩. বঙ্গীয় শব্দকোষ'-হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪. বারীন্দ্র বসুর "কবি ও কালান্তর"

একক ৬ পত্রপুট

বিন্যাসক্রম

৬.১ সাধারণ আলোচনা

৬.২ পত্রপুট-এর ভাবধারা

৬.৩ কাব্য আলোচনা ১

৬.৪ কাব্য আলোচনা ২

৬.৫ অনুশীলনী

৬.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৬.১ সাধারণ আলোচনা

বিশ্বসৃষ্টি ও মানবসত্তার চিরন্তন রহস্য, এই রহস্যের পটভূমিকায় কবির ব্যক্তিগত জীবনের গভীর পর্যালোচন ও রহস্য-উদঘাটন, এই অনিত্য ধরণীর মধ্যে অসীম ও চিরন্তনের স্পর্শ ও ইহার ক্ষুদ্র সুখদুঃখের সার্থকতা প্রভৃতি ‘পত্রপুট’-এর বিষয়বস্তু। ‘বীথিকা’র সহিত এই গ্রন্থের কতকটা ভাবগত সাদৃশ্য আছে ; গভীর চিন্তাশীলতা, কল্পনার বহু-বিচিত্র বর্ণচ্ছটা, নানা ভাবের একত্র সমাবেশ ও সংস্কৃতানুগ ভাষার বিচিত্র ধ্বনিময় ঐশ্বর্যে কবিতাগুলিকে নানা সুরের সম্মিলিত ঐক্যতান বলে মনে হয়। এই জাতীয় কবিতা কিছুটা এপিকের লক্ষণাক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতাগুলির মধ্যে ‘পত্রপুট’-এর কবিতাগুলি ভাবের গভীরতা ও প্রকাশের গাম্ভীর্যে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

৬.২ ‘পত্রপুট'-এর ভাবধারা

পত্রপুট'-এর মধ্যে প্রধানত দুই প্রকার ভাবধারা লক্ষ্য করা যায় -

(ক) মানবসত্তার সত্য পরিচয় ও রহস্য-উদঘাটন এবং কবি-সত্তা, কবির ব্যক্তিগত জীবনের গভীর পর্যালোচন,ছয়-দশ-বারো-তেরো-পনেরো সংখ্যক কবিতা।

(খ) এই অনিত্য ধুলিময় ধরণীর প্রতি গভীর প্রীতি ও তার নগণ্য অংশের মধ্যেও অসীমের অপরূপ ব্যঞ্জনার অনুভূতি,-তিন-পাঁচ-সাত-আট-সংখ্যক কবিতা।

৬.৩ কাব্য আলোচনা ১

(ক) ছয়-সংখ্যক কবিতায় কবি তাঁর অন্তরতম নিত্য-সত্তাকে উপলব্ধি করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। বিশ্বাত্মা ভগবানের কাছে তাঁর প্রার্থনা, তিনি যেন কবির ব্যক্তি-সত্তার সমস্ত গ্লানি ও মালিন্য দূর করে তাঁর মধ্যস্থিত আত্মাকে উপলব্ধি করতে সহায়তা করেন। ভগবানকে কবি অতিথিবৎসল এবং তাঁর ব্যক্তি-সত্তাকে নানা জীবনে নানা পথে ভ্রমণকারী পথিক-হিসেবে কল্পনা করেছেন। এই পথিক কালো ছায়ার মধ্যে বাস করে, এবং জীবনের সুখদুঃখকে সত্য বলে মনে করে। নানা উপকরণ জুটিয়ে সে তাঁর পান্থশালার বাসাটাই বুকে আঁকড়িয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু এটা তো তাঁর প্রকৃত রূপ নয়, সে ভগবানেরই অংশ—তাঁরই আলো ও আনন্দের অংশীদার। তাই তাঁর আবরণ উন্মোচন করে তাঁর সত্য-স্বরূপের পরিচয় জানতে ভগবানকে অনুরোধ করেছেন,

আপনাকে চেনার সময় পায়নি সে,

ঢাকা ছিল মোটা মাটির পর্দায়;

পর্দা খুলে দেখিয়ে দাও যে, সে আলো, সে আনন্দ,

তোমারি সঙ্গে তার রূপের মিল।

তোমার যজ্ঞের হোমাগ্নিতে

তার জীবনের সুখদুঃখ আহুতি দাও,

জ্বলে উঠুক তেজের শিখায়,

ছাই হোক যা ছাই হবার।

হে অতিথিবৎসল,

পথের মানুষকে ডেকে নাও ঘরে,

আপনি যে ছিল আপনার হয়ে

সে পাক আপনাকে।

দশ-সংখ্যক কবিতায় কবি আত্মোপলব্ধির কথা বলেছেন। দেহের আবিল আবরণে আত্মার মুক্ত রূপ ঢাকা আছে, কবি প্রতিদিন প্রভাতে সুর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেহটাকে মন থেকে সরিয়ে ফেলে, আপন অন্তরলোক অন্বেষণ করেন এবং সূর্যের মধ্যেই মানুষের যে অন্তরতম সত্য, যে মহৎস্বরূপ ঋষি-কবিরা দেখেছেন, তাহাই দেখতে আকাঙ্খা করেন। এই কবিতাটির প্রেরণা এসেছে উপনিষদের একটি মন্ত্র থেকে।

এই দেহখানা বহন করে আসছে দীর্ঘকাল

বহু ক্ষুদ্র মুহূতের রাগদ্বেষ ভয়ভাবনা,

কামনার আবর্জনারাশি।

এর আবিল আবরণে বারে বারে ঢাকা পড়ে

আত্মার মুক্ত রূপ।

প্রতিদিন যে প্রভাতে পৃথিবী।

প্রথম সৃষ্টির অক্লান্ত নির্মল দেববেশে দেয় দেখা,

আমি তার উন্মীলিত আলোকের অনুসরণ করে,

অন্বেষণ করি আপন অন্তরলোক।

বল,-হে সবিতা,

সরিয়ে দাও আমার এই দেহ, এই আচ্ছাদন,-

তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়

রচিত যে-আমার দেহের অণুপরমাণু,

তারো লক্ষ্য অন্তরে আছে তোমার কল্যাণতম রূপ,

তাই প্রকাশিত হোক আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে

আমার তারতম সত্য।

সেই সত্য তোমারি।

তোমার জ্যোতির স্তিমিত কেন্দ্রে মানুষ।

আপনার মহৎস্বরূপকে

দেখেছে কালেকালে ।

বারো-সংখ্যক কবিতাটি কবির গভীর আত্মবিশ্লেষণের চিত্র। কবি বলছেন, তাঁর কবি-সত্তার ভোগময় জীবনকে তিনি অন্তরে অনুভব করেছেনে, কিন্তু যে-সত্তা জীবনকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে প্রাণের প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাপন করে, তাকে উপলব্ধি করেন নি। তাঁর কবি-সত্তা পাহাড়তলীর নিস্তরঙ্গ হ্রদ, তাতে ঋভুর পর্যায়ে পর্যায়ে তীরের সঙ্গে ফুটে উঠে লীলার বৈচিত্র্য ও মাধুর্য, কিন্তু তাহার স্রোত পাথরের সীমাকে লঙ্ঘন করে অন্তগূঢ় আবেগে নবজীবনের আকাঙ্ক্ষায় নিরুদ্দেশ যাত্রা করে নি। মানুষ বহুকে বঞ্চিত করে, বহুকে দুঃখবেদনা দিয়ে, অন্যায় ও অত্যাচারে পৃথিবীর ঐশ্বর্য লৌহদুর্গে আবদ্ধ করেছে, এই দানবের বিরুদ্ধে দেবতার যে অভিযান, সেই অভিযানে কবি কোনো প্রত্যক্ষ সাহায্য করেন নি। কেবল স্বপ্নে শুনেছেন, দেবসেনাপতির গুরু গুরু ডমরু-ধ্বনি আর সমরযাত্রীর পদপাতকম্পন। যে মানুষ দুঃখ-পাপ-মৃত্যুকে নাশ করে নতুন সৃষ্টি করে, তার পরিচয় কবি পান নি। তবুও জীবন-সন্ধ্যায় কবি মানুষের হৃদয়াসীন নবসৃষ্টিকারী নিত্য-মানবকে প্রণাম করেছেন-যে মানব যুগে যুগে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে ত্যাগের দ্বারা আত্মোৎসর্গের দ্বারা পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করেছেন।

জীবনের পথে মানুষ যাত্রা করে

নিজেকে খুজে পাবার জন্যে।

গান যে-মানুষ গায়, দিয়েছে সে ধরা, আমার অন্তরে;

যে মানুষ দেয় প্রাণ, দেখা মেলেনি তার।

দেখেছি শুধু আপনার নিভৃত রূপ

ছায়ায় পরিকীর্ণ,

যেন পাহাড়তলীতে একখানা অনুত্তরঙ্গ সরোবর।

মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে

যে উদ্ধার করে জীবনকে

সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত

ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি

অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।

যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে,

সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়জ্যোতি

ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায়,

শুধু রেখে গেলেম নতমস্তকের প্রণাম

মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশে,

মর্ত্যের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি

মৃত্যুর মুল্যে, দুঃখের দীপ্তিতে।।

তেরো-সংখ্যক কবিতায় কবি তাঁহার সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল চিত্তবৃত্তিগুলি-'হৃদয়ের অসংখ্য

অদৃশ্য পত্রপুট', তার কবি-সত্তাকে কি পরিমাণে রসের যোগান দিয়েছে, বিশ্বভুবনের

সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে কিভাবে তাঁর নিবিড় যোগসাধন করেছে, বস্তুর অতীত সত্তাকে তাঁর

গানের অশ্রুতচ্ছন্দে কেমন করে স্পন্দিত করেছে তার একটা মনোজ্ঞ বর্ণনা করেছেন। কাব্যাংশে এই কবিতাটি অনুপম। অপূর্ব কাব্যরস যেন দানা বেঁধে উঠেছে। এই কবিতা থেকে বোধ হয় গ্রন্থের নাম হয়েছে 'পত্রপুট'। শেষের স্তবকটি করুণ-বিষাদে আমাদের অন্তর পূর্ণ করে,

আজ আমার এই পত্রপুঞ্জের

ঝরবার দিন এলো জানি।

শুধাই আজ অন্তরীক্ষের দিকে চেয়ে

কোথায় গো সৃষ্টির আনন্দনিকেতনের প্রভু,

জীবনের অলক্ষ্য গভীরে

আমার এই পত্রদূতগুলির সংবাহিত দিনরাত্রির যে সঞ্চয়

অসংখ্য অপূর্ব অপরিমেয়

যা অখণ্ড ঐক্যে মিলে গিয়েছে আমার আত্মরূপে,

যে রূপের দ্বিতীয় নেই কোনোখানে কোনো কালে,

তাকে রেখে দিয়ে যাব কোন্ গুণীর কোন রসজ্ঞের দৃষ্টির সম্মুখে,

কার দক্ষিণ করতলের ছায়ায়,

অগণ্যের মধ্যে কে তাকে নেবে স্বীকার করে।

পনেরো-সংখ্যক কবিতাটি রবীন্দ্রকাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। আশৈশব তাঁহার কবি-চিত্তের স্বরূপ ও গূঢ় রহস্যের বিস্তৃত বিশ্লেষণ আছে এই কবিতায়।

কোনো সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট দেবতাকে তিনি পূজা করেন নি। তিনি গুরু পুরোহিত-সম্প্রদায়ের কোন ধার ধারেন নি। তিনি জাতিহীন, মন্ত্রহীন, ব্রাত্য। তিনি বাউলের মতো একতারা-হাতে গানের ধারা বহন করে মনের মানুষের সন্ধানে যাত্রা করেছেন।

ছেলেবেলা থেকে নারকেল শাখার ঝালর-ঝোলা বাগানটিতে ‘ভেঙেপড়া শ্যাওলা-ধরা পাঁচিলের উপর একলা বসে’ সূর্যের কাছ থেকে আলোর মন্ত্র গ্রহণ করেছেন। তেজোময়ী লহরীর অনির্বচনীয় স্পন্দন তিনি নাড়ীতে অনুভব করেছেন এবং ভেবেছেন, অযুত নিযুত বৎসর আগে থেকে সূর্যমণ্ডলে তাঁর বাস। প্রতিদিনের জাগরণের আনন্দেই তাঁর পূজা সম্পূর্ণ হয়েছে। তাঁর বন্ধু ছিল না, দল ছিল না। তাঁর সঙ্গী ছিল ইতিহাসের যাঁরা বীর, তপস্বী, যাঁরা মহাপুরুষ, মৃত্যুঞ্জয়—যাঁরা সত্যের সাধক, যাঁরা অমৃতের অধিকারী। মানুষকে গণ্ডীর মধ্যে হারিয়েও দেশ বিদেশের সীমানার পারে তাঁকে পেয়েছেন। তামসের পরপার থেকে মহান মানুষকে তিনি দেখেছেন। যৌবনে নারীর সংস্পর্শে এসে কবি দেখেছেন, কেউ কাউকে চেনে না--উভয়ের আত্মার রহস্য উভয়ের কাছেই অপরিচিত। তবুও নারীকে ভালোবাসলেন, সংসার পাতলেন। তাঁর প্রেমের একটা ধারা রইল অতি সাধারণ স্ত্রী-স্বরূপকে অবলম্বন করিয়া, আর একটি ধারা বেষ্টন করল এক আদর্শ নারীকে, যার যৌবনশ্রী শতধারে ঝরে পড়ছে সৃষ্টির রূপে রসে, যে সমস্ত কদর্যতা ও অশুচিতার উর্ধ্বে। তাই কবি বলেছেন,

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে

সৃষ্টির প্রথম রহস্য,-আলোকের প্রকাশ,

আর সৃষ্টির শেষ রহস্য,-ভালোবাসার অমৃত।

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,

সকল মন্দিরের বাহিরে

আমার পূজা আজ সমাপ্ত হোলো

দেবলোক থেকে।

মানবলোকে,

আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে

আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।

৬.৪ কাব্য আলোচনা ২

(খ) এই ধারার কবিতায় ধরণীর প্রতি কবির অসীম অনুরাগ এবং তারই বুকে অতি ক্ষুদ্র প্রকাশের মধ্যেও অসীমের ব্যঞ্জনা ও অমরতার অনুভূতির কথা ব্যক্ত হয়েছে।

তিন-সংখ্যক কবিতায় কবি পৃথিবীকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়েছেন। এই পৃথিবীর নানা মূর্তি--কখনো সে স্নিগ্ধ, কখনো হিংস্র, কখনো 'অন্নপূর্ণা', কখনো 'অরিক্তা', কখনো 'পুরাতনী', কখনো 'নিত্যনবীনা',--বিপরীত ললিত-কঠোরের সমন্বয়ে সে ভীষণ-মধুরা। নানা ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নতুন নতুন মূর্তি-- নানা পথে ছড়ানো তাঁর শত শত ইতিহাসের অর্ধলুপ্ত অবশেষ। কবি এই পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র অংশে ক্ষুদ্র কালের মধ্যে জন্মেছিলেন, আবার কখন তাকে চিরতরে ছেড়ে যাবেন। তবুও বিদায়কালে তাহার শেষ প্রণতি রেখে যাচ্ছেন --

আজ আমার প্রণাম গ্রহণ করো, পৃথিবী,

শেষ-নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদীতলে।

জীবনের কোনো একটি ফলবান খণ্ডকে

যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে

তবে দিয়ে তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে;

সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে

যে-রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে।।

হে উদাসীন পৃথিবী,

আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে

তোমার নর্মম পদপ্রান্তে

আজ রেখে যাই আমার প্রণতি ।।

সমাস ও অনুপ্রাসবহুল সংস্কৃতশব্দের গুরু-গম্ভীর ধ্বনি ও দূরপ্রসারী কল্পনার না বৈচিত্র্যে কবিতাটি খুব জমকালো।

পাঁচ-সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন যে, ধরণীর বুকের নানা প্রকাশ-- সংগত-অসংগত, অদ্ভুত-স্বাভাবিক, কাব্যময়-গদ্যময়—সমস্ত মিলিয়েই ধরণী মধুময়-- সংগীতময়।

সাত-সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন যে, তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসময়, অমৃতময় মুহূর্তগুলো বিরাট সৃষ্টি-স্রোতের মধ্যে নিরর্থক নয়-ক্ষণিক নয়। তাঁর নিখিল সৃষ্টি-পটের রঙ এবং সৃষ্টির সঙ্গে একত্র গাঁথা। বিশ্বসৃষ্টির রসধারা কবির প্রাণে যে আনন্দ-শিহরণ জাগিয়েছে, তা'তে সৃষ্টির প্রকাশের দিক হয়েছে আরো সমৃদ্ধতর। এই রসনিমগ্ন মুহূর্তগুলো নিয়ে কবি ঋতুর দরবারে মালা গেঁথেছেন, সেই কাব্যমাল্যে সৃষ্টির প্রকাশ-শিল্প উজ্জ্বল হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। কবির এই আনন্দ-চেতনার মধ্য দিয়াই সৃষ্টির পরিপূর্ণতা এসেছে, তাই

বিশ্ব আমাকে পেয়েছে।

আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে,

অলস কবির এই সার্থকতা।।

আট-সংখ্যক কবিতায় কবির বক্তব্য এই যে, এই সৃষ্টির একটা নগণ্য অংশও নিরর্থক নয়। যা গভীর তাৎপর্যময় ও চিরন্তন। একটা বুনো ফুলও কবির মতে সুদুর অতীত থেকে অন্তহীন ভাবী কাল পর্যন্ত বিশ্বসৃষ্টির ইতিহাসে বর্তমান।

একটুকু কালের মধ্যে সম্পূর্ণ ওর যাত্রা।

একটি কল্পে যেমন সম্পূর্ণ

আগুনের পাপড়ি-মেলা সূর্যের বিকাশ।

ওর ইতিহাসটুকু অতি ছোটো পাতার কোণে

বিশ্ব-লিপিকারের অতি ছোটো কলমে লেখা।

তবু তারই সঙ্গে সঙ্গে উদ্ঘাটিত হচ্ছে বৃহৎ ইতিহাস।

দৃষ্টি চলে এক পৃষ্ঠা থেকে অন্য পৃষ্ঠায়।

শতাব্দীর যে নিরন্তর স্রোত বয়ে চলেছে

বিলম্বিত তালের তরঙ্গের মতো,

যে ধারায় উঠল নামল কত শৈলশ্রেণী,

সাগরে মরুতে কত হোলো বেশ পরিবর্তন,

সেই নিরবধি কালেরই দীর্ঘ প্রবাহে এগিয়ে এসেছে

এই ছোটো ফুলটির আদিম সংকল্প

সৃষ্টির ঘাতপ্রতিঘাতে।

লক্ষ লক্ষ বৎসর এই ফুলের ফোটা-ঝরার পথে

সেই পুরাতন সংকল্প রয়েছে নূতন, রয়েছে সজীব সচল,

ওর শেষ সমাপ্ত ছবি আজও দেয়নি দেখা।

এই দেহহীন সংকল্প, সেই রেখাহীন ছবি

নিত্য হয়ে আছে কোন্ অদৃশ্যের ধ্যানে।

যে অদৃশ্যের অন্তহীন কল্পনায় আমি আছি,

যে অদৃশ্যে বিধৃত সকল মানুষের ইতিহাস

অতীতে ভবিষ্যতে ॥

৬.৫ অনুশীলনী

১) রবীন্দ্র শেষ পর্যায়ের কাব্য হিসেবে ‘পত্রপুটে’র সার্থকতা আলোচনা করো।

২) ‘পত্রপুট’ অনুসারে মানব সত্তার সত্য পরিচয় রহস্য উদঘাটন এবং কবি সত্তার সম্পর্ক আলোচনা করো।

৩) সীমা ও অসীমের তত্ত্ব ‘পত্রপুট’ অনুসারে ব্যক্ত করো।

৬.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১) পত্রপুট -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২) রবীন্দ্র কবিতা শতক – জগদীশ ভট্টাচার্য

৩) রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা – প্রমথনাথ বিশি

একক ৭ কবিতা

বিন্যাসক্রম

৭.১ নির্বাচিত চারটি কবিতা

৭.২ নতুন করে ফিরে দেখা

৭.৩ রবীন্দ্র ভাবনার সাযুজ্য

৭.৪ সংযোজন

৭.৫ প্রার্থনামূলক কবিতা

৭.৬ অনুশীলনী

৭.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৭.১ নির্বাচিত চারটি কবিতা

পত্রপুট

এক

জীবনে নানা সুখ দুঃখের
এলোমেলো ভিড়ের মধ্যে
হঠাৎ কখনো কাছে এসেছে
সুসম্পূর্ণ সময়ের ছোটো একটু টুকরো।
গিরিপথের নানা পাথর-নুড়ির মধ্যে
যেন আচমকা কুড়িয়ে-পাওয়া একটি হীরে
কতবার ভেবেছি গেঁথে রাখব
ভারতীর গলার হারে;
সাহস করিনি,
ভয় হয়েছে কুলোবে না ভাষায়।

ভয় হয়েছে প্রকাশের ব্যগ্রতায়

পাছে সহজের সীমা যায় ছাড়িয়ে।

ছিলেম দার্জিলিঙে,

সদর রাস্তার নিচে এক প্রচ্ছন্ন বাসায়।

সঙ্গীদের উৎসাহ হোলো

রাত কাটাবে সিঞ্চল পাহাড়ে।

ভরসা ছিল না সন্ন্যাসী গিরিরাজের নির্জন সভার পরে,

কুলির পিঠের উপরে চাপিয়েছি নিজেদের সম্বল থেকেই

অবকাশ-সম্ভোগের উপকরণ।

সঙ্গে ছিল একখানা এসরাজ, ছিল ভোজ্যের পেটিকা,

ছিল হো হো করবার অদম্য উৎসাহী যুবক,

টাট্টুর উপর চেপেছিল আনাড়ি নবগোপাল,

তাকে বিপদে ফেলবার জন্যে ছিল ছেলেদের কৌতুক।

সমস্ত আঁকাবাঁকা পথে

বেঁকে বেঁকে ধ্বনিত হোলো অট্টহাস্য।

শৈলশৃঙ্গবাসের শূন্যতা পূরণ করব ক'জনে মিলে,

সেই রস জোগান দেবার অধিকারী আমরাই

এমন ছিল আমাদের আত্মবিশ্বাস ।

অবশেষে চড়াই-পথ যখন শেষ হোলো

তখন অপরাহ্ণের হয়েছে অবসান।

ভেবেছিলেম আমোদ হবে প্রচুর,

অসংযত কোলাহল উচ্ছ্বসিত মদিরার মতো

রাত্রিকে দেবে ফেনিল করে।

শিখরে গিয়ে পড়লাম অবারিত আকাশে,

সুর্য নেমেছে অস্ত-দিগন্তে

নদীজালের রেখাঙ্কিত

বহু দূর বিস্তির্ণ উপত্যকায়।

পশ্চিমের দিগ্বলয়ে,

সুর-বালকের খেলার অঙ্গনে

স্বর্ণ-সুধার পাত্রখানা বিপর্যস্ত,

পৃথিবী বিহ্বল তার প্লাবনে।

প্রমোদমুখর সঙ্গীরা হোলে নিস্তব্ধ।

দাঁড়িয়ে রইলেম স্থির হয়ে।

এসরাজটা নিঃশব্দ পড়ে রইল মাটিতে,

পৃথিবী যেমন উন্মুখ হয়ে আছে

তার সকল কথা থামিয়ে দিয়ে।

মন্ত্ররচনার যুগে জন্ম হয়নি,

মন্দ্রিত হয়ে উঠল না মন্ত্র

উদাত্তে অনুদাত্তে।

এমন সময় পিছন ফিরে দেখি

সামনে পূর্ণচন্দ্র,

বন্ধুর অকস্মাৎ হাস্যধ্বনির মতো।

যেন সুরলোকের সভাকবির

সদ্যবিরচিত কাব্য-প্রহেলিকা

রহস্যে রসময়।

গুণী বীণায় আলাপ করে প্রতিদিন।

একদিন যখন কেউ কোথাও নেই

এমন সময় সোনার তারে রুপোর তারে

হঠাৎ সুরে সুরে এমন একটা মিল হলো

যা আর কোনোদিন হয়নি।

সেদিন বেজে উঠল যে রাগিনী

সেদিনের সঙ্গেই সে মগ্ন হোলো

অসীম নীরবে।

গুণী বুঝি বীণা ফেললেন ভেঙে।

অপুর্ব সুর যেদিন বেজেছিল।

ঠিক সেইদিন আমি ছিলেম জগতে

বলতে পেরেছিলেম -

আশ্চর্য

২

দুই

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ

কল্যাণীয়েসু

আমার ছুটি চারদিকে ধুধু করছে

ধান-কেটে-নেওয়া ক্ষেতের মতো।

আশ্বিনে সবাই গেছে বাড়ি;

তাদের সকলের ছুটির পলাতকা ধারা মিলেছে

আমার একলা ছুটির বিস্তৃত মোহনায় এসে

এই রাঙামাটির দীর্ঘ পথপ্রান্তে।

আমার ছুটি ব্যাপ্ত হয়ে গেল

- দিগন্তপ্রসারী বিরহের জনহীনতায়;

তার তেপান্তর মাঠে কল্পলোকের রাজপুত্র

ছুটিয়েছে পবন-বাহন ঘোড়া।

মরণ-সাগরের নীলিমায় ঘেরা।

স্মৃতিদ্বীপের পথে।

সেখানে রাজকন্যা চিরবিরহিণীর

ছায়া ভবনের নিভৃত মন্দিরে।

এমনি করে আমার ঠাঁইবদল হোলো।

এই লোক থেকে লোকাতীতে।

আমার মনের মধ্যে ছুটি নেমেছে

যেন পদ্মার উপর শেষ শরতের প্রশান্তি।

বাইরে তরঙ্গ গেছে থেমে

গতিবেগ রয়েছে ভিতরে।

সাঙ্গ হোলো দুই তীর নিয়ে

ভাঙন-গড়নের উৎসাহ।

ছোটো ছোটো আবর্ত চলেছে ঘুরে ঘুরে

অনমনা চিত্তপ্রবাহে ভেসে-যাওয়া

অসংলগ্ন ভাবনা।

সমস্ত আকাশের তারার ছায়াগুলিকে

আঁচলে ভরে নেবার অবকাশ তার বক্ষতলে

রাত্রের অন্ধকারে ।।

মনে পড়ে অল্পবয়সের ছুটি;

তখন হাওয়া-বদল ঘর থেকে ছাদে;

লুকিয়ে আসত ছুটি, কাজের বেড়া ডিঙিয়ে,

নীল আকাশে বিছিয়ে দিত

বিরহের সুনিবিড় শূন্যতা,

শিরায় শিরায় মিড় দিত তীব্র টানে

না পাওয়ার না-বোঝার বেদনায়,

এড়িয়ে যাওয়ার ব্যর্থতার সুরে।

সেই বিরহগীতগুঞ্জরিত পথের মাঝখান দিয়ে

কখনো বা চমকে চলে গেছে।

শ্যামলবরন মাধুরী

চকিত কটাক্ষের অব্যক্ত বাণী বিক্ষেপ করে,

বসন্তবনের হরিণী যেমন দীর্ঘনিশ্বাসে ছুটে যায়

দিগন্তের নিরুদ্দেশে।

এমনি করে চিরদিন জেনে এসেছি

মোহনকে লুকিয়ে দেখার অবকাশ এই ছুটি

অকারণ বিরহের নিঃসীম নির্জনতায়

হাওয়া-বদল চাই

এই কথাটা আজ হঠাৎ হাঁপিয়ে উঠল

ঘরে ঘরে হাজার লোকের মনে।

টাইম-টেবিলের গহনে গহনে

ওদের খোঁজ হোলো সারা,

সাঙ্গ হোল গাঁঠরি বাঁধা,

বিরল হলো গাঁঠের কড়ি।

এদিকে, উনপঞ্চাশ পবনের লাগাম যাঁর হাতে

তিনি আকাশে আকাশে উঠেছেন হেসে

ওদের ব্যাপার দেখে।

আমার নজরে পড়েছে সেই হাসি

তাই চুপচাপ বসে আছি এই চাতালে

কেদারাটা টেনে নিয়ে।

দেখলেম বর্ষা গেল চলে।

কালে ফরাসটা নিল গুটিয়ে।

ভাদ্রশেষের নিরেট গুমটের উপরে

থেকে থেকে ধাক্কা লাগল

সংশয়িত উত্তরে হাওয়ার।

সাঁওতাল ছেলেরা শেষ করেছে কেয়াফুল বেচা;

মাঠের দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়েছে গোরুর পাল,

শ্রাবণ ভাদ্রের ভুরিভোজের অবসানে

তাদের ভাবখানা অতি মন্থর;

কী জানি, মুখ-ডোবান রসালো ঘাসেই তাদের তৃপ্তি –

না, পিঠে কাঁচা রৌদ্র লাগানো আলস্যে।

হাওয়া-বদলের দায় আমার নয়;

তার জন্যে আছেন স্বয়ং দিকপালেরা।

রেলোয়ে স্টেশনের বাইরে,

তাঁরাই বিশ্বের ছুটি বিভাগে রসসৃষ্টির কারিগর।

অস্ত আকাশে লাগল তাঁদের নতুন তুলির টান

অপূর্ব আলোকের বর্ণচ্ছটায়।

প্রজাপতির দল নামালেন

রৌদ্রে ঝলমল ফুলভরা টগরের ডালে,

পাতায়-পাতায় যেন বাহবাধ্বনি উঠেছে

ওদের হালকা ডানার এলোমেলো তালের রঙিন নৃত্যে।

আমার আঙিনার ধারে ধারে এতদিন চলেছিল

এক সার জুঁই বেলের ফোটা-ঝরার ছন্দ,

সংকেত এল, তারা সরে পড়ল নেপথ্যে;

শিউলি এল ব্যতিব্যস্ত হয়ে;

এখনো বিদায় মিলল না মালতীর।

কাশের বনে লুটিয়ে পড়েছে শুক্লাসপ্তমীর জ্যোৎস্না,-

পূজার পার্বণে চাঁদের নূতন উত্তরী

বর্ষাজলে ধোপ-দেওয়া।।

আজ নি-খরচার হাওয়া-বদল জলে স্থলে।

খরিদ্দারের দল তাকে এড়িয়ে চলে গেল

দোকানে বাজারে।

বিধাতার দামী দান থাকে লুকোনো

বিনা দামের প্রশ্রয়ে,

সুলভ ঘোমটার নিচে থাকে

দুর্লভের পরিচয়।

আজ এই নি-কড়িয়া ছুটির অজস্রতা

সরিয়েছেন তিনি ভিড়ের থেকে

জনকয়েক অপরাজেয় কুঁড়ে মানুষের প্রাঙ্গণে।

তাদের জন্যেই পেতেছেন খাষদরবারের আসর

তাঁর আম-দরবারের মাঝখানেই,-

কোনো সীমানা নেই আঁকা।

এই ক'জনের দিকে তাকিয়ে

উৎসবের বীণকারকে তিনি বায়না দিয়ে এসেছেন

অসংখ্য যুগ থেকে।।

বাঁশি বাজল।

আমার দুই চক্ষু যোগ দিল

কয়খানা হালকা মেঘের দলে।

ওরা ভেসে পড়েছে নিঃশেষে মিলিয়ে যাবার খেয়ায়।

আমার মন বেরোলো নির্জনে আসন-পাতা

শান্ত অভিসারে,

যা-কিছু আছে সমস্ত পেরিয়ে যাবার মাত্রায়।।

আমার এই স্তব্ধ ভ্রমন হবে সারা

ছুটি হবে শেষ

হাওয়া-বদলের জল ফিরে আসবে ভিড় ক'রে,

আসন্ন হবে বাকি-পড়া কাজের তাগিদ।

ফুরোবে আমার ফিরতি-টিকিটের মেয়াদ,

ফিরতে হবে এইখান থেকেই এইখানেই,

মাঝখানে পার হব অসীম সমুদ্‌র।

৩

তিন

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী,

শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদীতলে।

মহাবীর্যবতী, তুমি বীরভোগ্যা,

বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে,

মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে;

মানুষের জীবন দোলায়িত করো তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে।

ডান হাতে পূর্ণ করো সুধা

বাম হাতে চুর্ণ করো পাত্র,

তোমার লীলাক্ষেত্র মুখরিত করো অউবিদ্রূপে;

দুঃসাধ্য করে বীরের জীবনকে, মহৎজীবনে যার অধিকার।

শ্রেয়কে করে দুর্মূল্য,

কৃপা করো না কৃপাপাত্রকে।

তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতিমুহূর্তের সংগ্রাম,

ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক।

জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমি,

সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা।

তোমার নির্দয়তার ভিত্তিতে উঠেছে সভ্যতার জয়তোরণ,

ত্রুটি ঘটলে তার পূর্ণ মূল্য শোধ হয় বিনাশে।

তোমার ইতিহাসের আদিপর্বে দানবের প্রতাপ ছিল দুর্জয়,

সে পরুষ, সে বর্বর, সে মূঢ়।

আর অঙ্গুলি ছিল স্থুল, কলাকৌশলবর্জিত;

গদা-হাতে মুষল হাতে লন্ডভন্ড করেছে সে সমুদ্র পর্বত;

অগ্নিকে বাষ্পেতে দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে তুলেছে আকাশে।

জড় রাজত্বে সে ছিল একাধিপতি,

প্রাণের পরে ছিল তার অন্ধ ঈর্ষা।

দেবতা এলেন পর-যুগে

মন্ত্র পড়লেন দানব-দমনের,

জড়ের ঔদ্ধত্য হোলো অভিভূত;

জীবধাত্রী বসলেন শ্যামল আস্তরণ পেতে।

উষা দাঁড়ালেন পূর্বাচলের শিখর-চুড়ায়,

পশ্চিম সাগরতীরে সন্ধ্যা নামলেন মাথায় নিয়ে শান্তিঘট।

নম্র হোলো শিকলে-বাঁধা দানব,

তবু সেই আদিম বর্বর আঁকড়ে রইল তোমার ইতিহাস।

ব্যবস্থার মধ্যে সে হঠাৎ আনে বিশৃঙ্খলা,

তোমার স্বভাবের কালো গর্ত থেকে

হঠাৎ বেরিয়ে আসে এঁকেবেঁকে।

তোমার নাড়ীতে লেগে আছে তার পাগলামি।

দেবতার মন্ত্র উঠছে আকাশে বাতাসে অরণ্যে

দিনেরাত্রে

উদাত্ত অনুদাত্ত মন্দ্রস্বরে।

তবু তোমার বক্ষের পাতাল থেকে আধপোষা নাগ-দানব

ক্ষণে ক্ষণে উঠছে ফণা তুলে',

তার তাড়নায় তোমার আপঙ জীবকে করছ আঘাত,

ছারখার করছ আপন সৃষ্টিকে।

শুভে অশুভে স্থাপিত তোমার পাদপীঠে,

তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশ্যে

আজ রেখে যাব আমার ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি।

বিরাট প্রাণের, বিরাট মৃত্যুর গুপ্তসঞ্চার

তোমার যে-মাটির তলায়

তাকে আজ স্পর্শ করি, উপলব্ধি করি সর্ব দেহে মনে।

অগণিত যুগযুগান্তরের

অসংখ্য মানুষের লুপ্তদেহ পুঞ্জিত তার ধুলায়।

আমিও রেখে যাব কয় মুষ্টি ধূলি

আমার সমস্ত সুখদুঃখের শেষ পরিণাম,

রেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী সকল পরিচয়গ্রাসী

নিঃশব্দ মহাধুলিরাশির মধ্যে।

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,

গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যানমগ্না পৃথিবী,

নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,

অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।

একদিকে আপক্কধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র,

সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসুর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু।

কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে।

অস্তগামী সূর্য শ্যামলশস্যহিল্লোলে রেখে যায় অকথিত এই বাণী

“আমি আনন্দিত।”

অন্যদিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্কপান্ডুর মরুক্ষেত্রে

পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।

বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল

কালো শ্যেন পাখির মতো তোমার ঝড়,

সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ

তার ল্যাজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু ক’রে

হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়ল উবুড় হয়ে।

হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙ্গা কুঁড়ের চাল
শিকলছেঁড়া কয়েদি-ডাকাতের মতো।
আবার ফাল্গুনে দেখেছি তোমার আতপ্ত দক্ষিণে হাওয়া
ছড়িয়ে দিয়েছে বিরহ মিলনের স্বগতপ্রলাপ
আম্রমুকুলের গন্ধে।
চাঁদের পেয়ালা ছাপিয়ে দিয়ে উপছিয়ে পড়েছে
স্বর্গীয় মদের ফেনা।
বনের মর্মরধ্বনি ঝঞ্ঝাবায়ুর স্পর্ধায় ধৈর্য হারিয়েছে
অকস্মাৎ কলোচ্ছ্বাসে।
স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী, তুমি নিত্যনবীনা,
অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞ হুতাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে
সংখ্যাগণনার অতীত প্রত্যুষে,
তোমার চক্রতীর্থের পথে পথে ছড়িয়ে এসেছ
শত শত ভাঙা ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ—
বিনাবেদনায় বিছিয়ে এসেছ তোমার বর্জিত সৃষ্টি
অগণ্য বিস্মৃতির স্তরে স্তরে।
জীবপালিনী, আমাদের পুষেছ
তোমার খণ্ডকালের ছোটো ছোটো পিঞ্জরে।
তারই মধ্যে সব খেলার সীমা
সব কীর্তির অবসান।
আজ আমি কোনো মোহ নিয়ে আসিনি তোমার সম্মুখে,
এতদিন যে দিনরাত্রির মালা গেঁথেছি বসে বসে
তার জন্যে অমরতার দাবি করব না তোমার দ্বারে।
তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্য-প্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষ গুলি উন্মীলিত নিমীলিত হোতে থাকে
তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো একটি আসনের

সত্যমূল্য যদি দিয়ে থাকি,

জীবনের কোনো একটি ফলবান খণ্ডকে

যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে

তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে;

সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে

যে-রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে।।

হে উদাসীন পৃথিবী,

আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে

তোমার নির্মল পদপ্রান্তে

আজ রেখে যাই আমার প্রণতি।

ষোল

উদ্ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে

স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে

নতুন সৃষ্টিকে বার-বার করছিলেন বিধ্বস্ত,

তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা-নাড়ার দিনে

রুদ্র সমুদ্রের বাহু

প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে

ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা,

বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়

কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।

সেখানে নিভৃত অবকাশে তুমি।

সংগ্রহ করছিলে দুর্গমের রহস্য,

চিনছিলে জলস্থল আকাশের দুর্বোধ সংকেত,

প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাদু

মন্ত্র জাগাচ্ছিল তোমার চেতনাতীত মনে।

বিদ্রুপ করছিলে ভীষণকে

বিরূপের ছদ্মবেশে,

শঙ্কাকে চাচ্ছিলে হার মানাতে

আপনাকে উগ্র করে বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমায়।

তান্ডবের দুন্দুভি নিনাদে ।

হায় ছায়াবৃতা,

কালো ঘোমটার নিচে

অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ

উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।

এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে

নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকরের চেয়ে,

এল মানুষ ধরার দল,

গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।

নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।

তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে

পঙ্কিল হোলো ধুলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে;

দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়

বীভৎস কাদার পিণ্ড

চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।।

সমুদ্রপারে সেই মুহূর্তেই তাদের পাড়ায় পাড়ায়

মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘন্টা

সকালে সন্ধ্যায়, দয়াময় দেবতার নামে;

শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে;

কবির সংগীতে বেজে উঠছিল

সুন্দরের আরাধনা।

আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে

প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,

যখন গুপ্তগহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল,

অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,

এসো যুগান্তরের কবি

আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে

দাঁড়াও ঐ মান-হারা মানবীর দ্বারে,

বলো, ক্ষমা করো,-

হিংস্র প্রলাপের মধ্যে

সেই হক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।

৭.২ নতুন করে ফিরে দেখা

১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ১২ বৈশাখ শান্তিনিকেতনে লেখা এ কাব্যের উৎসর্গ পত্রে কবি লখেছেন,-'কল্যাণীয় শ্রীমান কৃষ্ণ কৃপালানি ও কল্যাণীয়া শ্রীমতী নন্দিতার শুভপরিণয় উপলক্ষে আশীর্বাদ।' "বিশ্বসৃষ্টি ও মানবসত্তার চিরন্তন রহস্য, এই রহস্যের পটভূমিকায় কবির ব্যক্তিগত জীবনের গভীর পর্যালোচন ও রহস্য-উদঘাটন, এই অনিত্য ধরণীর মধ্যে অসীম ও চিরন্তনের স্পর্শ ও ইহার ক্ষুদ্র সুখদুঃখের সার্থকতা প্রভৃতি পত্রপুট' এর বিষয়বস্তু" একাব্যের কবিতাগুলিও গদ্যছন্দে লেখা। পত্রপুটের' কবিতাগুলিতে দু' ধরনের ভাবধারার পরিচয় মেলে—

(i) মানবসত্তার সত্য পরিচয় ও রহস্য উদঘাটন একই সাথে কবির ব্যক্তিগত জীবনের পর্যালোচনা কবিসত্তার স্বরূপ বিশ্লেষণ।

(ii) নশ্বর পৃথিবীর অনিত্য প্রতিটি বস্তুর প্রতি কবির গভীর ভালোবাসা এবং সীমার মধ্যে অসীমের অনুভব।

মাত্র ষোলটি কবিতা নিয়ে (নামহীন সংখ্যা চিহ্নিত) 'পত্রপূট' কাব্যটি প্রকাশিত হয়েছে।

এক সংখ্যক কবিতায় কবি কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। দার্জিলিঙের পাহাড়ে থাকার সময়, পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার সময় সূর্যাস্তের দর্শনে কবির অনুভূতি,

"পশ্চিমের দিগবলয়ে,

সুর-বালকের খেলার অঙ্গনে

স্বর্ণসুধার পাত্রখানা বিপর্যস্ত,

পৃথিবী বিহ্বল তার প্লাবনে।"

অন্ধকার সেই পরিবেশে হঠাৎ পেছনে দেখলে কবি পূর্ণচন্দ্রের উদ্ভাস, কবি লিখেছেন,

"এমন সময় পিছন ফিরে দেখি

সামনে পূর্ণচন্দ্র;

বন্ধুর অকস্মাৎ হাস্যধ্বনির মতো।

যেন সুরলোকের সভাকবির।

সদ্যোবিরচিত কাব্যপ্রহেলিকা

রহস্যে রসময়।"

২ সংখ্যক কবিতায় কবি মানবসত্তার সত্য পরিচয় উদঘাটনে প্রয়াসী। স্মৃতিচারণা কবিতার আকর্ষণীয়তাকে দিয়েছে বাড়িয়ে।

তিন সংখ্যক কবিতা: 'পত্রপুট' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত তিন সংখ্যক কবিতা 'পৃথিবী' কবিতাটি রচিত হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর। কবির হস্তাক্ষরে 'পৃথিবী' কবিতার একটি পাঠও পাওয়া গিয়েছে। 'প্রবাসী' পত্রিকায় এত পরবর্তীকালের গ্রন্থে সেই পরিবর্তিত পাঠটি প্রকাশ পেয়েছিল।

বিষয় বিশ্লেষণ ও নামকরণ

রবীন্দ্রনাথ জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছে পৃথিবীর প্রতি তার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন আর একবার। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে রবীন্দ্র কবিতা ধরিত্রীর সঙ্গে তথা মর্ত পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগের ব্যাপারটি নতুন নয়। মানসী কাব্যের সময়কাল থেকেই এই বিষয়টি স্পষ্ট, রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলির মধ্যে ধরিত্রীর সঙ্গে তার একাত্মতার বিষয়টি

বারংবার অনুরণিত। 'ছিন্নপত্রের কিছু পত্রেও রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সঙ্গে তার হৃদয় নৈকট্যের ছবিকে তুলে ধরেছেন।

'পৃথিবী' কবিতায় পৃথিবীর স্বরূপের আবরণ উন্মোচন করেছেন কবি। তিনি জানিয়েছেন বীর্যবতী এই ধরিত্রী বীরভোগ্যা। তিনি একাধারে ললিত এবং কঠোর। আর সেই কারণে দ্বিধা দ্বন্দ্বে দোলায়িত মানুষের জীবন যেমন তিনি ডান হাতে সুধা পাত্র পূর্ণ করেন, বামহাতে তিনি তাকে ধ্বংস করে দেন। ধরিত্রীর বুকে বীররূপে পূজিত হবার ক্ষমতা খুব মানুষেরই আছে, আর তাই যা শ্রেষ্ঠ তা হয় দুর্মূল্য। কৃপাপাত্র যে তার প্রতিও ধরিত্রী কৃপণ। এই ধরিত্রীর গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম, জলে স্থলে অহরহ লক্ষিত হয় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণ করা যেতে পারে যে জীবের বিবর্তনবাদের কথা বলতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, Survival of the fitest এর কথা, অর্থাৎ সবলই শেষ পর্যন্ত তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে। সভ্যতার অগ্রগতি ঘটে কারও কৃপায় বা অনুগ্রহে নয়। কঠিন সংগ্রামে এবং পরিকল্পিত পরিশ্রমে।

সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস পর্যলোচনার শুরুতেই এইভাবে কবি পৃথিবীতে মানুষের সভ্যতার প্রতিষ্ঠার গোপন বার্তাটি সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এ পৃথিবীতে সংগ্রাম ছাড়া যে আর কিছুই নেই সে কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন কবি।

অতঃপর নিজের বক্তব্যকেই তিনি আবার ভেঙেছেন। সভ্যতার নিয়ন্ত্রণে শক্তির কথা স্বীকার করে নিয়েও তিনি জানিয়েছেন যে শক্তি মঙ্গলবার্তা বহন করে আনে না। যে শক্তি অহংকারের দম্ভে নিজেকে ধরে রাখার চেষ্টা করে শ্রীহীন সেই শক্তি কখন কাম্য নয়। সৃষ্টির আদিপর্বে দানবেরা এসেছিল সেই শক্তি নিয়ে। প্রাণহীন ছিল তালে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম,-"গদা-হাতে মুষল-হাতে লণ্ডভণ্ড করেছে সে সমুদ্র পবত;

অগ্নিতে বাপেতে দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে তুলেছে আকাশে।

জড়রাজত্বে সে ছিল একাধিপতি,

প্রাণের 'পরে ছিল তার অন্ধ ঈর্ষা।।

কিন্তু প্রাণ অবিনশ্বর, অজেয়, জড়ের দম্ভ খসে পড়ে প্রাণের স্পর্শে, দেবতাদের যুগে সেই প্রানের ঘটল জাগরণ, আর সে মুহূর্তে বদলে গেল পৃথিবীর রূপচিত্র,

'জীবনধাত্রী বসলেন শ্যামল আস্তরণ পেতে।

উষা দাঁড়ালেন পূর্বাচলের শিখরচূড়ায়

পশ্চিমসাগরতীরে সন্ধ্যা নামলেন মাথায় নিয়ে শান্তিঘট।।'

শিকলে বাঁধা দানব হল নম্র, আর দানবের সেই আদিমতা বর্বরতাকে আবার ধরে রইল পথিবীর আদিম ইতিহাস। কিন্তু সে দানবেরা চিরকালের জন্য লুপ্ত হয়ে যায়নি। বীব বক্ষে পাতালে তারা নেয় আশ্রয়, মাঝে মাঝেই তারা সেখান থেকে আসে ভয়ে ধরিত্রীর নাড়িতে নাড়িতে তাই উপলব্ধ হয় তাদের পাগলামি। দেবতার মন্ত্র ভনিত হয়েছে আকাশে বাতাসে অরণ্যে। আর ধরিত্রীর বক্ষের পাতাল থেকে আধপোষা নাগ দানবেরা ফণা তুলেছে বিভ্রান্ত ধরিত্রী ধ্বংস করেছে আপন জীবকে নষ্ট করেছে আপন সৃষ্টিকে।

রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন ধরিত্রীর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে যে পাদপীঠে তা শুভে ও অশুভে গঠিত। কবি যাবার বেলায় তাঁর ক্ষতলাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি রেখে যেতে চান এই ধরিত্রীর পায়ে। তাঁর ক্ষতলাঞ্ছিত জীবন হবার কারণ ধরিত্রীর এই পাগলামো। কবি একাত্মতা অনুভব করেন ধরিত্রীর সঙ্গে কারণ তিনি জানেন মানুষের দেহ তার সুখ দুঃখের পরিণাম হল কেবল মুষ্টি ভর্তি ধুলো। তাই তিনি তার অহংকে ভুলে স্বীকার করেছেন চিরন্তন প্রাপ্তিকে।

ধরিত্রী তার জীবের খাদ্যের সংস্থান করে থাকেন। কিন্তু সবসময় তাকে অন্নপূর্ণা রূপে দেখা যায় না কখনও অন্নপূর্ণা, কখনও অন্নরিক্তা। একদিকে শষ্যভার নম্র শষ্যক্ষেত প্রভাত সূর্যের প্রসন্ন আলো তার গা থেকে মুছে নিচ্ছে শিশির বিন্দু। অস্তগামী সূর্য এই শষ্যক্ষেতের কাছে রেখে যায় অকথিত বাণী— আমি আনন্দিত আর ঠিক তার বিপরীত দিকে মরুভূমির ভয়ঙ্কর, জলহীন স্থলহীন আতঙ্ক পাণ্ডুর "ক্ষত্রে পরিকীর্ণ পশু কঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেত নৃত্য।"

‘পৃথিবী’ কবিতার পরবর্তী অংশে রয়েছে ঋতুতে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের রেখাচিত্র। বৈশাখে বাজপাখির মত ঝড় এসে আঘাত করে তাকে, কেশর ফোলা সিংহের মত আকাশ গর্জন করে—তার লেজের ঝাপটে বনস্পতি ধুলোয় লুটোয়—ভাঙা খড়ের চাল উড়ে । আবার ফাল্গুনে বইতে থাকে দক্ষিণা বাতাস। আষ মুকুলের সুবাসে ভরে যায় চারদিক —পূর্ণিমা চাঁদের জ্যোৎস্না স্বর্গীয় ফেনার মত ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীকে , পুরাতন এবং নবীনা বলে চিহ্নিত করেছেন কবি। যুগে যুগে সভ্যতার খাচ্ছাস তার অবশেষ মাত্র রেখে গেছে পৃথিবীর বুকে। পৃথিবী জীবপালিনী, তিনি মানুষকে লালন করেছেন খন্ড খন্ড খাঁচায়। এরপর ঘটে সমস্ত কীর্তির অবসান। কারন ধরিত্রী কোন কিছুকেই স্থায়ী হতে দেয়নি। এই নশ্বর পৃথিবীতে যা সৃষ্ট হয় তাই কালের অমোঘ নিয়মে ধ্বংস হয়,এই ভাবে সভ্যতাতার সমস্ত দর্প নিয়ে ধরিত্রীর বুকে হারিয়ে গিয়েছে।

৭.৩ রবীন্দ্র ভাবনার সাযুজ্য:

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কবিতার উপলব্ধির সঙ্গে ‘পৃথিবী' কবিতার উপলব্ধির পার্থক্যটুকু প্রসঙ্গত আলোচনা করা যায়। পুর্বোক্ত কবিতাগুলিতে যেখানে ধরিত্রীর সঙ্গে একাঙ্গ হওয়ার প্রত্যাশায় কবি ছিলেন উন্মুখ কারণ জীবনের প্রান্তরেখাকে তিনি দেখতে পাননি তখনও কিন্তু এই কবিতায় দেহের অবসানের জন্য তার কণ্ঠে ঝরেছে বেদনা। তিনি এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার বেদনাকে কোনমতেই ভুলতে পারেননি। কিন্তু যা অবশ্যম্ভাবী তাকে স্বীকার করার সাহস রবীন্দ্রনাথের ছিল। তাই উদাসীন পৃথিবী তাকে সম্পূর্ণ রূপে ভুলে যাবার আগে তিনি তার নির্মম পদপ্রান্তে তার প্রণতি রাখেন। পৃথিবীতে চিরকাল আসা যাওয়ার ঢল চলেছে মানুষের—‘ওরা কাজ করে’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সে চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু সেখানে তিনি দেখিয়েছেন কর্মধারার মধ্যে মানুষের বেঁচে থাকার আকাঙক্ষা। ‘পৃথিবী’ কবিতায় কবি দেখানোর চেষ্টা করেছেন পৃথিবীর রূঢ়তাকে নিষ্ঠুরতাকে—যা কবির অন্তরে মৃদু অথচ গভীর অনুরণন জাগিয়ে তুলেছে ধরিত্রী থেকে বিদায়ের পূর্বলগ্নে। নশ্বর পৃথিবীর সব কিছুই যে অনিত্য—একথা কবির জানা। তবু কবির কাছে সেগুলি হয়েছে পরম আকর্ষণের কেন্দ্র।

স্মৃতিচারণা, প্রকৃতি বর্ণনা—গাছপালার বেড়ে ওঠা তারপর শীতের নির্মম হাওয়ায় তার শুকিয়ে যাওয়া—চার সংখ্যক কবিতায় ব্যক্ত করেছেন কবি।

পাঁচ সংখ্যক কবিতায় কবি যাবার জন্য প্রস্তুতি সেরে নিয়েছেন। এ কবিতায় ঘটেছে আর একবার মনোদীক্ষা। যাবার সময় যেন আর তিনি ফিরে না তাকান। কারণ সকালবেলা অস্ত যায় যে শুকতারা তাকে তো আর দিনের আলোয় ফিরে ডাকা হয় না। মৃত্যু সম্পর্কে কবির চেতনা নৈবেদ্য পর্বের মতো থাকলেও এখানে মরতে না চাওয়ার ভুল করেননি মর্ত ধরিত্রীর কবি, কবি লিখেছেন,

আমার মন বললে

মৃত্যু, ওগো মধুময় মৃত্যু,

তুমি আমায় নিয়ে চলেছ লোকান্তরে

গানের পাখায়।"

আট সংখ্যক কবিতায় একটি তুচ্ছ বুনো চারাগাছ মূল বিষয়। বাগানের ডালিয়া, ম্যারিগোল্ডের মধ্যে ও যেন দেশি বলেই ব্রাত্য,-'ও আছে অনাদরের অচিহ্নিত স্বাধীনতায়' কবি ঐ জাতে বাঁধা না-পড়া অসামাজিক বাউল গাছটির নামকরণ করেছেন, পরম আদরে তাকে ডেকেছেন 'পেয়ালী' নামে।

সংযোজন অশে রয়েছে দুটি কবিতা তার একটি 'আফ্রিকা', অন্যটি 'যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে'। দুটি কবিতা অবশ্য নামহীন অবস্থাতেই প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল।

৭.৪ সংযোজন

এক (আফ্রিকা): ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ২৮ মাঘ শান্তিনিকেতনে " এক সংখ্যক (সংযোজন) কবিতাটি ১৩৪৩ সালের মাঘ সংখ্যার প্রবাসী পাত্র প্রকাশিত হয়। 'সঞ্চয়িতার' গ্রন্থ পরিচয় অংশে জানানো হয়েছে,-"তৃতীয় সংস্করণ সঞ্চয়িতার প্রকাশের পূর্বে কবির অন্য কোনো কাব্যগ্রন্থে স্থান পায় নাই। পরে দ্বিতীয় সংস্করণ পত্রপুটের অন্তর্ভুক্ত হয়।"

উদ্ভব ও গঠন ইতিহাস অন্বেষা:

'আফ্রিকা' কবিতাটি আফ্রিকা মহাদেশের স্বরূপের উন্মোচনে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। প্রথম অংশে রয়েছে তার উদ্ভবের ইতিহাস, না হয়েছে স্রষ্টার বিচলিত মনের অস্থিরতার মুহূর্তে সৃষ্টি হয়েছে আফ্রিকার,

'তার সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা নাড়ার দিনে

রুদ্র সমুদ্রের বাহু।

প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে।

ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে আফ্রিকা।'

এখানে রয়েছে ভৌগোলিক পরিবর্তনের কথাও। পৃথিবীর গঠনে যে প্লেটগুলি সয়েছে— ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় একত্রে সংলগ্ন থাকা আফ্রিকার ভত্তিক প্লেট ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সে সময় আফ্রিকায় গজিয়ে উঠে দুর্গম অরণ্য— বনস্পতির নিবিড় পাহারায় যেন বাঁধা পড়ে সে। রহস্যময় হয়ে ওঠে তার সবকিছু। সে রহস্যের সাড়া যে ভীতির জাগরণ ঘটছিল তা বাোঝাতে গিয়ে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন নিজেতে নিজে আবদ্ধ আফ্রিকা সম্পর্কে কবি লিখেছেন,

'বিদ্রুপ করছিলে ভীষণকে

বিরূপের ছদ্মবেশে,

শঙ্কাকে চাচ্ছিলে হার মানাতে

আপনাকে উগ্র করে বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমায়

তাণ্ডবের দুন্দুভি নিনাদে।"

ফলে আফ্রিকার সৃজন পর্ব এবং নিজেকে নিয়ে নিজে গড়ে ওঠার কাল ছিল তার শান্তির ও সমৃদ্ধির কাল।

পরাধীনতা যন্ত্রণা:

সেই সরলমতি আফ্রিকা, স্বাধীনচেতা আফ্রিকা হলো পরাধীন। তথাকথিত সভ্য মানুষেরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে এসে বাঁধল তাকে তার সারল্য আর খাসের সুযোগে। ঐতিহাসিক সত্যতা এখানে রক্ষিত হয়েছে। ইংরেজরা কীভাবে আফ্রিকায় এসে অমানুষিক অত্যাচার শুরু করে তার একটা ছবি তুলে ধরেছেন কবি

এখানে,

"এল ওরা লোকের হাতকড়ি নিয়ে।

নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,

এল মানুষ-ধরার দল।

গর্বে যারা অন্ধ তোমার সুর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।"

আক্রমণকারী পরদেশ আগ্রাসী ইংরেজের চরিত্র এখানে দু' একটি ছত্রেই সুপরিস্ফুট করে তুলেছেন কবি। তাদের বর্বরতা, অমানুষিকতা, নিষ্ঠুরতার কথাও বিবৃত করেছেন

পরের কয়েকটি চরণে—স্মরণ করা যেতে পারে উনিশ শতকের শেষলগ্নে আফ্রিকা হীরা আর সোনার খনির উপর আপন অধিকার বিস্তার করার জন্য ইংরেজরা বুয়রদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিল। 'নৈবেদ্য' কাব্যের মধ্যে তার পরিচয় আছে। এখানে তারই স্মৃতিচারণ। ইংরেজদের স্বভাবের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,

"সভ্যের বর্বর লোক

নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষ।"

তাদের অত্যাচার উঠল চরমে,

'দস্যু-পায়ের কাটা-মারা জুতোর তলায়

বীভৎস কাদার পিণ্ড।

চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।"

'আফ্রিকা' কবিতার শেষ অংশে রয়েছে বৈপরীত্য ও প্রার্থনা। বৈপরীত্য এখানেই যখন অত্যাচারিত সাধারণ মানুষ পাড়ায় পাড়ায় সকাল সন্ধ্যা দেবতার বন্দনায় রত-শিশুরা নিশ্চিন্তে খেলছিল মায়ের কোলে-কবিরা তাদের কবিতায় করে চলেছিলেন সুন্দরের আরাধনা—সেই সন্ধ্যার-প্রাকমুহূর্তে হঠাৎ যেন অন্ধকার গুপ্ত গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছিল অত্যাচারী হিস্রে পশুরূপ ঐ মানুষেরা। তারাই এসে খর্ব করেছে আফ্রিকার সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা। কবি আশাবাদী তিনি বিশ্বাস করেন আফ্রিকার এ অন্ধকার যাবে ঘুচে। কিন্তু এ জন্য দরকার তো যুগান্তের কবিকে। তিনি পরিস্থিতির এই প্রতিকূলতাকে শান্তচিত্তে বুঝবার চেষ্টা করবেন, এসে দাড়াবেন—মানহারা মানবীর দ্বারে। অত্যাচারী শাসকের সংসারের মধ্যেও তিনি শোনাবেন চিরন্তন প্রেমের কথা—"ক্ষমা করো"। যীশুখ্রীষ্টের শেষ কথাও ছিল এটাই—বুদ্ধও বলেছেন একথা—ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রেও সেই একই সার কথা হয় ধ্বনিত। মহাত্মাজীর অনুরাগী কবি তারই মতো বিশ্বাস করতেন হিংসাকে হিংসা দিয়ে জয় করা যায় না, জয় করা যায় প্রেমের দ্বারা। আফ্রিকায় রয়েছে, সেই আশ্বাসের চরম বাণীরূপ।

সংযোজন: দুই :১৩৪৪ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে শান্তিনিকেতনে লেখা এ কবিতার কৰি মাঞ্চুরিয়া সমস্যা নিয়ে চীন-জাপান যুদ্ধের প্রসঙ্গকে তুলে ধরেছেন। 'নবজাতক' কাব্যের 'বুদ্ধভক্তি' কবিতায় এ কথাই কাব্যছন্দে প্রকাশিত হয়েছে। কবি ব্যঙ্গ করে বলেছেন এরা যুদ্ধে জয়লাভের জন্য বুদ্ধের আশীর্বাদ চেয়েছেন—এটা যেন ভক্তির বাণ দিয়ে বুদ্ধকে বিদ্ধ করা আর অস্ত্র দিয়ে শত্রুকে,

"ওদের এই মাত্র নিবেদন, যেন বিশ্বজনের কানে পারে

মিথ্যামন্ত্র দিতে,

যেন বিষ পারে মিশিয়ে দিতে নিশ্বাসে।

সেই আশায় চলেছে ওরা দয়াময় বৃদ্ধের মন্দিরে

নিতে তার প্রসন্ন মুখের আশীর্বাদ।"

৭.৫ প্রার্থনামূলক কবিতা

রবীন্দ্র জীবনের শেষ পর্বে লেখা পতি প্রার্থনামূলক কবিতার পর্যায়ে রাখা যায়। মধ্যযুগে বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রার্থনা বিষয়ক পদের যে কাঠামো তাতে দেখা যায় জীবনের উপান্তে পৌঁছে নিজ জীবনের ভবিষ্যতের কথা ভেবে শঙ্কিত কবি দীন-দয়াময়ের চরণে শরণ নিয়েছেন। কোন গভীরতর আকুতি। কিন্তু কার কাছে এ আবেদন - আবেদন তো সব সনাত হয় মহাবীর্যের অধিকারীর কাছে—তাই স্বাভাবিকভাবেই তাকে খুশি করার জন্য মহত্ত্বের করতে হয় প্রশংসা। নিজের ক্ষুদ্রত্বের অসহায়তা তুলে ধরার পর জানাতে প্রার্থনা ‘পৃথিবী’ কবিতায় প্রার্থনায় এই একই ফর্ম ব্যবহৃত হয়েছে। বদলে গিয়েছে শুধু কালগত, মানসিকতাগত কারণে কবিতার সার নির্যাস। রবীন্দ্রনাথ মুক্তি চান নি, চেয়েছেন পৃথিবীর কাছে তার সুপ্রচুর কর্মের সামান্যতম স্বীকৃতি। কপালে একটি মাটির তিলক।

পৃথিবীর অসাধারণত্বের কথা ভেবে প্রথমে কবি তাঁকে প্রণাম জানিয়েছেন। এরপর ধীরে ধীরে তুলে ধরেছেন তার কোমলে কঠোরে গড়া অসাধারণ রূপকে। পথিবী গঠনের প্রথম পর্বে ছিল দানবের আধিপত্য,

“সে পরুষ, সে বর্বর, সে মূঢ়।

তার অঙ্গুলি ছিল স্কুল, কলাকৌশলবর্জিত;

গদা হাতে মুষল হাতে লণ্ডভণ্ড করেছে সে।

সমুদ্র পর্বত;

জড় রাজত্বের কাল গেল ঘুচেজড়ের ঔদ্ধত্যকে দমিয়ে দেবতা এলেন ক্ষমতায়,

“দেবতা এলেন পরযুগে, মন্ত্র পড়লেন দানবদমনের

জড়ের ঔদ্ধত্য হল অভিভূত;”।

জীবধাত্রী ধরিত্রী সবুজ শ্যামল আসন বিছিয়ে বসলেন—দিন রাত্রির অপূর্ব রহস্য কিছুটা ধৈর্যের সীমায় পড়ল ধরা—কিছুটা রয়ে গেল অধরা। পৃথিবীর গভীর স্তরে আড়াল

খুঁজলো দেবতা-ভীত দানবেরা। গভীর গর্তের অন্ধকারে দানবেরা ছিল অত্তারত। মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসত সেই সব উচ্ছৃঙ্খল—তাই মাঝে মধ্যে পৃথিবী বক্ষে লক্ষিত হয়েছে পাগলামি। দেবতার অভয় মন্ত্র যেমন উচ্চারিত হচ্ছে পৃথিবীতে, তেমনি পৃথিবীর বক্ষের গভীরে লুকিয়ে থাকা নাগ দানব ক্ষণে ক্ষণে তার ফণা তুলছে। তার সেই আচরণ মানব জীবনকে করছে বিপন্ন,

"তার তাড়নায় তোমার আপন জীবকে করছ আঘাত

ছারখার করছ আপন সৃষ্টিকে।"

দেব-দানবের নিত্য রেষারেষিতে পৃথিবীর পটভূমিতে সঙঘর্ষ চিত্রকে তুলে ধরার পর রবীন্দ্রনাথ তাকিয়েছেন নিজের দিকে। প্রণাম রাখতে চান তিনি পৃথিবীর পায়ে বিশেষ এক উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্য হল পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর গভীর একাত্মতার অনুভব।
কবি লিখেছেন,

'বিরাট প্রাণের, বিরাট মৃত্যুর, গুপ্তসঞ্চার তোমার যে মাটির তলায়

তাকে আজ স্পর্শ করি—উপলব্ধি করি দেহে মনে।"

'ছিন্নপত্রের' ৬৭ সংখ্যক পত্রে কবি লিখেছেন,

"আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম।...তারপরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় অল্পে অল্পে মনে পড়ে।"

এই দুই অনুভবের সূত্র সেই এক। 'পৃথিবী' কবিতায় কবি যে কথা জানিয়েছেন তাতে বড় হয়ে ফুটে উঠেছে মানব জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সম্পর্কে কবর সচেতনতা। যুগে যুগে মানুষ জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কয়েক মুষ্টি ধূলিকণা হয়ে সকল পরিচয়গ্রাসী নিঃশব্দ ধূলিরাশির মধ্যে যায় মিশে।

পৃথিবীর রূপ কখনও কবির কাছে হৃদয়মন হরণকারী দৃষ্টি সুখকর—আবার কখনও তার রূপ ভীষণা— "অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা'। তাই ভীষণ সুন্দরের রূপ বর্ণনায় কবি রত। কবি তুলে ধরেছেন পরিবর্তনের কালে কালে পৃথিবীর নিসর্গ প্রকৃতির বিচিত্র রূপসম্ভার—ফেলে গেছেন তার দিন-রাত্রির মালা। নশ্বর পৃথিবীতে চিরস্থায়ী নয়—তাই কবি অসময়তার দাবি করেননি। কিন্তু দাবি করেছেন যা তার মধ্যে রয়ে গেছে আপন সৃষ্টির ঐশ্বর্যের উপর ভর করেই চেয়েছেন স্বীকৃতি,

তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্য প্রদক্ষিণের পথে

যে বিপুল নিমেষগুলি উন্মীলিত নিমীলিত হতে থাকে ।

তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো-একটি আসনের

সত্যমূল্য যদি দিয়ে থাকি, জীবনের কোনো-একটি ফলবান খণ্ডকে

যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে

তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে;"

৭.৬ অনুশীলনী

১। পত্রপুট কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করো।

২।'পৃথিবী' কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।

৩। পত্রপুট কাব্যগ্রন্থের প্রার্থনামূলক কবিতাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করো এবং তার সঙ্গে রবীন্দ্র ভাবনার সাযুজ্য বর্ণনা কর।

৪। 'আফ্রিকা' কবিতাটির বিষয়বস্তু আলোচনা করো।

৭.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১) পত্রপুট -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক) – অশোক কুমার মিশ্র